শিরক

কোরআন হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ

সম্পাদনায়ঃ ডা. মোঃ সেলিম রেজা,
এম.বি.বি.এস, এম.ফিল

প্রকাশনায়ঃ
www.Waytojannah.com

শির্ক

কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ।

সম্পাদনায়ঃ **ডাঃ মোঃ সেলিম রেজা**
এম.বি.বি.এস, এম.ফিল

সহযোগিতায়ঃ ডাঃ মোঃ ফয়জুল বাশার
এম.বি.বি.এস, এম.ফিল

মুখবন্ধ

“নিশ্চয় শির্ক চরম যুলুম।”

আল কোরআন, সুরা লুকমান, আয়াত-১৩

শির্ক শব্দটি মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছে একটি পরিচিত শব্দ। শির্কের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও হয়ত অনেকে জ্ঞাত থাকতে পারেন। কিন্তু শির্কের বাস্তবতা বা শির্ক সংঘটনের বিভিন্ন বাস্তব পন্থা সম্পর্কে অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। তাই সমাজের বিভিন্ন স্তরে শির্ক প্রচলিত রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সত্যের দিশারী রূপে যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাওহীদের বাণী প্রচার ও সত্যের আহ্বানের সাথে সাথে শিরকের মূলোৎপাটনের জন্য ছিলেন সোচ্চার। প্রতিটি মানুষেরও ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে তাওহীদ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সেই সাথে অন্যদেরকেও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে শির্ক বর্জিত আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এ ক্ষুদ্র আয়োজন।

জাতি হিসেবে আমরা শংকর জাতি। আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ রয়েছে। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আমাদের সমাজে ইসলামের মধ্যে বহু অনৈসলামিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ধর্মকে আমরা অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি, যেখানে রয়েছে পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব। তাই প্রকৃত ইসলামের চেতনা আমাদের মধ্যে অনেকটাই অনুপস্থিত। আমরা শুধু পূর্ব-পুরুষদের আচার-আচরণের মধ্যেই ধর্মকে সীমাবদ্ধ রাখতে শিখেছি। আমাদের সমাজের অনেক আলেমগণের অবস্থাও অনেকটা তদ্রুপ। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি তারাও কোরআন ও হাদিসকে পাশ কাটিয়ে কিছু প্রচলিত পুস্তকের উপর নির্ভর করেই কোনভাবে চালিয়ে নিচ্ছে ধর্মীয় চর্চা। সেক্ষেত্রে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে, ফলে শির্কের মত কঠিন অপরাধগুলো সংঘটিত হয়ে চলছে। তবে আশার কথা, বর্তমানে আমাদের সমাজেও আলহামদুলিল্লাহ্ বেশ কিছু সচেতন ইসলামী পন্ডিত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে যারা সমাজ সংস্কারের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন।

আমরা গভীর আন্তরিকতা নিয়ে এবং অত্যন্ত সততার সাথে এ রচনাটি সম্পাদন করার চেষ্টা করেছি। এ গ্রন্থে আমরা শির্কের প্রকার এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহ এর প্রতিটি বিষয়ের উপর কোরআন ও হাদিসের দলীল উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করেছি। সেই সাথে আমাদের সমাজে মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত শির্কের বাস্তব দিকটিও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ রচনার মধ্যে আমরা কোরআনের কয়েকটি তফসীর গ্রন্থ যেমন, তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, তফসীর ইবনে কাসীর, তফসীর ফি-যিলালীল কোরআন এবং সহীহ হাদিস গ্রন্থের মধ্যে বোখারী শরীফ, মুসলীম শরীফ, তিরমিযী শরীফ ও আবু দাউদ শরীফের সাহায্য গ্রহন করেছি। এ ছাড়াও ডঃ মুয্যাম্মিল আলী প্রনীত ‘শির্ক কি এবং কেন?’ গ্রন্থটি এবং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রবন্ধের সহায়তা নিয়ে এ রচনাটি সম্পাদন করেছি। এ রচনার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সহৃদয় পাঠকদের কাছে কোন বিষয় দূরূহ বা অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হলে বা কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল। এ গ্রন্থটি পাঠ করে কোন পাঠক যদি উপকৃত হন এবং শির্ক মুক্ত আমল দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভে সমর্থ হন, তাহলে আমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল হবে।

আমরা এ রচনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ গ্রন্থটি সম্পাদন করতে পেরে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এবং প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি মার্জনা করেন এবং আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল ও মঞ্জুর করেন। সবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট করুণা ভিক্ষা করছি যেন এ বইটিকে তিনি আমাদের পরকালের নাযাতের ওসিলা বানিয়ে নেন, আমিন।

বিনীত-
সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
শির্‌ক অবতরণিকা	১
শির্‌ক কি?	২
শির্‌কের সংজ্ঞা	২
শির্‌ক কত প্রকার?	৩
বড় শির্‌ক	৪
বড় শির্‌কের ভয়াবহতা	৫
বড় শির্‌কের শাখা সমূহ	৬
রুবূবিয়্যাতের শির্‌ক	৭
অংশীদারিত্বের শির্‌ক	৮
হিন্দুধর্মালম্বীদের ঈশ্বরের ধারণা	৮
খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের ঈশ্বরের ধারণা	১০
পার্শীদের ঈশ্বরের ধারণা	১০
মুসলিমদের ঈশ্বরের ধারণা	১১
অস্বীকৃতির শির্‌ক	১৬
আসমা অস সিফাতের শির্‌ক	২০
মুনষ্যতাবরোপনের শির্‌ক	২২
দেবাত্বরোপনের শির্‌ক	২৫
আলাহ্‌র ক্ষমতার শির্‌ক	২৭
অদৃশ্য জ্ঞানের শির্‌ক	৩৬
শ্রবন ও দর্শণের শির্‌ক	৪০
উলূহিয়্যাতের শির্‌ক	৪৩
ইবাদত কি?	৪৩
ইবাদতের গুরুত্ব	৪৪
ইবাদত মঞ্জুর ও মকবুল হওয়ার শর্ত:	৪৫
ইবাদতের শির্‌ক	৪৭
মূর্তিপূজা	৪৮
যীষুখ্রিস্টের উপাসনা	৫১
ফেরেশতাদের উপাসনা	৫২
শয়তানের উপাসনা	৫৫
জ্বিনের উপাসনা	৬৫
নবী রাসূলদের উপাসনা	৬৭
পীর-মাশায়েখ ও আলেমদের উপাসনা	৭৩
মাজার উপাসনা	৭৭
সন্তান-সন্ততির উপাসনা	৮১
ব্যক্তির উপাসনা	৮৪
ধন-সম্পদের উপাসনা	৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রবৃত্তির উপাসনা	৯৩
ইবাদতের মাধ্যম ও প্রকার	৯৬
বাহ্যিক ইবাদত	৯৭
সালাত	৯৭
হজ্জ	৯৯
রোযা	১০০
কোরবানী	১০০
দান-সদকা	১০১
মানত	১০১
দু'আ	১০৪
ওসীলা	১১৪
শাফায়াত	১২৩
জিকির	১২৯
যিকিরের প্রকার ও পদ্ধতি	১২৯
আত্মিক ইবাদত	১৩৯
ভালোবাসা	১৩৯
আনুগত্য ও অনুসরণ	১৪৯
ভয়ের উপাসনা	১৭০
ভরসার উপাসনা	১৭৪
অহংকার	১৭৭
ছোট শির্ক	১৮৩
ছোট শির্কের শাখা সমূহ	১৮৫
রিয়া	১৮৫
কসমের শির্ক	২০৩
যাদু টোনার শির্ক	২০৬
রাশিফল ও জ্যোতিষীর শির্ক	২০৯
গণনার শির্ক	২১২
তা'বীয কবযের শির্ক	২১৪
ঝাড়-ফুঁকের শির্ক	২১৯
তাবার্রুকের শির্ক	২২২
অশুভ লক্ষণের শির্ক	২২৬
আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে জুড়ে নিয়ে কথা বলার শির্ক	২২৯
দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহারের শির্ক	২৩০
যুগ বা বাতাসকে গালি দেওয়ার শির্ক	২৩৩
নামের শির্ক	২৩৫
আমাদের সমাজে মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত শির্ক	২৩৭
রাসূল (সঃ) কে কেন্দ্র করে শিরকের আচরণ	২৩৮
রাসূল (সঃ) গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করার শির্ক	২৩৯
রাসূল (সঃ) কে আল্লাহ্‌র অবতার ভাবার শির্ক	২৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (সঃ) কে সিজদা করার শির্ক	২৪১
রাসূল (সঃ) এর নামের যিকির করার শির্ক	২৪২
রাসূল (সঃ) কে ওসীলা করে দোয়ার মাধ্যমে শির্ক	২৪৩
রাসূল (সঃ) এর কাছে দোয়া চাওয়ার শির্ক	২৪৪
ফেরেশতাদের প্রতি আচরণের মাধ্যমে শির্ক	২৪৬
জ্বীনদের প্রতি অমূলক ধারণার শির্ক	২৪৭
জ্বীন ও জ্বীনসাধকেরা গায়েব জানে এ বিশ্বাস করার শির্ক	২৪৭
জ্বীনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ভেট দানের শির্ক	২৪৮
জঙ্গলের জ্বীনের কাছে আশ্রয় চাওয়ার শির্ক	২৪৮
মাজার বা কবর কেন্দ্রীক আচরণের শির্ক	২৪৯
মাজারস্থ অলিগণ গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করার শির্ক	২৫৩
মাজারস্থ অলিগণ পৃথিবী পরিচালনায় ন্যাস্ত ভাবার শির্ক	২৫৪
মাজারস্থ অলির নিকট থেকে কল্যাণ আশা করার মাধ্যমে শির্ক	২৫৫
মাজারস্থ জীব-জন্তু বা অন্য কিছুর অনিষ্টের ভয় করার শির্ক	২৫৭
কবরকে সিজদা করার শির্ক	২৫৮
কবরের চারপার্শে ত্বাওয়াফ করার শির্ক	২৫৮
মাজারে এ'ত্বেকাফের শির্ক	২৫৮
মাজারে মানতের শির্ক	২৫৯
মাজারস্থ অলিদের গোপন ভয় করার শির্ক	২৫৯
মাজারস্থ অলিদের ওসীলা নির্ধারণের শির্ক	২৬০
জীবিত পীর-অলিদের প্রতি আচরণের শির্ক	২৬১
পীর-অলিদের অন্ধ অনুসরণের শির্ক	২৬২
পীর-অলিদের ওসীলা নির্ধারণের শির্ক	২৬২
পীর-অলিদের রহমত ও করুণা কামনার শির্ক	২৬৫
পীরকে সিজদার শির্ক	২৬৫
মানুষের আনুগত্যের শির্ক	২৬৬
মাযহাবের অন্ধ তাকলীদের শির্ক	২৬৬
রাজনীতিতে শির্ক	২৬৯
গণতন্ত্র চর্চায় শির্ক	২৭০
অভ্যাসগত আচরণের শির্ক	২৭১
গায়রুল্লাহর কসমের শির্ক	২৭১
তা'বীয ব্যবহারের শির্ক	২৭১
তাগা, বালা ইত্যাদির ব্যবহারের শির্ক	২৭২
ঝাড়-ফুঁকের শির্ক	২৭৩
শুভ-অশুভ এবং পূর্ব লক্ষণ নির্ধারণের শির্ক	২৭৪
ভাস্কর্য ও স্মৃতিসৌধের প্রতি আচরণের শির্ক	২৭৪
মানুষের নামকরণের শির্ক	২৭৫
উপসংহার	২৭৬

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। এক আল্লাহ্ ছাড়া একাধিক উপাস্য নির্ধারণ করা তাওহিদী আকিদার পরিপন্থী এবং শির্ক। ইসলামে বহুঈশ্বরবাদ অযৌক্তিক এবং একান্ত পরিত্যাজ্য বা অগ্রহণীয় বিষয় হিসাবে বিবেচিত। মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে নিজেই শির্ককে খণ্ডন করেছেন এভাবে,

"যদি আল্লাহ্ ছাড়া আসমানে ও যমীনে বহু ইলাহ্ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব, তারা যা বলে তা হতে আর্শের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।"

আল কোরআন, সুরা আম্বিয়া, আয়াত-২২

ইসলামে শির্ক একটি জঘন্য এবং অমার্জনীয় অপরাধ। অবশ্যই বিচার দিবসে আল্লাহ্ শির্কের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেহ আল্লাহ্র শরীক করে সে এক মহা পাপ করে।"

আল কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত-৪৮

মানুষের পার্থিব জীবন এবং আখিরাতের সাফল্যের মূল চাবি-কাঠি হচ্ছে শির্ক বর্জিত আমল। তাই আমাদের প্রত্যেককেই শির্ক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টায় ব্রত থাকা উচিত। অন্তরে আল্লাহ্ ভীতি এবং শির্ক সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকলে এ কাজটি সহজ হবে বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা আল্লাহ্ ভীতি মানুষকে প্রেরণা যোগায় আর জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। শির্ক সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব থাকতে পারে এবং এ অজ্ঞতার কারণেই আমাদের বিশ্বাসে বা আচরণে শির্ক সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং শির্ক মুক্ত থাকার জন্য প্রথমতঃ আমাদের অন্তরে আল্লাহ্ ভীতি জাগরিত করতে হবে এবং সেই সাথে শির্ক সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই আসুন আমরা শির্ক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার চেষ্টা করি।

শির্ক কি?

'শির্ক' একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- অংশীদারিত্ব, শরীক করা, সংমিশ্রন, সমান করা, ভাগাভাগি, তুলনা করা, সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি। তবে শরী'য়তের পরিভাষায় শির্কের দু'টি অর্থ রয়েছে। যথা:

(এক) সাধারণ অর্থ: সাধারণ অর্থে শির্ক হলো গায়রুল্লাহ্কে আল্লাহ্র কোন বৈশিষ্ট্যে সমকক্ষ করা– অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের সত্তা, নাম, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করা কিংবা বা এসবে অন্য কারো অংশ আছে বলে মনে করা। যেমন কোন সৃষ্টির প্রতি এমন ধারণা পোষণ করা যে, তিনি সন্তান দিতে পারেন, রুজী ও আহার দিতে পারেন, মানুষের ভাল-মন্দ বা কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে পারেন বা জীবন ও মরণের ফয়সালা ইত্যাদি করতে পারেন– এ সবই শির্ক।

(দুই) বিশেষ অর্থ: বিশেষ অর্থে শির্ক হলো আল্লাহ্‌র পাশাপাশি গায়রুল্লাহকে উপাস্য ও মান্যবর হিসেবে গ্রহণ করা– অর্থাৎ যে কোন প্রকার ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার করা অথবা ইবাদত আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করা। যেমন মাজারে সিজদা করা, আল্লাহ্ ছাড়া কারো নামে মানত করা, কারো নামে জন্তু জবাই করা বা অন্য কারো কাছে দোয়া করা ইত্যাদি শির্ক।। ইবাদতের মধ্যে দিয়েই মূলত অধিকাংশ শির্কের বহিঃপ্রতাশ ঘটে থাকে। তাই অনেক মনীষীর কথায় শির্ক শব্দটি দ্বারা দ্বিতীয় অর্থটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তবে ইবাদতের বাইরেও অনেকভাবে শির্ক সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, তারকার প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় অথবা কাউকে আল্লাহ্‌র পুত্র বা কন্যা মানা কিংবা জগৎ সৃষ্টিতে ও এর পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রনে আল্লাহ্‌র সহায়ক বা সাহায্যকারী রয়েছে- এ জাতীয় সকল বিশ্বাস ইবাদত বহির্ভুত শির্ক। তাই শির্কের সম্পূরক অর্থ প্রকাশ করার জন্য উপরোক্ত দু'টি অর্থই গ্রহণযোগ্য।

শির্কের সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায় শির্ক হচ্ছে আলাহ্‌র র"ব"বিয়্যাত অথবা তাঁর পবিত্র নাম ও গুণাবলী অথবা তাঁর ইবাদতে অংশীদার বা সমকক্ষ নির্ধারণ করা। সংক্ষেপে বলা যায়, রব ও ইলাহ (উপাস্য) হিসাবে আল্লাহ্‌র সহিত আর কাউকে শরীক সাব্যস্ত করার নামই শির্ক।

আবার এভাবেও বলা যায়, এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্ত্বা বা বস্তুর ইবাদত করা অথবা কোন কিছুতে আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ড় করার নাম শির্ক (Worship of anyone other than Singular Allah or establishment of Partners placed beside Allah)।

বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে বলা যায় যে, **"শির্ক হচ্ছে, এমন সব বিশ্বাস, কথা, কাজ, আচরণ ও অভ্যাস যার দ্বারা বাহ্যিকভাবে অথবা অন্ড়র্নিহিত অর্থে মহান আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌমত্বে অন্যকারো অংশীদারিত্ব বা সমকক্ষতা প্রতীয়মান হয়।"**

তাওহিদী আকিদায় আলাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সার্বভৌমত্বের কোন শরীক নাই। সুতরাং এটা অত্যন্ড় সুস্পষ্ট যে, সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক মহান আলাহ্ তা'আলা। আলাহ্‌র মহত্ব, বড়ত্ব, তাঁর মহান সত্তা ও গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যের কোন শরীক নেই। এজন্য সকল ইবাদত প্রাপ্যতার মালিকও তিনি। শির্ক শব্দটি তাওহীদ শব্দের সম্পূর্ণ বিপরীত। শির্কের সংজ্ঞাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, আলাহ্ তা'আলার কর্তৃত্বে, তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতায়, তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে এবং তাঁর ইবাদতে অন্য কারো অংশীদারিত্ব বা সমকক্ষতা আছে বলে প্রতীয়মান হলে শির্কের অপরাধ সংঘটিত হবে।

শির্ক কত প্রকার?

অপরাধের মাত্রা এবং পরিণতির উপর ভিত্তি করে শির্ককে ভাগ করা যায়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শির্ককে প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন:

(ক) শির্ক এ আকবর (Major Shirk) বা বড় শির্ক

(খ) শির্ক এ আসগর (Minor Shirk) বা ছোট শির্ক

বড় শির্ক

বিশ্বাস জাতীয় বিষয়াদি ও উপাসনার ক্ষেত্রে আলাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক বা সমান করাই হচ্ছে মূলত শিরকে আকবার বা বড় শির্ক। মানুষের মাঝে উপাসনা কেন্দ্রিক শির্ক সর্বাধিক সংঘটিত হয় বলে অনেকে এটাকে শুধু উপাসনার সাথেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন কেউ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: "আলাহ্র উপাসনা সমূহের কোন উপাসনা গায়রুল্লাহের উদ্দেশ্যে করাকে শির্কে আকবার বলা হয়।" তবে শির্কে আকবার শুধুমাত্র উপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে তা আলাহ্র রুবুবিয়্যাত এবং তাঁর গু বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও হতে পারে। বস্তুতঃ তাওহীদ বিরোধী ধ্যান-ধারণা এবং সকল আচার-আচরণই বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। তাই অনেকে এ শির্কের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে– **শির্কে অকবার বলা হয় একমাত্র আলাহ্র হককে আলাহ্ ব্যতীত কাউকে নিবেদন করা। অর্থাৎ আলাহ্র রুবুবিয়্যাতের কোন অংশ অথবা তাঁর উলুহিয়্যাতের কোন অংশ অথবা তাঁর নাম ও গুণাবলীর কোন অংশকে তিনি ব্যতীত কাউকে নিবেদন করা বড় শির্ক।**

আল্লাহ্ তা'আলার জাত এবং গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং যে বৈশিষ্ট্যগুণে তিনি আমাদের একক রব ও উপাস্য, সেখানে অন্য কোন সত্তা যেমন নবী, রাসূল, ফেরেশতা, জিন-পরী, পীর, অলী, দরবেশ প্রমূখ অথবা কোন সৃষ্টবস্তু যেমন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা, পাথর, গাছ-পালা, আগুণ ইত্যাদিকে আলাহ্ তা'আলার এ সব বৈশিষ্ট্যেসমূহের কোন না কোন বৈশিষ্ট্যের সমান বা আংশিক অধিকারী বলে বিশ্বাস করা হলে এবং এদের উদ্দেশ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অন্তর দ্বারা উপাসনামূলক কোন কর্ম করা হলে শির্কে আকবর বা বড় শির্ক সংঘটিত হয়।

এ জাতীয় শিরক কখনো হয় প্রকাশ্যে যেমন, দেব-দেবী ও মূর্তি পূজকদের শির্ক, কবর-মাজার, মৃত ও গায়েবী ব্যক্তি পূজকদের শির্ক ইত্যাদি।

এ শির্ক কখনো হয় অপ্রকাশ্যে, যেমন আলাহ্ ছাড়া অন্যান্য প্রভূদের উপর ভরসা করা অথবা আলাহ্র ন্যায় তাদেরকে ভয় করা কিংবা আলাহ্কে ভালবাসার ন্যায় কোন মখলুককে মহব্বত করা ইত্যাদি।

এজাতীয় শির্ক কখনো হয় আকিদাগত। যেমন বিশ্বাস করা যে, আলাহ্র সাথে কোনো সত্তা আছে যে সৃষ্টি করে অথবা জীবিত করে অথবা মৃত্যু দেয় অথবা মালিকানার হকদার অথবা এ জগতের কর্তৃত্বের অধিকারী; অথবা কোন সত্তা আছেন যিনি আলাহ্র সাথে গায়েব জানেন। অথবা এরূপ বিশ্বাস করা যে, অমুক সত্তা বা ব্যক্তি আলাহ্র ন্যায় নিঃশর্ত আনুগত্যের হকদার, ফলে সে কোন বস্তু হালাল ও হারাম করার ক্ষেত্রে তার ইচ্ছার অনুগত্য করে, যদিও তা রাসূলের আনিত দ্বীনের বিপরীত হয়– এ সবই শির্ক।

এ জাতীয় শিরক কখনো হয় কথা-বার্তায়, যেমন আলাহ্ ব্যতীত কারো নিকট দোয়া করা অথবা সাহায্য চাওয়া কিংবা আশ্রয় প্রার্থনা করা, হোক সে নবী অথবা অলী অথবা ফেরেশতা অথবা জ্বিন অথবা অন্য কোন মখলুক। এসব বড় শির্ক মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়।

বড় শির্কের ভয়াবহতা এবং শির্ককারীর পরিণতি:

মানুষের মাধ্যমে যত ধরনের গুণাহ্র কাজ হতে পারে এ সবের মধ্যে শির্কে আকবর হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুণাহ। বড় শির্ক নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য

বিদ্রোহের শামিল। তাই এটা গুরুতর পাপ এবং এর পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

"মূলত যে কেহ আল্লাহ্র সাথে শরীক করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন, আর তার আবাস হবে জাহান্নাম। এই যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারীই থাকবে না।"

আল কোরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত-৭২

মানুষ যাতে এধরনের শির্ক থেকে সতর্ক হয়, সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি এই বলে সতর্ক বাণী দিয়েছেন:

"তুমি যদি শির্ক কর, তবে তোমার যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

আল কোরআন, সুরা যুমার, আয়াত-৬৫

উল্লিখিত আয়াতদৃষ্টে বড় শির্কের অপরাধ যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা অতি সহজেই অনুমেয়। শর'ই দৃষ্টিতে বড় শির্ক এত বড় পাপ যে, কার্যত একজন মানুষ বড় শির্কে লিপ্ত থাকলে:

- **সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।**
- **তার অতীত ও বর্তমানের সকল নেক আমল বাতিল হয়ে যায়।**
- **তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়।**
- **খাঁটি তাওবা ছাড়া এ গুণাহ মাফ হয় না।**

বড় শির্কের শাখা সমূহ:

তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির প্রধানতঃ তিনটি মৌলিক ধারা আছে– রুবুবিয়্যাত, আসমা অস্ সিফাত ও ইবাদত। এ তিনটি ধারার যে কোনটিতে শির্ক সংঘটিত হতে পারে। কাজেই বড় শির্ক প্রধানতঃ তিন প্রকার:

১। রুবুবিয়্যাত বা কর্তৃত্বের শির্ক।
(Shirk in the area of Lordship)

২। আসমা ওয়াস্ সিফাত বা পবিত্র নামাবলী ও গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যের শির্ক।
(Shirk in the area of Divine Names and Attributes)

৩। উলূহিয়্যাত বা ইবাদতের শির্ক।
(Shirk in the area of Ebadah or Worship)।

রুবুবিয়্যাতের শির্ক (Shirk in the area of Lordship)

রুবুবিয়্যাত শব্দটি আরবী 'রব' শব্দ থেকে উদ্গাত হয়েছে। 'রব' অর্থ পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, প্রভু, মালিক, মনিব, কর্তা, অভিভাবক প্রভৃতি। এ সকল অর্থই রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌কে 'রব' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হলে রুবুবিয়্যাতের সকল বৈশিষ্ট্যই এককভাবে আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। রুবুবিয়্যাতের তাওহীদি আকিদার মূলমন্ত্র হচ্ছে আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ তা'আলার রুবুবিয়্যাতের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- **তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সকল কিছুর একক সৃষ্টিকর্তা।**
- **তিনি বিশ্বজগতের সব কিছুর একক প্রতিপালক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক।**
- **তিনি সারা মখলুকের জীবন ও জীবিকার একচ্ছত্র মালিক।**
- **তিনি ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণ দানের মালিক।**
- **তিনি সকলের মৃত্যু ও পূণঃর্জীবন দানের একমাত্র মালিক।**

এক কথায় সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ এবং সারা জাহানের নিয়ন্ত্রণ, প্রতিপালন সহ সকল কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র; তাওহীদি আকিদার রুবুবিয়্যাতের এ বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং কাজে-কর্মে তা প্রকাশ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যন্ত জরুরী। রুবুবিয়্যাতের শির্ক এমন প্রকারের শির্ক যেখানে এ বিশ্বাসের ব্যতিক্রম হয়। অর্থাৎ কথায় বা কাজের মাধ্যমে সৃজন, প্রতিপালন বা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্বে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ কিংবা প্রায় সমকক্ষ শরীক আছে বলে প্রকাশ পেলে বা রুবুবিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট্য আলাহ্ ছাড়া আর কারো আছে মনে করলে অথবা সৃষ্টি জগতের আদৌ কোন প্রভুর অস্তিত্ব নাই এমন বিশ্বাস ধারণ করা হলে রুবুবিয়্যাতের শির্ক সংঘটিত হয়। এ শির্কের উপশ্রেণী হচ্ছে:

ক) অংশীদারিত্বের শির্ক (Shirk by Association) এবং

খ) অস্বীকৃতির শির্ক (Shirk by Negation)

ক) অংশীদারিত্বের শির্ক (Shirk by Association)

এটা এমন প্রকারের শির্ক যেখানে জগৎ সৃষ্টিতে বা সৃজনকার্যে মহান প্রভূকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর কর্তৃত্বে অন্যান্যদের যেমন, দেবতা, মনুষ্য, প্রেত, স্বর্গীয় কায়া কিংবা জাগতিক বস্তুর অংশীদারিত্ব থাকে বলে বিশ্বাস করা হয়। এ ধরনের বিশ্বাস বহু ঈশ্বরবাদী মতবাদ (Polytheism) নামেই পরিচিত। আমাদের সমাজের চলমান বাস্তবতায় মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে যে ভাবে অংশীদারিত্বের শির্ক সংঘটিত হয় তার কিছু বাস্তব উদাহরণ, কোরআনিক দলীল সহ উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হলঃ

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ঈশ্বরের ধারণা: হিন্দুমতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমুর্তি পরমেশ্বরের তিনটি প্রতিরূপ এবং এই ত্রিশক্তি একত্রে জগৎ সৃষ্টির প্রতিনিধিত্ব করে। এদের মধ্যে ব্রহ্মা- সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু- পালনকর্তা বা রক্ষাকর্তা এবং শিব- সংহারকর্তা হিসাবে বিবেচিত। এখানে ঈশ্বরের সৃজন কার্যে একক স্বত্বার স্থলে ত্রিত্বের (Trinity) অস্তিত্ব আনয়নে রবুবিয়ার শির্ক সংঘটিত হয়েছে। হিন্দুদের এই ত্রিত্বের ধারণা নিতান্তই অযৌক্তিক এবং অমূলক। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

"আল্লাহ্‌ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু

ঘটাবেন ও পরে তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবী গুলোর এমন কেউ আছে কি যে এসমস্তের কিছু করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান।"

আল কোরআন, সুরা রূম, আয়াত-৪০।

আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি একাধারে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা; এর জন্য কোন আলাদা সত্তার অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ন, অমুখাপেক্ষী। তিনি সৃষ্টি করতে চাইলে বলেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায়। আর তিনি সারা মখলুকের প্রতিপালন করেন এবং তিনিই মৃত্যুদাতা। কাজেই এটা স্পষ্ট যে আল্লাহ্ তাঁর কর্তৃত্বে কোন অংশীদার রাখেননি। মানুষ যাদেরকে তাঁর অংশীদার ভাবে, আল্লাহ্ তা থেকে মুক্ত, পবিত্র।

আবার আল্লাহ্ বহু অবাধ্য জনপদকে ধ্বংস করেছেন প্লাবন, প্রস্তর বৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতির মাধ্যমে এবং সীমালঙ্ঘনের জন্য ফিরআ'উনের সম্প্রদায়কে তিনি সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছেন। পবিত্র কোরআনে এরকম বহু ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যার নিদর্শন বিভিন্ন জনপদে এখনও বিদ্যমান। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"আমি আদ ও সামুদ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আমি সংহার করেছি কারুন, ফিরআ'উন ও হামানকে। এদের সবাইকেই আমি তাদের নিজ নিজ গুণাহের কারণে পাকড়াও করেছি; এদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তর সহ প্রচন্ড ঝটিকা, তাদের কাউকেও আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকে আমি প্রথিত করেছি ভূ-গর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। মূলত আলাহ্ তা'আলা এমন ছিলেন না যে, তিনি এদের ওপর যুলুম করেছেন, যুলুমতো বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছে।"

আল কোরআন, সুরা আনকবুত, আয়াত-৩৮, ৩৯,৪০

এ সকল বিবরণই চলমান পৃথিবীতে বিগত দিনে সংঘটিত হওয়া ধ্বংসাত্বক ঘটনার বর্ণনা। পৃথিবীর সর্বশেষ ধ্বংসের ঘটনা হিসেবে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটনের হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। আল্লাহ্ আদেশ করা মাত্রই আকাশমন্ডলী সহ সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এটাই হবে পৃথিবীর সর্বশেষ ধ্বংসাত্মক ঘটনা। এরপর পুনরুত্থান তথা বিচার দিবস বা কর্মফল দিবসের সূচনা হবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে– একটি মাত্র ফুৎকার, পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। আকাশ বিদীর্ন হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে।"

আল-কোরআন। সুরা হাক্কা, আয়াত -১৩- ১৬

উপরের আলোচনা থেকে এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে, সৃজন, প্রতিপালন তথা ধ্বংস সাধন সহ সর্বময় কর্তৃত্বই কেবলমাত্র এবং একমাত্র আল্লাহ্র ইখতিয়ারভুক্ত, এখানে অন্য কোন সত্তার কোন প্রকার হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। হিন্দুধর্মালম্বীদের ত্রিত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাসের কোন দলীল নেই, তাই তাদের এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, অবান্ড্র এবং অবাস্তব; উপরন্তু তা শির্ক সংঘটিত হবার কারণ।

খ্রিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের ঈশ্বরের ধারণা: খ্রিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরাও ত্রিত্বে (Trinity) বিশ্বাসী। তাদের মতে ঈশ্বরের তিন রূপ– পিতা (প্রভু), পুত্র (যীশুখ্রিষ্ট) এবং পবিত্র আত্মা (জিবরাইল আঃ মতান্তরে মারইয়াম)। তারা এই তিন সত্তাকে একাত্ম বলে গণ্য করে। তারা যিশু খ্রীষ্টকে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে এবং যিশু ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের সমস্ত কর্তৃত্বের অংশীদার বলে বিশ্বাস করে। এখানে সৃজন কর্তৃত্বে ত্রিশক্তির ধ্যান-

ধারণা আল্লাহর একক কর্তৃত্বের মর্যাদা ক্ষুন্ন করায়, রুবুবিয়্যার শির্ক সংঘটিত হয়। কিন্তু পবিত্র কোরআনে তাদের এ রুবুবিয়্যাতে ত্রি-শক্তির অস্তিত্বকে খণ্ডন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

"ঈসা মসীহ্ তো আল্লাহর রাসুল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলে ঈমান আন এবং বল না তিন, নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ্; তাঁর সন্তান হবে–তিনি তো তা হতে পবিত্র। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই; কর্মবিধানে তিনিই যথেষ্ট।"

আল কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত-১৭১

পার্শীদের ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা: অগ্নি উপাসক পার্শীদের ধারণামতে মৃত্যু, ধ্বংস কিংবা কোন অমঙ্গল এক ঈশ্বরের পরিবর্তে তৃতীয় কোন অশুভ বা দুষ্ট আত্মার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। তারা মনে করে ভাল কাজের জন্য ঈশ্বর এবং অশুভ কাজের সাথে ঈশ্বরের সম্পৃক্ততা থাকতে পারে না এবং তা একান্তই দুষ্ট আত্মার প্রভাব। এখানে দুষ্ট আত্মাকে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের শরীক করায় শির্ক এ রুবুবিয়্যাত হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

"আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম, অতপর তা বিধ্বস্ড় হয়ে মুখ থুবরে পড়ে থাকল, কত কুপ পরিত্যাক্ত হয়ে পড়ল, কত সখের সুন্দর প্রাসাদ বিরান হয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে গেলো।"

আল কোরআন, সুরা হাজ্জ, আয়াত-৪৫।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন সৃষ্টি করেন তেমনি মৃত্যু, ধ্বংস, কল্যাণ-অকল্যাণ সবই তাঁর আয়ত্ত্বাধীন। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের কোন অংশীদার নেই। সুতরাং তাদের এ বিশ্বাস শির্ক।

মুসলিমদের ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা: আমরা মুসলমানগণ তাওহিদী আকিদা অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী। আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে সার্ভভৌম ক্ষমতা ও একক কর্তৃত্বের অধিকারী বলে মান্য করি এবং এক আল্লাহ্র ইবাদত করি। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যেও অনেকের ধারণা যে সাধু, সুফি, অলি তথা বুজুর্গ ন্যায়পরায়ণ মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরে, পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সেহেতু পরম ভক্তরা মনুষ্য-আত্মাকে এই জীবনের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের দৈব ক্ষমতার অধিকারী বলে ধরে নেয় যা প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল গায়েবী নিয়ন্ত্রনে বিশ্বাস। কিছু কিছু মুসলিমদের কাছে "কুতুব" একটি অন্যতম গায়েবী কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত। ধারণা করা হয় যে, এই কেন্দ্রের মাধ্যমেই পৃথিবীর সব বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু বিষয়টি মোটেই সঠিক নয়। কেননা বিশ্ব পরিচালনার কর্তৃত্ব শুধুমাত্র আলাহ্ তা'আলার। সেখানে হস্ড়ক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা আলাহ্ কাউকে দেননি। যেমন পবিত্র কোরআনে পরিস্কারভাবে বর্ণিত আছে,

"মহান সেই পূণ্যময় সত্তা, যার হাতে সার্বভৌমত্ত, সব কিছুর উপর তিনি একক ক্ষমতাবান।"

আল কোরআন, সুরা মুলক, আয়াত-১

তিনিই আলাহ্ তা'আলা, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই; তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পূত-পবিত্র, তিনি শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনিই মাহত্ম্যের একক অধিকারী। তারা যাদের শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তা'আলা সে সব কিছু থেকে পবিত্র, মহান।"

আল কোরআন, সুরা হাশর, আয়াত-২৩।

এ আয়াতসমূহ থেকে বিষয়টি অত্যন্ত পরিস্কার যে আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে থেকে গাউস, কুতুব কিংবা আবদাল প্রভৃতি নামের কোন অলিদেরকে পার্থিব বা অপার্থিব কোন বিষয় পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করার কর্তৃত্ব দান করেন না। তাই যে বিষয়াদি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইখতিয়ারে সেখানে এ ধরনের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রকে মা'বুদের মর্যাদায় উন্নীত করা নিতান্তই গর্হিত কাজ এবং শির্ক।

মুসলিমদের আচার-আচরণে র"বুবিয়্যাতে অংশীদারিত্বের আরো কিছু ধরনের শিরক সংঘটিত হয়ে থাকে। এ শিরকের একটি গুর"ত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে হুকুমের শিরক। **হুকুমের শির্ক** বলতে বুঝায় হুকুম বা বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আলাহ্র পরিবর্তে গায়র"াহকে অধিকার দেয়া বা হিস্যাদার মনে করা। আলাহ্ তা'আলা যেমন আসমান ও যমীন এবং এতদোভয়ের মধ্যে সমস্ড় কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তেমনি বিধান দাতা হিসেবেও সকল কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে। আলাহ্র যমীনে আলাহ্র আইন প্রতিষ্ঠিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক, বাস্ড়বসম্মত এবং এটাই ইসলামের দাবী। আলাহ্ তা'আলা আমাদের রব হওয়ার কারণে বিধানদাতা হিসেবে একমাত্র তাকেই মেনে নিতে হবে। পবিত্র কোরআনে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে,

"জেনে রাখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই (আল্লাহ্) আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ড় দয়ালু ও বরকতময়।"

আল কোরআন, সুরা আরাফ, আয়াত-৫৪।

আলাহ্র বিধান মতে জীবন পরিচালনা করার মধ্যেই মূলত নিহিত রয়েছে মানুষের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও স্বার্থকতা। সেক্ষেত্রে আলাহ্র বিধান পরিপন্থী অন্য কারো বিধান মেনে নেয়া হলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ড়দের অন্ড়র্ভুক্ত হয়ে পড়বে। শর'ই বিধানের মূল উৎস হচ্ছে দু'টি; এর মধ্যে একটি হচ্ছে মহান আলাহ্র বাণী পবিত্র কোরআনুলকারীম এবং অন্যটি হচ্ছে সহীহ হাদিস। এ'দুটির মধ্যে যদি কোন বিষয়ের সুস্পষ্ট বক্তব্য না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কোরআন ও হাদিসের আলোকে কিয়াস এবং এজমার ভূমিকা রয়েছে। তবে কোরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট দলীল থাকা অবস্থায় এজমা ও কিয়াসের কোন সুযোগ নেই। এমতবস্থায় কারো পক্ষে ইজতেহাদ করা বা নিজস্ব মতবাদ ব্যক্ত করারও কোন অবকাশ নেই। যদি কোন আলেম বা বুজুর্গ শরিয়াতের সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্বেও সেটাকে পাশ কাটিয়ে নিজস্ব ইজতেহাদী মতবাদ বা বিকল্প বিধান চালু করার প্রচেষ্টা করেন তবে সেটা হবে চরম গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা এবং কঠিন গুণাহের কাজ। বস্তুতঃ শরিয়াতের বিধানে তারা নিজেদেরকে মহান রবের হিস্যাদার তৈরী করে শির্কের গুণাহে লিপ্ত হবে। আর যারা অন্ধভাবে এসব আলেমদের অনুসরন করবে তারাও শির্কের মধ্যে নিপতিত হবে।

কোরআন এবং হাদিস দ্বারা বর্ণিত শরিয়তে নির্ধারিত ইবাদতের যে কোন বিধান যেমন সালাত, সওম ও হজ্জ, যাকাত সম্পর্কিত বিধানগুলি যথাযথ নিয়মে পালন করা কর্তব্য। এর মধ্যে কোনপ্রকার পরিবর্তন, বিয়োজন কিংবা পরিবর্ধনের কোন সুযোগ নেই। যদি আল্লাহ্র বিধানের পরিপন্থী অন্য কার হুকুম তামিল করা হয় বা তাকে আল্লাহ্র মত হুকুমদাতা বলে মান্য করা হয় তাহলে সেটা শির্ক হবে। যেমন কারো কথায় নামাজ কাযা করা, নামাজে কম-বেশী করা বা নামাজের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আনা কিংবা শরিয়তের ওজর ছাড়া কারো আদেশে রোযা ছেড়ে দেওয়া, মানুষের কথায় হজ্জ পরিত্যাগ করা বা হজ্জের বিধানে কোন পরিবর্তন আনা, যাকাতদানে বিরত থাকা, মনের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী ইবাদত করা, বিদ'আতের প্রচলন করা ইত্যাদি শির্ক। আবার হালাল-হারামের বিধান যেমন শুকরের মাংস, গায়রুল্লাহর নামে জবাইকৃত জন্তুর গোশত, মদ, জুয়া, সুদ ইত্যাদি আল্লাহ স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা

করেছেন; কিন্তু মানুষের তৈরী আইন যদি এগুলোকে বৈধতা দান করে এবং হালালকে হারাম করে আর হারামকে হালাল করে, তবে সেটা মানা যাবে না।

এ জাতীয় শির্কের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইন প্রনয়ণের শির্ক। রাষ্ট্রীয় শির্ক হচ্ছে মানুষ হয়ে মানুষের স্বার্ভভৌমত্ত মেনে নেওয়া ও মানব রচিত মনগড়া হুকুম ও বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা। শাসন-প্রশাসন, বিচার-ফয়সালা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে কোরআন পরিপন্থী মানুষের তৈরী কোন আইন প্রযোজ্য হবে না। রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে আলাহ্‌র আইন দ্বারা। কেননা আলাহ্‌ই একমাত্র বিধান দাতা। সেখানে অন্য কাউকে আলাহ্‌ বিরোধী আইন প্রনয়ণের নুন্যতম ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে,

"আলাহ্‌ ছাড়া আর কারো আইন বিধান জারি করার অধিকার নেই।"

আল কোরআন, সুরা ইউসুফ, আয়াত-৪০।

অতএব যে সকল বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে এর কোন পরিবর্তন ও সংস্কার করার অধিকার কারো নেই বা যারা পরিবর্তন করে তাদের অনুসরণ করারও কোন বৈধতা নেই। আলাহ্‌দ্রোহী শক্তির আইন বিধান জারি করা ও তা মান্য করাও শির্ক। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই আলাহ্‌ আইনকে পাশ কাটিয়ে মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন ও বিচার কার্য পরিচালনা করা হচ্ছে। তারা দেশ পরিচালনায় আলাহ্‌র বিধানকে অনুপযোগী মনে করেন এবং মানব রচিত আইনী ব্যবস্থাকে শ্রেয় মনে করে নিজেদের সুবিধামত আইন প্রনয়ণ করে নিচ্ছেন। তবে বাস্ড়ব কথা হচ্ছে যারা এরূপ ধ্যান-ধারনা পোষণ করে এ ব্যবস্থাকে কার্যকর বলে চালিয়ে নিচ্ছেন তারা নিশ্চিত গোমরাহীতে নিপতিত হচ্ছেন। উপরন্তু যারা শাসনকার্যে অধিষ্টদের এহেন অপকর্মের আনুগত্য করে যাচ্ছেন নির্দ্বিধায়, তারাও মূলত আলাহ্‌র হুকুম-আহকামে ঐ সমস্ড় নেতাদেরকে শরীক সাব্যস্ড় করে রুবুবিয়্যাতের শির্কে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিসাসের বিধান, মিরাসের বিধান, পর্দার বিধান, চুরীর সাজা, ডাকাতির সাজা ইত্যাদি বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে শরীয়তে বিবৃত আছে। এখানে কোন প্রকার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা বৈধ নয়। কিন্তু মানব রচিত আইনের প্রনেতা, রক্ষক ও অনুসারীরা মানুষের স্বার্বভৌমত্বের নামে আলাহ্‌র বিধানের পরিবর্তে নিজেরাই আইন-বিধান প্রনয়ণ করে তার আনুগত্য করার মাধ্যমে শির্কে লিপ্ত হচ্ছে এবং জাতির মানুষকেও সেই শির্কে নিমজ্জিত হতে বাধ্য করছে। এ ধরনের অপকৌশল নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ বলে গণ্য হবে এবং এদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে কঠোর শাস্তি। এদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,

"এদের কি এমন কোন শরীফ আছে, যারা এদের জন্য এমন কোন জীবন বিধান প্রণয়ণ করে নিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ্‌ তা'আলা দেন নি। ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয় তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি "

আল কোরআন, সুরা শুরা, আয়াত-২১।

যারা মানুষের জন্য শরিয়ত বিরুদ্ধ বিধান তৈরী করে জনগনের উপর তা চাপিয়ে দেন, তাদের জন্য এখানে কঠিন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এদের সকলের ফয়সালা হবে কিয়ামতের মাঠে। অন্যথায় তাদেরকে পার্থিব জীবনেই কঠোরভাবে পাকড়াও করা হতো। কাজেই যারা এ ধরনের অপকর্ম করে নিশ্চিন্তে দিনাতিপাত করছেন তাদের স্মরণ করা উচিত আখিরাতের সে কঠিন দিনের কথা যেখানে প্রস্তুত রাখা হয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। সাড়া জাহানের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ্‌পাক। তিনি তাঁর প্রতিনিধি দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়ে থাকেন। রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাও তাই

শরিয়াতের বিধান মোতাবেক রচনা হওয়া উচিত এবং সে মোতাবেকই রাষ্ট্র পরিচালনা হওয়া বাঞ্ছণীয়। কিন্তু তা না করে নিজেদের মনগড়া বিধান তৈরী করা এবং তা জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া এক প্রকার যুলুম। অধিকন্তু এ ধরনের আচরণ বিধানদাতা হিসেবে সর্বশক্তিমান আলাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করারই নামান্ড়র এবং ধর্মহীনতার পরিচায়ক। এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন,

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ন করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয়না, তারাই কাফির।"

আল কোরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত- ৪৪।

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ন করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয়না, তারাই যালিম।"

আল কোরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত-৪৫।

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ন করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয়না, তারাই ফাসিক।"

আল কোরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত- ৪৭।

খ) অস্বীকৃতির শির্ক (Shirk by Negation)

এ ধরনের শির্ক সংঘটিত হয় যখন দর্শণ ও ভাবতত্ত্বে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অস্বীকার করা হয়। যে ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সরাসরি নাকচ করে দেয়া হয়, সে ধরনের মতবাদ নাস্তিক্যবাদ (Atheism) নামে অভিহিত। উদাহরণসরূপ: অনেক প্রাচীন ধর্মীয় রীতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। এর মধ্যে বুদ্ধ ধর্ম বিশেষ উল্ল্যেখযোগ্য। এ ধর্মে কোন ঈশ্বর নেই, সুতরাং সংরক্ষণের দায়িত্ব ব্যক্তির নিজেরই। অনুরূপভাবে জৈন ধর্মেও ঈশ্বর বলে কোন সত্তা নেই; তবে মৃত আত্মা এই ধরনের অমরত্ব ও সর্বজ্ঞতার মর্যাদা লাভ করে। তাই লোকেরা তাদের সমাধিতে মন্দির তৈরী করে এবং প্রতিমূর্তি স্থাপন করে শ্রদ্ধা জানায়। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত মৃত্যুর পরে মানুষের সকল আমল স্থগিত হয়ে যায় এবং পার্থিব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ্কে অস্বীকার করে, মৃত আত্মাকে মা'বুদের মর্যাদায় উন্নীত করা শির্ক বই কিছু নয়।

প্রত্যক্ষ অস্বীকৃতির শির্ক-এর আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, হযরত মুসা (আঃ) এর যুগের 'ফিরআ'উন'। ফিরআ'উন কুফরী করেছিল। তার মনে কুফরী বদ্ধমূল থাকার কারণে সে বারবার সত্যকে অস্বীকার করে নিজের হঠকারী স্বভাবের উপর অটল রয়ে যায়। হক তথা সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও হতভাগ্য ফিরআ'উন ঈমান আনতে ব্যর্থ হয়। সে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল মুসা (আঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, এমনকি আল্লাহ্র অস্ড়িত্বকেই অস্বীকার করে বসল। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"ফিরআ'উন বললঃ হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা।"

আল কোরআন, সুরা কাসাস, আয়াত-৩৮।

এভাবে ফিরআ'উন বিদ্রোহী হয়ে গেল এবং তার স্বগোত্রের কাছে নিজেকে সবচেয়ে বড় মাবুদ বলে ঘোষণা দিল। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"সে (ফিরআ'উন) সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করল আর বললঃ আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় 'রব'।"

আল কোরআন, নাযিয়াত, আয়াত-২৩,২৪।

ফিরআ'উনের এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ অস্বীকৃতির শির্ক সংঘটিত করেছে। তার এই ঔদ্ধত্ব ও হঠকারীতার কারণে আলাহ্ তা'আলা তাকে পাকড়াও করেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা পার্থিব শাস্তি হিসাবে তাকে তার সংগীদের সহ সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছেন এবং পরবর্তীদের শিক্ষার জন্য তার দেহটিকে নজির হিসাবে সংরক্ষণ করেছেন। পবিত্র কোরআনে আলাহ্ এরশাদ করেছেন,

"ফিরআ'উন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল, ওরা ধওে নিয়েছিলো, ওদেও কখনো আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে না। অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ যালিমদের পরিনাম কি ভয়াবহ হয়ে থাকে।"

আল কোরআন, সুরা কাসাস, আয়াত:৩৯-৪০।

"আজ আমি তোমার দেহটি সংরক্ষণ করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক।

আল কোরআন, ইউনুস আয়াত-৯২।

তার জন্য এই দুরিয়ার শাস্ড়িই শেষ নয়; বরং পরকালে তার এবং তার বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করছে জাহান্নামের কঠিন শাস্ড়ি। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন,

"কিয়ামতের দিনে সে (ফিরআ'উন) তার সঙ্গী-সাথীদের সহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তা কত নিকৃষ্ট স্থান! এই দুনিয়ায় তাদের করা হয়েছিল অভিশপ্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হবে তারা কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট এ পুরস্কার, যা তাদের সেদিন দেয়া হবে"

সুরা হুদ, আয়াত:৯৮-৯৯।

ডারউইনের বিবর্তনবাদও তেমনি আর একটি অস্বীকৃতির শির্ক। এ মতবাদ অনুযায়ী প্রাণহীন পদার্থ থেকে আল্লাহ্র কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই জীবন সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেন,

"হে মানব! তোমার প্রতিপালককে (আল্লাহ্) ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (হযরত আদম আঃ) হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন। যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।"

আল-কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত-১।

সৃষ্টির সূচনা করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা এবং অন্য কারো হস্তক্ষেপ ছাড়াই তিনি এর ধারাবাহিকতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। সৃজন কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্র। সুতরাং ডারউইনের বিবর্তনবাদে আল্লাহ্র সৃজন কর্তৃত্বকে নাকচ করে দিয়ে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়েছে এবং শির্ক সংঘটিত হয়েছে।

অন্য প্রকারের অস্বীকৃতির শির্ক সংঘটিত হয় পরোক্ষভাবে। এখানে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে বলে দাবী করলেও তাদের উপলব্ধি এবং প্রকাশ ভঙ্গিতে কার্যত কোন মিল নেই, যা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অস্বীকৃতিরই নামান্তর। এই মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ (Polytheism) নামে আখ্যায়িত করা হয়। উদাহরণসরূপ, মুসলমানদের মধ্যে কিছু সুফী দাবী করে যে, সর্বত্র কেবল আল্লাহ্রই অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ আল্লাহ্ই সব আবার সবকিছুই আল্লাহ্। সব মানুষের মধ্যেই আল্লাহ্ বিরাজ করেন। তারা আল্লাহ্র আলাদা কোন অস্ড়িত্ব স্বীকার করে না, যা মূলত আল্লাহ্র অস্বীকৃতিরই নামান্তর। কিছু ওলন্দাজ ইহুদি দার্শনিকেরও একই মতবাদ। তাদের ধারণা মানুষ সহ বিশ্বের সবকিছুর মিলিত অস্তিত্বই হচ্ছে ঈশ্বর। কিন্তু এ আধ্যাত্মিক ধারণাটি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন এবং বাস্তবতা বর্জিত। আল্লাহ্ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা এবং

আসমান যমীন সহ এর মধ্যবর্তী সব কিছু তাঁর সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা আর সৃষ্টি কখনও এক হতে পারে না। তাই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বাস্তবতা বর্জিত বা বিরোধী ধারণা পোষণ করার কারনে শির্‌ক সংঘটিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন এভাবে,

"তিনিই তো আলাহ্‌, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। কোনো (সাধারণ) দৃষ্টি তাকে দেখতে পায়না, তিনি সবকিছুই দেখতে পান, তিনিই সুক্ষ্মদর্শী এবং সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।"

আল-কোরআন, সুরা আনআম, আয়াত:১০২-১০৩

"দয়াময় আলাহ্‌ মহান আরশের উপরে অবস্থান করেন।"

আল-কোরআন, সুরা তাহা, আয়াত-৫

"তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত হয়ে আছে।"

আল-কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত-২৫৫;

এ আয়াত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ নিজেই তাঁর অবস্থান সম্পর্কে মানুষকে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন যে, তিনি মহান আরশে অধিষ্টিত। তবে আল্লাহ্‌ কি ভাবে আছেন, কি অবস্থায় আছেন, কেমন করে আছেন তা তিনি ছাড়া কেউই জানে না। কিন্তু তিনি নিজ সত্তা সহ কোন সৃষ্টির মধ্যে কিংবা সর্বস্থানে অবস্থান করেন না। তিনি সব কিছু দেখেন এবং সমস্ত কিছুর জ্ঞান তাঁর কাছে রয়েছে। কিন্তু মানুষের পক্ষে তাঁকে অবলোকন করা সম্ভব নয়। বিশ্বভ্রহ্মান্ডের কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয় কিংবা তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। সুতরাং আলাহ্‌ তা'আলা সকল মানুষের মাঝে অবস্থান করেন বলে সুফীবাদের ধারণাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবাস্তব এবং আল্লাহ্‌ সম্পর্কিত তাদের এ ধারণা এক ধরনের রবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে শির্‌ক হিসেবে বিবেচিত।

(Shirk in the Area of Divine Names & Attributes)

'আসমা' এবং 'সিফাত' দু'টোই আরবী শব্দ; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে নামাবলী এবং গুণাবলী। আল্লাহ্‌র পবিত্র নামাবলী এবং গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যের স্বত্ত্বাধিকারী একমাত্র তিনি। আলাহ্ তা'আলার নামাবলী ও গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, কারো সাথে কোন প্রকার সদৃশ্য ছাড়াই তিনি এককভাবে এসব গুণে গুণান্বিত রয়েছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার কেউই তাঁর এসব নামে নামান্বিত ও গুণান্বিত হতে পারে না। এগুলোর ক্ষেত্রে একাত্ববাদী হওয়ার অর্থ হচ্ছে– একথা মনে প্রানে স্বীকার করা যে, আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নামাবলী এবং তাঁর সুমহান গুণাবলীর সাথে অন্য কোন ব্যক্তি সত্তা বা অন্য কারো কোন গুণাবলীর কোনই তুলনা নেই। এ বিশ্বাসের ব্যতিক্রম হলে বা কোন আচরণের মাধ্যমে এর কোন ব্যতিক্রম প্রমাণিত হলে এই প্রকারের শির্‌ক সংঘটিত হয়ে থাকে। **আসমা অস্ সিফাতের শির্‌ক হলো বিশ্বাসে, কথায় বা কাজে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তার সাথে এবং তাঁর গুণাবলীর সাথে অন্য কোন ব্যক্তি সত্তা ও কারো কোন গুণাবলীর তুলনা বা সদৃশ্য স্থাপন করা।**

আল্লাহ্ তা'আলার রয়েছে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নাম। এ নামগুলির মধ্যে রয়েছে তাঁর জাত এবং সিফাতের পরিচয়। এসব নামের মধ্যে কেবল একটি নাম হচ্ছে তাঁর জাতি বা সত্তাগত নাম– সে নামটি হচ্ছে 'আল্লাহ্'। আর অবশিষ্ট নাম সমূহ হচ্ছে তাঁর সিফাতী বা গুণগত নাম। মহান আলাহ্‌র জন্য যে সমস্ড় পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী নির্ধারিত আছে– আলাহ্‌র নামসমূহ সেই গুণাবলীর অকাট্য প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি নামই আলাহ্‌র বিশেষ বিশেষ গুণবৈশিষ্ট্য প্রকাশক নাম। যেমন তাঁর সে নামের মধ্যে রয়েছে, রাহমান- অর্থাৎ পরম করুণাময়, রাহিম– পরম দয়ালু, খালেক- সুষ্টিকর্তা, রাজ্জাক- রিযিকদাতা, বাছির- সর্বদ্রষ্টা, কাইউম-সবকিছুর ধারক, মুদাব্বির- সব কিছু পরিচালনাকারী ইত্যাদি। মহান আলাহ্ এসব গুণের অধিকারী হয়েছেন বলেই তিনি এ জগতের সবকিছুর রবের আসনে সমাসীন হয়েছেন। আলাহ্‌র জাত সত্তাকে এসব গুণাবলী থেকে কোন ভাবেই মুক্ত করা যাবেনা। আবার কোন সৃষ্টিকেও সে নামে অভিহিত করা যাবে না। আলাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কোরআন মাজীদে নিজের পবিত্র সত্তার জন্য যে সমস্ড় গুণবাচক নামের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন এবং রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলাহ্‌র জন্য যে সমস্ড় গুণবাচক নামের পরিচয় দিয়েছেন সেগুলিকে মনে প্রানে সমর্থন করতে হবে। আর এ সমর্থন এমনভাবে করতে হবে– যেন ঐ সমস্ড় গুণবাচক নাম আলাহ্‌র যথাযথ মহত্ব, মর্যাদা ও শান-শওকতের উপযুক্ত প্রমাণ বহন করে। এখানে বিশেষ কোন গুণাবলীর তুলনা করা, সদৃশ্য স্থাপন করা বা আলাহ্‌র সুন্দরতম নাম ও গুণাবলী সমূহকে আলাহ্‌র পবিত্র সত্তা হতে পৃথকভাবে চিন্ড়া করা কিংবা এর অর্থের কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও জটিল ব্যাখ্যা করা এবং মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করা– এ সমস্ড় কাজের কোনটাই জায়েয নয়। এভাবে সৃষ্ট জীবের গুনাবলীর সাথে আলাহ্‌র গুণাবলীর সদৃশ্য স্থাপন করাও না-জায়েয। স্রষ্টার নামের ও গুণের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তিনি তাঁর কোন সৃষ্টিকে সে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেন না বা সৃষ্টি নিজ প্রচেষ্টায়ও সে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে না।

তাওহিদী আকিদার দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যে কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই। আল্লাহ্‌র জাতসত্তা এবং সিফাতী বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কোন মনুষ্য, কোন প্রাণী বা কোন সৃষ্ট বস্তুই তাঁর সদৃশ্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা; অর্থাৎ তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। কিন্তু তাঁর এই দেখা ও শোনা কোনভাবেই মানুষ কিংবা অন্যকোন সৃষ্টির সাথে সদৃশ্যপূর্ণ নয়। আল্লাহ্ আলিমুল গায়েব; অর্থাৎ তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। আল্লাহ্ ছাড়া সৃষ্টির অন্য কেউই অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না। আবার পরম দয়ালু, মহাদাতা, প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ, চিরঞ্জীব প্রভৃতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণগত

বৈশিষ্ট্য। তাঁর এসকল গুণাবলীকে কোনভাবেই সৃষ্টির কারো গুণের সাথে তুলনা করা যাবে না। আলাহ্‌র জাত সত্তা এবং তাঁর এই গুণাবলীতে কোন নবী, রাসূল, পীর, অলী, ফকির, দরবেশ বা অন্য কোন মনুষ্য কিংবা সৃষ্টির কোন কিছুর কোন অংশ নেই। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে ব্যবধান আকাশ পাতাল। শুধু তাই নয় স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির ব্যবধান কল্পনারও উর্দ্ধে। সুতরাং কোন গুণবৈশিষ্ট্যে মানুষ কিংবা অন্য কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক স্থাপনের প্রচেষ্টা করা চরম ধৃষ্টতা ও মহাপাপ।

কিন্তু পৌত্তলিক রীতিতে বা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আচরণে আল্লাহ্‌র উপর তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়, অধিকন্তু সৃষ্ট প্রাণী বা বস্তুকে আল্লাহ্‌র নাম এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করা হয়, এ উভয় প্রকার আচরণই আসমা অস্ সিফাত এর শির্‌ক। এ শির্‌কের মূলত দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে:

- **মনুষ্যত্ত্বারোপণের শির্‌ক** (Shirk by Humanization) এবং
- **দেবত্বারোপণের শির্‌ক** (Shirk by Deification)

ক) মনুষ্যত্ত্বারোপণের শির্‌ক (Shirk by Humanization)

আল্লাহ্‌র উপর কোন মনুষ্য বা প্রাণীর অঙ্গ-বৈশিষ্ট্য এবং গুণাগুণ-বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হলে মনুষ্যত্ত্বারোপণের শির্‌ক সংঘটিত হয়। আল্লাহ্‌র জাতসত্তা এবং তাঁর কর্মের সাথে সম্পর্কিত অঙ্গ-বৈশিষ্ট্যের কথা পবিত্র কোরআন ও সহীহ্ হাদিসে বর্ণিত আছে। জাত সত্তার সাথে সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আল্লাহ্‌র হাত, পা, চক্ষু, আঙ্গুল ইত্যাদি থাকার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এর প্রকৃত রূপ বা আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তাই আমরা সেটা জানিনা। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেন, "আল-াহ্‌র গুণাবলী সমূহের প্রতি ঈমান আনায়ন করি, এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করি। তবে এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি জানি না (শির্‌ক কি ও কেন?- ডঃ মুহাম্মদ মুযযাম্মিল আলী)।

বস্তুত আল্লাহ্‌র অঙ্গ-বৈশিষ্ট্যের আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি অবস্থা সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। তবে এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে সৃষ্টজীব বা সৃষ্টপ্রাণীর আদৌ কোন সামঞ্জস্য নেই। তাঁর অবয়ব এবং আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কিত বিষয়াদি মানুষের দৃষ্টি শক্তির ধারণ ক্ষমতা এমনকি কল্পনারও উর্দ্ধে। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌র পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এভাবে,

"দৃষ্টি তাঁকে অবধারণ করতে পারেনা কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।"

আল-কোরআন। সুরা আনআম, আয়াত- ১০৩

তাওহীদি আকিদার দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সদৃশ্য কোন কিছুই নেই বা কোন কিছুই আল্লাহ্‌র সাথে তুলনীয় নয়। আল্লাহ্ কোন মনুষ্য, কোন সৃষ্ট প্রাণী বা বস্তুর সদৃশ্য নন। পবিত্র কোরআনে পরিস্কার বলা হয়েছে,

"কোন কিছুই তাঁর (আল্লাহ্‌র) সদৃশ্য নহে।"

আল কোরআন, সুরা শুরা, আয়াত-১১।

আল্লাহ্‌র সমস্ত নাম এবং বৈশিষ্ট্যাবলী একান্তই তাঁর নিজস্ব। আল্লাহ্ শাশ্বত। আল্লাহ্‌র কোন প্রতিমূর্তি নেই। আল্লাহ্‌কে মানুষের আকৃতি প্রদান করা বা তাঁর উপর মনুষ্য বৈশিষ্ট্য অর্পণ করা ইত্যাদি তাওহিদী আকিদার পরিপন্থী এবং এ সকল বিশ্বাস ও আচরণ মনুষ্যত্ত্বারোপনের শির্‌ক এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তবুও

বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতিতে আল্লাহ্‌কে মানুষ বা প্রাণীর আকৃতিতে কল্পনা করা হয় এবং তাঁর উপর এদের অঙ্গ-বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে মানুষের আকৃতিতে ঈশ্বরের ছবি তৈরি করা হয় অথবা মাটি দিয়ে বা পাথর খোদাই করে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তৈরি করা হয় এবং এগুলির উপাসনা করা হয়। উদাহরণসরূপ: প্রাচীন আরবদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল। তাদের বিভিন্ন গোত্রের অনেকগুলি মূর্তি ছিল, যে মূর্তিগুলির নামকরণ করা হত আল্লাহ্‌র নাম থেকে উদ্ভূত নাম দিয়ে। তাদের তিনটি গোত্রের প্রধান তিনটি মূর্তির নাম 'লাত', 'উয্‌যা' এবং 'মানাত' যথাক্রমে আল্লাহ্‌র 'ইলাহ, 'আজিজ' এবং 'মান্নান' নাম থেকে আহরিত হয়েছিল। এগুলিকে তারা ইলাহ্ মানত এবং তাদের উপাসনা করত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন,

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত' ও 'উয্‌যা' সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে? এগুলো কতিপয় (দেবদেবীর) নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা ঠিক করে নিয়েছো, যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রমাণ নাযিল করেন নি। তারাতো অনুমান এবং নিজের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পথ নির্দেশ এসেছে। মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়? বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই।"

আল-কোরআন। সুরা নাজম, আয়াত ১৯-২০, ২৩-২৫

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে তাদের প্রতিমা উপাসনার আকিদা ব্যাখ্যা করে এর বৈধতা নাকচ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, 'লাত' 'উয্‌যা' এবং 'মানাত' কতগুলি দেবদেবীর নাম মাত্র যা তাদের পূর্বপুরুষেরা এবং তারা নিজেরা রেখেছে, যার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক নেই এবং তিনি এর সমর্থনে কোন দলীল প্রমাণও প্রেরণ করেন নি। প্রতিমূর্তিগুলি প্রকৃতপক্ষে মা'বুদও নয় এবং এরা কোন পবিত্র নামের হকদারও নয়। এগুলো সব অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনাপ্রসূত ধারণার ফসল মাত্র এবং তারা কেবল প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। কিন্তু প্রতিপালকের নির্দেশ আসার পরেও যারা এ আচরণে লিপ্ত থাকে তারা কখনই সফলকাম হতে পারে না এবং পরিণামে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পৌত্তলিকতা সহ সকল প্রকার শির্‌কের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। তাই তিনি মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে এসব প্রতিমাগুলি এদের গৃহ সহ ভূমিসাৎ করে দেন। এভাবে তিনি মূর্তিপূজার শির্‌ক মূলোৎপাটনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মানুষ পূর্বপুরুষদের আকিদাগত আচরণ এবং নিজের প্রবৃত্তির গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই বর্তমান যমানার বাস্তবতায় পৌত্তলিক প্রথার প্রচলন পরিদৃষ্ট হয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে। বিভিন্ন ধর্মীয় রীতিতে অগনিত কল্পিত দেব-দেবীর মূর্তি নির্মান করা হচ্ছে এবং এদেরকে মা'বুদের মর্যাদা প্রদান করে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ জ্ঞান করা হচ্ছে। উদাহরণসরূপ: হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় সাধারণ এশিয়ান মানুষের আকৃতিতে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরী করে থাকে এবং এদেরকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করে মা'বুদের মর্যাদা দিয়ে থাকে। কারণ এগুলিকে তারা ঈশ্বরের প্রতীক এবং অস্তিত্ব হিসাবে বিবেচনা করে। কিন্তু তারা কখনই ঐ দেবতাগুলোর উপাসনা করার সপক্ষে কোন দলীল পেশ করতে সক্ষম হবে না। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের উপর ভাল ধারণা পোষণ করে তাদের অনুকরণ সহ নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে মাত্র। এ ধরনের শির্‌কী আচরণ অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে বেহায়ার পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। ইন্ডিয়াতে বহু হিন্দু তাদের দেবতা শিব-লিঙ্গের পুজা করে থাকে। এটি পুরুষ প্রজনন অঙ্গের আকার আকৃতি সম্বলিত একটি প্রতিমূর্তি। তাদের কাছে এটি ঈশ্বরের প্রজনন ক্ষমতার প্রতীক। তাই তারা এটাতে দুধ, জল, মাখন ইত্যাদি মর্দনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকে। খ্রিষ্টান সমাজও বিভিন্ন ভাবে এ ধরনের শির্‌কের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের একজন বড়মানের চিত্রকর ঈশ্বরের ছবি অংকণ করেছেন একজন লম্বা সাদা চুল ও দাড়ি বিশিষ্ট নগ্ন বৃদ্ধ ইউরোপিয়ান রূপে। পালাক্রমে এ চিত্রটি খ্রিষ্টান সমাজ বহু উচ্চমূল্য

সম্পন্ন বলে জ্ঞান করে। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলাকে মানুষ রূপে ভাবা এবং মনুষ্য আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা নিঃসন্দেহে চরম যুলুম এবং শির্ক।

খ) দেবত্বারোপনের শির্ক (Shirk by Deification)

সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টসত্তা বা সৃষ্টবস্তুর ব্যবধান অসীম। সৃষ্টি আর স্রষ্টা কখনও এক হতে পারে না। সৃষ্ট বস্তু বা প্রাণী কোন ভাবেই স্রষ্টার নাম বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে না। এমনকি সৃষ্টিকে তার স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করার প্রচেষ্টা করাও চরম ধৃষ্টতা। তাই যখন সৃষ্টসত্তাকে বা সৃষ্টবস্তুকে আল্লাহর নাম দেয়া হয় এবং তাঁর সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে দাবী করা হয়, অর্থাৎ সৃষ্টির উপর স্রষ্টার নাম ও বৈশিষ্ট্য আরোপন করে ঈশ্বর জ্ঞান করা হয়, তখন দেবত্বারোপনের শিরক সংঘটিত হয়। অজ্ঞতার কারণে মানুষ অনেক সময় সৃষ্টসত্তার উপর আল্লাহ্‌র গুণ-বৈশিষ্ট্য আরোপ করে এ শির্কে লিপ্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মানুষের উপর আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য আরোপের প্রবণতা সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। মূর্খ-ভক্তরা মনুষ্য সত্তাকে আল্লাহ্‌র সমস্তরে উন্নীত করে তাদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করে বসে। এ ভাবে বহু বিশিষ্ট ধার্মিক ব্যক্তিকে বা আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূলকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান করা হয়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এ জাতীয় আচরণ দৃষ্ট হয়। উদাহরণসরূপ: খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা যীশুখ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র এবং তাঁর একটি অংশ বলে মনে করে এবং তাকে অবতার জ্ঞান করে। তাদের বিশ্বাস যে, সৃষ্টিকর্তা রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে যিশুরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের এ বিশ্বাস চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক এবং শির্ক। কেননা অল্লাহ্‌ পবিত্র কোরআনে তাদের শির্ককে খন্ডন করেছেন এভাবে,

"মারইয়াম পুত্র মাসীহ তো রাসূল ছাড়া কিছুই ছিলো না।"

আল-কোরআন, সুরা মায়দা, আয়াত-৭৫।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এ প্রকারের শির্কের প্রচলন সর্বাধিক। তারা বিশ্বাস করে যে, ভগবান বিভিন্ন সময়ে অবতার রূপে পৃথিবীতে নেমে আসেন অধর্ম নাশ এবং মানুষের কল্যাণ সাধন করার জন্য। রাম, কৃষ্ণ, বামন সহ আরো অনেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্বকে তারা ঈশ্বরের অবতার গণ্য করে থাকে। এ ভাবে বিংশ শতাব্দীর কিছু ধর্মীয় নেতা যেমন, সাঁইবাবা, ভগবান রজনীশ, ডেভিড কোরেস সহ আরো অনেককে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী বলে দাবী করা হয়েছে এবং তারা চরম ভক্তদের মাঝে দেবতা জ্ঞানে পূজিত হয়ে আসছেন। কিন্তু আমরা জানি যে এদের সবাই মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে আবার মৃত্যুও হয়েছে এবং এরা সবাই ছিল মুখাপেক্ষী। তাই এদের ঈশ্বর হওয়ার ধারনাটি সম্পূর্ন বানোয়াট এবং অলীক চিন্ড়াধারার ফসল। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ঈশ্বরের কোন শুরু নেই এবং শেষও নেই, তিনি অবিনশ্বর, তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি জন্মগ্রহণ করেননি এবং তাঁর মৃত্যুও নেই, তার কোন পুত্র-কন্যা নেই এবং ঈশ্বর কখনও দেবতা, মনুষ্য বা অন্যকোন সৃষ্টির আকৃতিতে পৃথিবীতে আসেন না। তাই মনুষ্য বা অন্যান্য সৃষ্ট সত্ত্বাকে ঈশ্বর ভাবা বা ঈশ্বর জ্ঞান করা এবং কাউকে তাঁর পুত্র বা কন্যা সাব্যস্ড় করা শির্ক। আল্লাহ্‌ নিজের সর্ম্পকে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

"বল, তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি এক অদ্বিতীয়। তিনি কারোই মুখাপেক্ষী নন। তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, তিনিও কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি। আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউই নেই।"

আল কোরআন, সুরা ইখলাস, আয়াত-১-৪।

মুসলিমদের মধ্যেও এ শির্কের প্রচলন বিরল নয়। সিরিয়াতে ইসমাইলি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের নেতা আগা খানকে দেহধারী ঈশ্বর বলে বিবেচনা করা হত। লেবাননের একটি সম্প্রদায় ফাতমিয় খলিফা

'আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ'কে মানবজাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র সর্বশেষ প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করে। এগুলি সব ভিত্তিহীন এবং শির্‌ক। আবার, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জমানায় আরব অঞ্চলের ইয়ামামাহ নামের জনৈক ভূঁয়া নবী পরিচয়দানকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র 'রহ্‌মান' নাম ধারণ করেছিল, যা স্পষ্ট আসমা অস্ সিফাতের শির্‌ক। প্রসংগত উল্লেখ্য যে মহান আল্লাহ তা'আয়ালার অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গুনবাচক নাম আছে যেমন রাহিম, রহ্‌মান, করিম, খালেক, কাদের, রাজ্জাক, আজিজ ইত্যাদি। এ সকল কেবল মাত্র আল্লাহর গুণবাচক নাম। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন। তাই এর মধ্যে যে কোন নাম দিয়ে মানুষের নামকরণ করা হলে এ সকল নামের পূর্বে আবদ্ (আল্লাহর দাস) শব্দটি ব্যবহার করা অতি আবশ্যক। যেমন আবদুর রহিম, আবদুর রহমান, আবদুল করিম, আবদুল খালেক ইত্যাদি নামকরণ বৈধ।

অলোচনার এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র কতিপয় বিশেষ গুণাবলী এবং এর সাথে শির্‌কের বাস্তব সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা করা হল। আল্লাহ্ সকল গুনাবলীর আঁধার। আল্লাহ্‌র গুনাবলী অনুপম। তাঁর গুনাবলীর কোন শরীক নেই। ফিরিশতা, নবী, রাসূল, পীর আউলিয়া, দরবেশ, মানব, দ্বানব, জ্বীন প্রমুখ এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা, গাছ-পালা প্রভৃতি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সত্তা এবং আল্লাহ্‌র অনুগত দাস। কোনভাবেই এরা আল্লাহ্‌র ক্ষমতা এবং গুণাবলীর অধিকারী নহে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাঁর গুণাবলীর শরীক স্থাপন করে থাকে বিভিন্ন ভাবে। মানুষের বিশ্বাস এবং বাহ্যিক আচার-আচরণে যে ভাবে আল্লাহর গুণ-বৈশিষ্ট্যের শির্‌ক সংঘটিত হয় তার কিছু কিছু বাস্তব উদাহরন তুলে ধরা হল:

০ আলাহ্‌র ক্ষমতার শির্‌ক:

ক্ষমতার শির্‌ক বলতে বুঝায় আলাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতায় অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ড় করা। আল্লাহ্ অসীম ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি নিজ থেকেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, এটা তাঁর একটি বিশেষ গুণগত বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শণ তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন যায়গায়,

"আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা মানুষ হিসেবে যমীনে ছড়িয়ে পড়েছ। আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অবশ্যই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। তাঁর আরও নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তাঁর কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে এও একটি যে, তিনি তোমাদের প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা ভূমিকে ওর নির্জীব হয়ে যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁর আদেশেই আসমান যমীন নিজ নিজ অবস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। (তোমরা এক সময় মাটির ভেতর চলে যাবে) অতঃপর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে সে মাটির ভেতর থেকে উঠার জন্য ডাক দিবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তিনিই প্রথম সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনায়ণ করেন অতঃপর (কিয়ামতের দিন) তাকে পুনর্বার আবর্তিত করবেন, এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"

আল কোরআন, সুরা রূম, আয়াত-২০-২৭

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অনুপম শক্তি, তাঁর সৃজন ক্ষমতা ও পূর্ণ প্রজ্ঞার কথা বর্ণনা করা হয়েছে কতিপয় নিদর্শনাবলী উল্লেখের মাধ্যমে। কোরআনের আরও বহু জায়গায় কোথাও সংক্ষিপ্তাকারে আবার কোথাও বিস্তারিতভাবে তিনি এ ধরনের নিদর্শনাবলীর বর্ণনা করেছেন। এখানে যে ছয়টি নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে তার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

- আল্লাহ্র কুদরতের প্রথম নিদর্শন হচ্ছে মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের প্রতিনিধিকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করা। আদি মানব আদম (আঃ)-কে মাটি হতে পয়দা করে তার মধ্যে তিনি রূহ্ ফুঁকে দিয়ে মানব সৃষ্টির সূচনা করেন এবং মানব জাতিকে সর্বপ্রথম সৃষ্টির অস্তিত্বে আনায়ণ করেন। পরবর্তীতে শুক্রের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে মানুষকে সুন্দর অবয়বে গড়ে তুলেছেন। তাকে দিয়েছেন জ্ঞান, বুদ্ধি, বাকশক্তি, চিন্তাশক্তি এবং চলা-ফেরা করার ক্ষমতা। দৈহিক গঠন, আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সৃষ্টি করেছেন যাতে প্রত্যেকে মহান প্রতিপালকের বহু নিদর্শন নিজের মধ্যে ও অন্যের মধ্যে দেখে নিতে পারে।

- আল্লাহ্র কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করা। এদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ, প্রেম-ভালবাসা, দয়া আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার মনোভাব সৃষ্টি করে দেন যাতে একে অপরের কাছে শান্তি লাভ করতে পারে। এগুলো রাব্বুল আলামীনের একটা মেহেরবানী এবং তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার একটা নিদর্শন।

- আল্লাহ্র কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন এবং মানুষের মধ্যে ভাষা বৈচিত্র এবং বর্ণবৈষম্য। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গি আলাদা আলাদা। আরবী, ফার্সী, হিন্দী, ইরোজী ও বাংলা সহ অসংখ্য ভাষাভাষির লোক রয়েছে আল্লাহ্র যমীনে। পুরুষ ও নারীর কণ্ঠস্বরে রয়েছে বিভিন্নতা। বিভিন্ন অঞ্চলের অথবা একই অঞ্চলের মানুষের শারীরিক গঠন ও গায়ের রংয়েও রয়েছে বিভিন্নতা; কেউ শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ তামাটে আবার কেউ বা শ্যামলা বর্ণের, কেউ বেটে আবার কেউ বা লম্বা। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন তো শক্তির মহা নিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষা ও রংয়ের বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা।

- আল্লাহ্র কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন হচ্ছে দিবস ও রাত্রির সৃষ্টি। মানুষ রাতে নিদ্রা যায় আর দিবসে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকে, এটাই রাত্র ও দিবসের স্বাভাবিক নিয়ম। নিদ্রা কুদরতের একটি নিদর্শন। কেননা এর দ্বারা মানুষ দিবসের ক্লান্তি দূর করে এবং আরাম ও শান্তি লাভ করে পরবর্তী দিবসের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মশক্তি ও সামর্থ অর্জন করে থাকে।

- আল্লাহ্র কুদরতের পঞ্চম নিদর্শন হচ্ছে বিদ্যুতের চমক দেখান এবং আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করান। বৃষ্টি বর্ষণের ফলে যে ভূমি শুষ্ক হয়ে রসহীন মৃত মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছিল, সে জমিতে আবার প্রাণ ফিরে আসে এবং সতেজ হয়ে তাতে রকমারী প্রকারের ফসল ও ফল-ফুল উৎপন্ন হতে শুরু করে। এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন রয়েছে।

- আল্লাহ্র কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁর আদেশেই কায়েম আছে। হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরেও এগুলোতে কোথাও ক্ষুত বা ত্রুটি দেখা দেয়না। তিনি আকাশকে পৃথিবীর উপর ভেঙ্গে পড়তে দেন না; আসমানও যমীনকে ধরে আছে এবং ওকে ধ্বংস হতে রক্ষা করে। আল্লাহ্ আ'আলা যখন এই ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত অটুট ব্যবস্থাগুলো নিমিষেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। অতঃপর তাঁরই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে। –ইবনে কাসীর ও মা'আরেফুল কোরআন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃজন ক্ষমতা এবং প্রতিপালনের ক্ষমতার কথা বর্ণনা করে তাঁর দেয়া অসংখ্য নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআনের অন্যত্র:

"পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি তোমাদের কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন; তিনি মানুষ বানিয়েছেন, তিনি তাকে বলা শিখিয়েছেন। সুর্য ও চন্দ্র উভয়ই নির্ধারিত হিসাব মোতাবেক অবিরাম কক্ষপথ ধরে চলছে। তিনি আসমানকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ডে, যাতে তোমরা সীমা অতিক্রম না করো তূলাদণ্ডে। ভূমণ্ডলকে তিনি সৃষ্টিরাজির জন্য বিছিয়ে রেখেছেন, তাতে রয়েছে ফলমূল, খেজুর যা খোসার আবরণে থাকে; আরো রয়েছে ভুষিযুক্ত শস্যদানা ও সুগন্ধযুক্ত ফুল। তিনি মানুষকে বানিয়েছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুকনো ঠন্ঠনে মাটি থেকে এবং জ্বিনদের বানিয়েছেন অগ্নিশিখা থেকে। অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে!"

আল কোরআন, সুরা, আর রাহমান আয়াত-১-৫,৭-১২, ১৪-১৬

অন্য আয়াতে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রজ্ঞা ও বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"যাকে চান তাকে তিনি পূত্র-কন্যা উভয়টাই দান করেন, আবার যাকে চান তাকে তিনি বন্ধ্যা করে দেন; নিঃসন্দেহে তিনি বেশী জানেন, ক্ষমতাও তিনি বেশী রাখেন। কোন মানুষের জন্যেই এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি তার সাথে কথা বলবেন, অবশ্য ওহী দ্বারা অথবা পর্দার অন্তরালে থেকে কিংবা ওহী নিয়ে তিনি কোনো দূত পাঠাবেন। নিশ্চয়ই তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, প্রজ্ঞাময় কুশলী।

আল কোরআন, সুরা আশ শুরা, আয়াত-৫০-৫১

আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের এ নিদর্শনগুলো তাঁর স্বার্বভৌমত্ব ও একচ্ছত্র ক্ষমতার প্রতীক। তাঁর এ নিদর্শণসমূহকে যারা অস্বীকার করে তারা তো সরাসরি কাফের; আর যারা তাঁর এ নিদর্শনকে স্বীকার করা সত্বেও বিভিন্নভাবে তাঁর ক্ষমতায় অংশী স্থাপন করে তারা হচ্ছে মুশরিক। জন্ম, মৃত্যু, প্রতিপালন, সন্তান দান, আহার বা সম্পদ দান, বৃষ্টি বর্ষণ, মঙ্গল-অমঙ্গল সাধন, ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ, বালা-মুছিবত বা বিপদ থেকে উদ্ধার করা, প্রয়োজন পুরা করা ইত্যাদি সহ সকল ক্ষমতার মালিক কেবলমাত্র আল্লাহ্। তাঁর ক্ষমতার অংশীদার কেহই নাই। কিন্তু মূর্খ্য লোকেরা নানাভাবে আল্লাহর ক্ষমতা অন্যের উপর অর্পণ করে শির্কে লিপ্ত হয়ে পরছে। উদাহরণস্বরূপ: হিন্দু সম্প্রদায় ঈশ্বরের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভিন্ন কল্পিত দেব-দেবীর উপর ন্যস্ত করেছে। যেমন দূর্গা ও কালী- শক্তির দেবী, স্বরস্বতী- বিদ্যার দেবী, লক্ষ্মী- সম্পদের দেবী, গনেশ- ব্যবসা-বাণিজ্যের দেবতা ইত্যাদি এবং আরও অনেক দেব-দেবী বিভিন্ন ক্ষমতার ধারক বলে বিবেচিত। কিন্তু আল্লাহ্র ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবা অথবা শরীক স্থাপন করা চরম ধৃষ্টতা এবং শির্ক। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে তাদের এ শির্ককে খন্ডন করেছেন এভাবে:

"তারা তো আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য মা'বুদ গ্রহণ করেছে, এই আশায় যে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু এ সব মা'বুদ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয় তাদেরকে (ঐ মা'বুদ) তাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে (জাহান্নামে)।"

আল কোরআন, সুরা ইয়াসীন, আয়াত-৭৪-৭৫।

মুসলিম সমাজেও এ শির্কের কম-বেশী প্রচলন রয়েছে। মানুষের বিভিন্ন কার্য-কলাপে আল্লাহ্র ক্ষমতার শরীক স্থাপনের নজির খুঁজে পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজন পুরা করার জন্য, বালা-মুছিবত দূর করার জন্য, সম্পদ ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য মানুষ নবী, রাসূল বা পীর-আওলীয়ার দারস্থ হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা দরকার যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন নবী বা রাসুল, পীর, আউলিয়া,

দরবেশ, বুজুর্গ বা কোন ধার্মিক ব্যক্তি এ ধরনের ক্ষমতা রাখেন না। অধিকন্তু এদের ক্ষমতা সীমিত এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং সকলেই সদা আল্লাহ্র হুকুম তামিল করতে তৎপর থাকে। সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ্। অন্য কোন সৃষ্টির হাতে তিনি তা অর্পণ করেন নি। এতদসত্ত্বেও মানুষ বিভিন্নভাবে এদেরকে আল্লাহ্র ক্ষমতার শরীক স্থাপন করে ফেলে এবং মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজন পুরা করার জন্য নবী, রাসুল বা পীর-আউলিয়ার দারস্থ হয়। এ ধরনের আচরণ শির্ক। দলিল হিসেবে কোরআনের একটি আয়াত প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্ বলেন,

"বলঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপর আমার কোন অধিকার নেই।"

আল কোরআন, সুরা ইউনুস, আয়াত-৪৯।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূলকে সম্বোধন করে সমস্ত মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর কোন মানুষের হাত নেই এমনকি তার রাসূলও এর ব্যতিক্রম নয়। তাকেও আল্লাহর মর্জির উপর থাকতে হয় এবং তার নিজের তরফ থেকে এর কোন পরিবর্তন করার ইখতিয়ার নেই। সুতরাং এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে মানুষের ভাল-মন্দ, জয়-পরাজয়, সুখ-সমৃদ্ধি বা তকদীরের সকল বিষয় সম্পূর্নই আল্লাহ্র ইখতিয়ারে, সেখানে কোন রাসূল, মানব, দানব, ফেরেশতা বা অন্যকারো ক্ষমতা একেবারেই নেই। অনেক সময় মানুষ অজ্ঞতা বশতঃ সন্তান লাভের জন্য বা প্রয়োজন পুরা করার জন্য পীর, আউলিয়া, দরবেশ, বুজুর্গ ইত্যাদি বা কোন ধার্মিক ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় তাদের আস্তানায় অথবা মৃত ব্যক্তির মাজারে ধর্ণা দেয়, বিভিন্ন মান্নত মানে এবং প্রার্থণা করে থাকে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো এ ক্ষমতা আছে বলে ধারণা করা এবং তাদের কাছে যাঞ্চা করা শির্ক। আল্লাহ্ বলেছেন,

"আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহরই; তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।"

আল কোরআন, সুরা তা'ওবা, আয়াত-১১৬।

আবার অনেকের ধারণা যে, তারকার প্রভাবে বৃষ্টি হয় বা গ্রহের প্রভাবে মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল সাধিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা, জীবনোপকরণ দান করা, বিপদ-আপদ দূর করা, মানুষের মঙ্গল সাধন করা ইত্যাদি সহ সকল প্রকার কর্মবিধান কেবলমাত্র মাত্র আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। সেখানে অন্য কিছুকে কর্মবিধায়ক ভাবা শির্ক। কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন,

"শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ্, না ওরা-তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ড় করে। বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আসমান থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর তা দিয়ে আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতাই তোমাদের নেই। অতএব আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? বরং তারা সত্যবিচ্যুত সম্প্রদায়। অথবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসপোযোগী এবং তার মাঝে প্রবাহিত করেছেন অসংখ্য নদীনালা এবং ওতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মাঝে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; অতএব, আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও তাদের অধিকাংশই জানে না। বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন; সুতরাং আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাক। বরং তিনি, যিনি তোমাদের জলে স্থলের অন্ধকারে পথ দেখান, যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। অতএব, আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তারা যা কিছু তাঁর সাথে শরীক করে তিনি তা থেকে বহু উর্দ্ধে। বরং তিনি, যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর এর পুনরাবৃত্তি করবেন এবং যিনি তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দান করেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে; সুতরাং আল্লাহ্র সাথে অন্যকোন ইলাহ্ আছে কি? বল,

তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।"

আল কোরআন, সুরা নাম্‌ল, আয়াত- ৫৯-৬৪ ।

সৃষ্টির সাথে সাথে তাঁর বান্দাদের রিযিক প্রদানের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া কেউ রিযিক বাড়াতেও পারে না বা কমাতেও পারে না। তাই মানুষকে পুরাপুরিভাবে আল্লাহ্‌র উপরেই নির্ভরশীল থাকতে হবে এবং তাঁর কাছে রিযিক যাঞ্চা করতে হবে। কোন মানুষ, কোন বস্তু বা অন্য কিছুকে রিযিক বা সম্পদ দানের মালিক ভেবে তাদের মুখাপেক্ষী হওয়া শির্‌ক। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন,

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ কারী সকল মখলুকের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র-ই।"

আল কোরআন, সুরা হুদ, আয়াত- ৬

আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন।"

আল কোরআন, সুরা কাসাস-৮২।

নবী রাসূলদের মাধ্যমে মোজেযা প্রকাশের বিষয়টি সর্বজনবিদিত। যুগে যুগে আল্লাহ্‌ তাঁর নবী রাসূলদের মাধ্যমে মোজেযার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মোজেযাও আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতার নিদর্শন যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নবী রাসূলদের মাধ্যমে। এটা তাদের নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নয় বা তারা নিজ ক্ষমতা বলেও তা দেখাতে পারেনি। একমাত্র আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছায় এবং তাঁর ক্ষমতা বলে মোজেযা প্রকাশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে মোজেযার কারনে কোনো নবী রাসূলগণ কখনই নিজেদেরকে মা'বুদের আসনে বসাবার চিন্তাও করে নি বা সে দাবীও করেননি। কিন্তু কেউ যদি মোজেযার কারণে নবী রাসূলদেরকে মা'বুদ ভেবে বসেন তাহলে সেটা হবে শির্‌ক। অনুরূপভাবে কেরামতির বিষয়টিও ব্যাখ্যা করা যায়। মাঝে- মাধ্যে ফকীর-দরবেশদের মাধ্যমে কেরামতি বা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশের খবর পাওয়া যায়। কারো দ্বারা ঘটনাচক্রে কোন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যেতে পারে। তবে সে ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতায় তা না হয়ে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তা হয়ে থাকে বলে ধরে নিতে হবে এবং আল্লাহ্‌ যে কারো মাধ্যমে এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে সক্ষম। সেক্ষেত্রে ফকিরের কেরামতি বলে ধারণা করে তাদেরকে এ ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করায় আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় তাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করা হয়।

ইসলামী আকিদা অনুযায়ী সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আলাহ্‌। এই ক্ষমতায় তাঁর কোন শরীক নাই। পবিত্র কোরআনে আলাহ্‌ বলেন,

"বরকতময় তিনি (আলাহ্‌) যার হাতে সর্বময় ক্ষমতা; তিনি সব কিছুর উপর একক ক্ষমতাবান।"

আল কোরআন, সুরা মুলক, আয়াত- ১।

আবার আলাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

"তুমি বলোঃ হে আলাহ্‌ ক্ষমতার মালিক তো আপনি, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন আবার যার নিকট থেকে চান তা কেড়ে নেন, যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। সকল কল্যাণ তো আপনারই হাতে, নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান। "

আল কোরআন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত- ২৬।

এসব আয়াতের আলোকে এটা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, ক্ষমতার মালিক ও সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আলাহ্ ছাড়া আর কেউ নয়। মানুষকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা বা কাউকে ক্ষমতাচ্যুত করা এ সব কিছুই সম্পূর্ণ আলাহ্র ইখতিয়ারাধীন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পালাবদলের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। আলাহ্ই কাউকে রাজত্ব দান করেন আবার তিনিই তার কাছ থেকে সেটা কেড়ে নেন, প্রত্যেকটি মানুষের অন্ড়রেই এ বিশ্বাস ধারণ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু গণতন্ত্র চর্চাকারী মানুষগুলোর ভিতরে এর বিপরীত আকিদা পরিলক্ষিত হয়। তাদের আকিদা ও ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়নে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী আকিদা পরিপন্থী এবং একটি ভ্রান্ড় ধারণা বৈ কিছু নয়। উপরন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ শির্ক যারা বিশ্বাস করে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনে আলাহ্র কোন হাত নেই বরং জনগণের ইচ্ছাতেই ক্ষমতার পালাবদল হয়। আর বিশ্বাস না করেও যদি এ রকম কথা-বার্তা বলা হয় তবে সেটাও ইসলাম সমর্থন করে না, কেননা এ জাতীয় আচরণের মাঝেও শির্কের গন্ধ পাওয়া যায়।

০ অদৃশ্য জ্ঞানের শিরকঃ

অদৃশ্য জ্ঞানের শিরক বলতে আলাহ্র ইলমে গায়েবের সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ড় করাকে বুঝায়। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান অপরিসীম। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি আলিমুল গায়েব। অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তথা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অনু-পরমানুর ব্যাপক ইল্ম শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে। এটা তাঁর বিশেষ গুণগত বৈশিষ্ট্য। তিনি ছাড়া আর কেহই গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"বলঃ আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর কেহই অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান রাখে না।"

আল কোরআন, সুরা নামল, আয়াত- ৬৫।

পবিত্র কোরআনে আরও বলা হয়েছে,

"অদৃশ্যের চাবি-কাঠি আল্লাহ্র নিকট রয়েছে, তিনি ছাড়া ওটা কেউ জানে না।"

আল কোরআন, সুরা আন'আম, আয়াত- ৫৯।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সর্বব্যপী জ্ঞান শধুমাত্র আল্লাহ্পাক-ই রাখেন। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ফেরেশতা, কিংবা নবী রাসূল, পীর-আউলিয়া, দরবেশ, বুজুর্গ, কোন প্রাণী অথবা কোন সৃষ্ট বস্তু ভবিষ্যতের কিংবা গায়েবের জ্ঞান রাখে অথবা এরা অদৃশ্যে থেকে আমাদের দৈনন্দিন কার্য-কলাপের খবর রাখে বা অলৌকিক ভাবেই তারা সব কিছু জানতে পারে বলে মনে করা বা এ বিশ্বাস পোষণ করা এদেরকে আল্লাহ্র স্তরে উন্নীত করা এবং আল্লাহ্র সমতূল্য মনে করার শামিল– যা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী শির্ক। এতদসত্বেও অনেক সাধারণ মানুষ এমনকি একশ্রেণীর আলেমও মনে করেন যে, রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানতেন এবং এখনও তিনি তার উম্মতের আহ্বান এবং তাদের আর্জি শুনেন এবং ফায়দা দিয়ে থাকেন। তাদের মতে গায়েবের জ্ঞান বলতে যে কোন ভাবে অদৃশ্যের সংবাদ অবগত হওয়াকেই বোঝায়। সে হিসেবে তারা রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আলিমুল গায়েব তথা সৃষ্টির প্রতিটি অনু-পরমানু সম্পর্কে জ্ঞানবান বলে মনে করেন। কিন্তু কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং এ বৈশিষ্ট্যের হকদার অন্য কেউ হতে পারে না। যারা রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর এ বৈশিষ্ট্য আরোপ করে তারা বস্তুতঃ গায়েব ও গায়েবের খবরের

মধ্যে পার্থক্য বোঝেনা বলেই এ মূর্খতা সুলভ দাবী করে থাকে। তবে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানে বলে দাবী করা পরিস্কার শির্ক এবং তাকে এ বৈশিষ্ট্যে আল্লাহ্‌র আসনে আসীন করার অপচেষ্টা বৈ কিছু নয়। বিশেষজ্ঞ আলেমদের বক্তব্য অনুযায়ী নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানতেন না। তবে তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় গায়েবের অনেক খবরই রাখতেন। প্রকৃতপক্ষে গায়েবের জ্ঞান এবং গায়েবের খবর রাখা এক কথা নয়। গায়েবের খবর হচ্ছে একটি আপেক্ষিক বিষয় আর গায়েবের জ্ঞান হচ্ছে অসীম ও স্বার্বভৌম বিষয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকা যখন আমাদের দৃষ্টির আঁড়ালে তখন মোবাইল অথবা মিডিয়ার মাধ্যমে সেখানকার খবরা-খবর জানা হচ্ছে গায়েবের খবর রাখা। অন্যদিকে কোন মাধ্যম ছাড়াই সেখানকার সব খবর নিজ থেকেই জ্ঞাত থাকাই হচ্ছে গায়েব জানা। ঠিক সেভাবেই বলা যায় যে, রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েবের খবর জানতেন কিন্তু গায়েবের জ্ঞান তার ছিল না। মানব সৃষ্টির ইতিহাস, যুগে যুগে প্রেরিত নবী রাসূলগণের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওয়াকিফহাল ছিলেন, যা সে যুগে অন্যান্যদের কাছে ছিল অজানা। এগুলি ছিল সব গায়েবের খবর যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এভাবে অসংখ্য গায়েবের খবর তিনি জ্ঞাত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ জ্ঞানে এগুলি ধারণ করতেন না। কাজেই নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানতেন বিয়টি এমন নয় বরং তিনি গায়েবের অনেক খবরই পেতেন ওহীর মাধ্যমে- এটাই সঠিক। তাই বলা যায় যে, তিনি গায়েবের খবর জানতেন। সারকথা হচ্ছে, নবী রাসূলগণ সার্বভৌম জ্ঞানের অধিকারীও নন এবং ইলমে গায়েবের মালিকও নন বরং তারা জ্ঞান ও কুদরতের ততটুকু অধিকারী হয়েছিলেন যতটা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করিয়েছিলেন। রিসালতের দায়িত্ব পালনের জন্য যতটুকু ইলমে গায়েব রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জানান দরকার ছিল তা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে জানিয়ে দিতেন। এর বাইরে তিনি কোন গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। পবিত্র কোরআনে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত আছে,

"হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি ঘোষণা করে দাও– আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই, আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে আমি প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারতাম আর কোন অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শণকারী ও সুসংবাদবাহী মাত্র, শুধু ঈমানদারদের জন্য "

আল কোরআন, সুরা আরাফ, আয়াত-১৮৮।

নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আরও জানান হয়েছে,

"(হে মুহাম্মদ!) তুমি বলোঃ আমিতো তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিপুল ধনভাণ্ডার রয়েছে, না একথা বলি যে আমি গায়েবের কোনো খবর রাখি।"

আল কোরআন, সুরা আনআম, আয়াত-৫০।

এ আয়াতে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, নবী রাসূলগণ গায়েব জানে না। যেখানে নবী-রাসূলদের জ্ঞান সীমিত এবং তাদেরকেও আল্লাহ্‌র মর্জির উপর নির্ভর করে থাকতে হয়, সেখানে অন্যান্যদের জ্ঞানের পরিধি সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ্‌পাক মানুষকে জ্ঞান দান করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষের জ্ঞান সীমিত, আল্লাহ যাকে যতটুকু জ্ঞান দান করেছেন সে ততটুকুই জানে। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান অসীম। কিছু কিছু বিষয় আছে যার জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ্‌পাকই রাখেন। আল্লাহ্‌র জ্ঞানের বাইরে পৃথিবীর কোন ঘটনাই ঘটে না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।"

আল কোরআন, সুরা ফাতির, আয়াত-৩৮।

দানব বা জ্বিনেরাও গায়েব জানে না। কিন্তু কিছু অজ্ঞ মানুষের ধারণা যে, জ্বিনরা গায়েব জানে এবং এ বিশ্বাসের বশঃবর্তী হয়ে তার জ্বিন সাধকের স্মরণাপন্ন হয় বিভিন্ন প্রয়োজনে এবং তাদের কাছে গায়েবের খবর জানতে চায়। তাদের ধারণা যে, জ্বিন সাধকেরা জ্বিনদের হাজির করে তাদের মাধ্যমে অদৃশ্যের খবর জানতে পারে এবং মানুষের বিভিন্ন উপকার করতে পারে। এজন্যই তারা চোরাই মালের সন্ধান পেতে, রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের উপায় জানতে, অন্যের গোপণ তথ্য জানতে ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের গায়েব সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে জ্বিন সাধকের কাছে হাজির হয় এবং তাদের কথায় বিশ্বাসও করে। কিন্তু জ্বিনরা যে অদৃশ্য বা গায়েব সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না, তা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সুলাইমান (আঃ) বায়তুল মাক্‌দিস নির্মাণের সময় জ্বিনদেরকে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলেন। গৃহ নির্মাণ শেষ হওয়ার পুর্বেই লাঠির উপর দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেলেও মৃত দেহটি লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি জীবিত আছেন ভেবে জ্বিনেরা যথারীতি নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। এক সময় ঘুঁন পোকায় লাঠি খেয়ে ফেলার ফলে তিনি পড়ে গেলে জ্বিনরা বুঝতে পারল যে, তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। এ ঘটনা বর্ণিত আছে পবিত্র কোরআনে। আল্লাহ্ বলেন,

"যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন জ্বিনদেরকে তার মৃত্যু বিষয়ে জানাল শুধু একটি মাটির ক্ষুদ্র পোকা যা সুলাইমানের-এর লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান মাটিতে পড়ে গেল তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয়ে অবগত থাকত তাহলে তারা লাঞ্ছণাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।"

আল কোরআন, সুরা সাবা, আয়াত- ১৪।

কোরআনের এ বর্ণনায় এটা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনের মধ্যে কেউই গায়েব জানে না বা গায়েবের খবরও রাখেনা। কাজেই যারা জ্বিনেরা গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করে থাকে তারা বস্তুতঃ অদৃশ্য জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যে জ্বিনদেরকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থাপনের অপচেষ্টা করে শির্‌কের অপরাধ করে যাচ্ছে।

মানব বা দানবের পক্ষে গায়েব জানা অসম্ভব, বিষয়টি যখন এতই পরিষ্কার তখন কারো পক্ষেই এদের কাছে গায়েবের খবর পাওয়ার জন্য ধর্ণা দেওয়ার কোন অবকাশই থাকে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ সমাজের সাধারণ মানুষকে জ্যোতিষী বা গণক নামধারী কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর কাছে আনাগোণা করতে দেখা যায় ভাগ্য পরীক্ষা করতে বা অনাগত ভবিষ্যতের খবরা-খবর জানতে। তাদের ধারণা যে, এরা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে এবং এদের বক্তব্যে তারা বিশ্বাসও স্থাপন করে। কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী এ জাতীয় বিশ্বাস এবং এ সম্পর্কিত সকল আচরণ শির্‌ক। কেননা কারো পক্ষেই গায়েব বা ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখা সম্ভব নয়। মানুষ ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখে না, কাল কি হবে জানেনা। ভাল-মন্দ, জয়-পরাজয়, আপদ-বিপদের অগ্রিম খবর শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই রাখেন। পবিত্র কোরআনে আছে,

"কেহ জানেনা আগামীকল্য সে কি অর্জন করবে, কেহ জানেনা কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয় অবহিত।"

আল কোরআন, সুরা লুকমান, আয়াত- ৩৪।

আল্লাহ ছাড়া কোন ফেরেশ্‌তা, মানব, দানব বা জ্বীন গায়েব জানে না। না কোন পীর-আউলিয়া অদৃশ্যের খবর জানে, না কোন জন্তু-জানোয়ার অদৃশ্যের খবর বলে দিতে পারে। সকলেরই জেনে রাখা উচিত যে আসমান ও জমীনের সমস্ত সৃষ্ট জীব ও সৃষ্ট বস্তু অদৃশ্য হতে বেখবর রয়েছে। এতদসত্ত্বেও মানুষ নিজের ভাগ্যকে জানতে বা ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে এদের মুখাপেক্ষী হয়ে শির্‌কে নিমজ্জিত হচ্ছে।

০ শ্রবণ ও দর্শনের শিরকঃ

শ্রবন ও দর্শণের শির্‌ক বলতে আলাহ্‌র শ্রবন ও দর্শণের সাথে কোন মখলুককে অংশীদার সাব্যস্ড় করাকে বুঝায়। আলাহ্‌ দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি যেমন দূরের ও কাছের সব কিছুই দেখেন তেমনি তার শ্রবন ক্ষমতাও অপরিসীম। তাঁর শ্রবন ও দর্শন ক্ষমতার সাথে কোন মখলুকের দেখা ও শোনার কোন তুলনা হতে পারে না। আলাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কোরাঅনে এরশাদ করেছেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের সমস্ত কিছু জানেন ও দেখেন।"

আল কোরআন, সুরা ফাতির, আয়াত-৩১

"অবশ্যই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।"

আল কোরআন, সুরা দুখান, আয়াত-৬।

আল্লাহ্‌ মানুষের দৃষ্টি সীমার ভিতরের এবং দৃষ্টি সীমার বাইরের সবকিছু দেখেন এবং শোনেন। এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি বিশেষ গুণগত বৈশিষ্ট্য। অন্যকারো প্রতি যেমন নবী, রাসূল, পীর, বুজুর্গ, আউলিয়া, দরবেশ প্রমুখ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই ক্ষমতার অধিকারী বা তারা দূরের ও কাছের সকল ঘটনা দেখেন ও শোনেন এমনকি মৃত্যুর পরেও তাদের আত্মা সব খবর রাখে, এই ধারণা পোষণ করা বা এদের প্রতি এই বৈশিষ্ট্য আরোপ করা শির্‌ক। কেননা আল্লাহ্‌র সদৃশ কিছুই নেই। জীবিতাবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক দৃষ্টি এবং শ্রবণ ক্ষমতার অধিকারী মাত্র। মৃত্যুর পরে তাদের পার্থিব বিষয়াদির দর্শন ও শ্রবণ ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়। মৃত সমাধিস্থ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন,

"মৃতকে তো তুমি কথা শোনাতে পারবে না।"

আল কোরআন, সুরা রূম, আয়াত-৫২।

মানব, দানব, ফেরেশতা কিংবা অন্য কোন সত্তার শ্রবণ ও দর্শন ক্ষমতা কোন ভাবেই আল্লাহ্‌র ঐ ক্ষমতার সাথে তুলনার যোগ্য নহে। আল্লাহ্‌ বলেছেন,

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ্য নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

আল কোরআন, সুরা শুরা, আয়াত-১১।

আল্লাহ্‌ অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা এবং মানুষের সকল কর্ম-কাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সম্পূর্ন ওয়াকিবহাল। গায়েব সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো জানা নেই। আসমান ও যমীনের সকল অদৃশ্য বিষয়সমূহ তার কেবলমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের অন্তরের খবর পর্যন্ত আল্লাহ্‌ যথাযথ ভাবে রাখেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"আল্লাহ্ আসমান ও জমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত আছেন, এ যমীনে যা তোমরা করে বেড়াও তা সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা দেখেন।"

আল কোরআন, সুরা হুজুরাত, আয়াত-১৮।

আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছুর পরিজ্ঞাতা। আসমান ও জমীনের সকল কিছুই তার দৃষ্টি সীমায় আবদ্ধ। সমুদ্রের অতল গহ্বরে কিংবা পাহাড়ের তলদেশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুটিও আল্লাহ্র জ্ঞান ও দৃষ্টি সীমার আওতাধীন। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে,

"ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ্ সুক্ষ্মদর্শী - সম্যক অবগত।"

আল কোরআন, সুরা লুকমান, আয়াত-১৬।

আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তাঁর এ গুণাবলীর কোন শরীক নেই। সুতরাং আল্লাহ্র শ্রবণ ও দর্শন বৈশিষ্ট্যে তৃতীয় কোন সত্তাকে তাঁর সমকক্ষ স্থির করা সুস্পষ্ট আসমা অস্ সিফাতের শির্ক।

উলূহিয়্যাতের শির্ক (Shirk in Worship)

'উলূহিয়্যাত' শব্দটি 'ইলাহ্' শব্দমূল থেকে গৃহীত এবং এরই সম্বন্ধ জ্ঞাপক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে- উপাস্য, মান্যবর বা যার ইবাদত করা হয়। উলূহিয়্যাত-এর বৈশিষ্ট্যে একচ্ছত্র উপাসনা বা ইবাদত প্রাপ্যতার হকদার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। উলূহিয়্যাতের শির্ক বলতে ইবাদতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক সাব্যস্ত করাকে বুঝায়। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টসত্তা বা সৃষ্টবস্তুর ইবাদত করা হলে অর্থাৎ গায়রুল্লাহ্র ইবাদত করা হলে উলূহিয়্যাতের শির্ক সংঘটিত হয়। সে জন্যেই আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে সকল মানুষকে কেবল তাঁরই ইবাদত করার দিকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন,

"হে মানব সকল! তোমরা সে প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আশা করা যায় এতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।"

আল কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত-২১

ইবাদত কি?

ইবাদত শব্দের অর্থ উপাসনা, আরাধনা, বন্দেগী, দাসত্ব ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলাই ইবাদত। ইবাদতের মূলভাব হচ্ছে আজ্ঞানুবর্তিতা, বিনয় বা নম্রতা এবং আত্মসমার্পন বা নিবেদন। **সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়: প্রকাশ্য ও গোপনীয় ঐ সকল কথা ও কাজ যা আল্লাহ্ ভালবাসেন বা যার দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় তাকে ইবাদত বলে।** এক কথায় বলা যায়, বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞা পালন করাই হল ইবাদত। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশিত কর্মগুলির মধ্যে সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কোরবানী, ইত্যাদি

আমাদের জন্য নির্ধারিত কতগুলি মৌলিক ইবাদত। এ ছাড়াও মানুষের জীবনের প্রতিটি ভাল কথা ও ভাল কাজ যেগুলি করার জন্য আমরা আদিষ্ট হয়েছি তাও ইবাদতের ভিতর গণ্য। যেমন পিতা-মাতার সেবা করা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, দান-খয়রাত করা, পরোপকার করা, সকল কাজে সত্যাশ্রই হওয়া, হালাল উপার্যন করা ও হালাল খাওয়া, আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা, দু'আ করা ইত্যাদি। আবার কিছু আছে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের নিষিদ্ধ ঘোষিত কর্ম। সেগুলি থেকে বিরত থাকাও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে; যেমন মিথ্যা পরিহার করা, মদ্যপান না করা, যেনা বা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা, সুদ ও ঘুষ বর্জন করা, পরনিন্দা ও গীবত পরিহার করা, হারাম উপার্যন না করা ইত্যাদি।

ইবাদতের গুরুত্বঃ

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের রব। তিনি আমাদের লালন-পালন করেন। আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিকও তিনি। অন্যান্য সবকিছু আল্লাহ্‌ মানুষের কল্যানে সৃষ্টি করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"

আল কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত-২৯।

মানুষের জন্য এটা একটা বড় নি'য়ামত। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র এ অবদানের দাবী হচ্ছে তারা এর শুকরিয়া আদায় করবে। আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সহ তাঁর নৈকট্য এবং সান্নিধ্য লাভের একমাত্র পথ হচ্ছে ইবাদত। মানুষ আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এটাই আল্লাহ্‌র হক। আল্লাহ্‌ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, বান্দা তাঁর ইবাদত করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ নিজেই পবিত্র কোরআনে তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন এভাবে:

"আমি মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"

আল কোরআন, সুরা যারিয়াত, আয়াত-৫৬।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যখন স্রষ্টার ইবাদত করা তখন ইবাদতের মধ্য দিয়েই মূলত আল্লাহ্‌র এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ইবাদতের মাধ্যমেই মানুষ সফলতা অর্জন করতে পারে। অন্যথায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। বস্তুতঃ আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্যই মানব জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান। কাজেই ইবাদতের গুরুত্ব যে কত অপরিসীম সে কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। মানুষ একমাত্র তাঁর স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করবে এটাই স্বাভাবিক, বাস্তবসম্মত এবং এটাই ইসলামের দাবী। পরকালীন কল্যাণার্জনের জন্য ইবাদতের কোন বিকল্প নেই। বস্তুতঃ ইবাদতের মধ্যে দিয়েই কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জিত হতে পারে। আর ইবাদত বিমুখতা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ বলে তা আল্লাহ্‌র ক্রোধের কারণ হয়ে কারো জন্য বয়ে আনতে পারে আখেরাতের কঠোর শাস্তি সহ পার্থিব চরম অকল্যাণ। আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে তা রোধ করার শক্তি কারো নেই। তাই সকল মানুষের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার অবদানের কথা স্মরণ রেখে এবং তাঁর আযাবের ভয়ে ভীত-শংকীত হয়ে বিনীতভাবে কেবলমাত্র তাঁর ইবাদতে লেগে থাকাই বাঞ্ছণীয়।

ইবাদতের মধ্যে দিয়েই মূলত আল্লাহ্‌র রুবূবিয়্যাত এবং আসমা অস্ সিফাতের তৌহিদী আকিদার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, তাই ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইবাদত মঞ্জুর ও মকবুল হওয়ার শর্তঃ

ইবাদত মঞ্জুর হওয়ার মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত। তাই প্রত্যেকেরই এ প্রচেষ্টা থাকা উচিত যাতে তার সকল আমল আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়। ইবাদত মঞ্জুর ও মকবুল হওয়ার মূলত দু'টি শর্ত রয়েছে-

ক) আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ঈমান ও ইখলাস: যে কোন আমল আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে ঈমান। ঈমানহীন কোন নেক আমলই আখিরাতের কাজে আসবে না। কাজেই ইবাদতে সাফল্য লাভের জন্য ঈমান থাকা অপরিহার্য। ঈমানের সাথে সাথে ইবাদতে ইখলাসও জরুরী। সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য ইবাদতকে নিরঙ্কুশ করার নাম ইখলাস। সুতরাং এক্ষেত্রে ঈমান ও ইখলাসের মূল কথা হচ্ছে রব ও প্রতিপালক হিসেবে মহান আল্লাহ্‌ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় মেনে নেওয়া এবং আন্তরিকতা ও একাগ্রতা সহকারে কেবলমাত্র তাঁর তুষ্টি বিধান করার জন্য ইবাদত করা। এভাবে ইবাদত করা হলে তা আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হওয়ার আশা করা যায়। ইসলামে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন সত্তার ইবাদত করা বা আলাহ্‌র সাথে মিশ্রিত করে অন্য কারো ইবাদত করার কোন বিধান নেই এবং সে ইবাদত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহনযোগ্যও হবে না বরং সেটা হবে চরম অবাধ্যতা ও গুণাহের কাজ। মুসলিমগণ আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম, ভক্তি, ভয় এবং আশা বা আকাঙ্খা এই সমস্ত গুণকে অন্তরে রেখে তাঁর ইবাদত করে। সুতরাং ইবাদতের মূল বিষয় এই চারটি। এই বিষয়গুলিকে অন্তরে স্থান না দিয়ে কোন ইবাদত করলে তা শুদ্ধ হয়না।

খ) আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর অনুকরণ ও অনুসরণ: ইবাদত কবুলের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত তরীকায় ইবাদত করা। সকল প্রকার ইবাদত ও প্রার্থনা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর রাসূল কর্তৃক স্থিরীকৃত। তাই প্রত্যেক মানুষেরই উচিত আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা এবং রাসূলের অনুসরণ করা। ইসলামের উপর দৃঢ় আস্থা আনায়নের কারনে মুমিনের অন্তঃকরণ থেকেই ইবাদতের স্পৃহা জাগ্রত হয় । তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে নিজে ইবাদত করেছেন, যেভাবে সাহাবাদের করতে বলেছেন এবং যা করার জন্য তিনি সমর্থন দিয়েছেন, সেটাই ইবাদতের বৈধ পন্থা। এই বৈধ গণ্ডীর ভিতরে থেকেই সকল ইবাদত পালন করতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা বা মনগড়া ইবাদত করার কোন সুযোগ নেই এবং এ জাতীয় ইবাদত আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহনযোগ্যও হয়না। বস্তুতঃ ইবাদত নিষিদ্ধ; যতক্ষণ পর্যন্ত না শরীয়তের কোন নির্দেশ বা সম্মতি পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ইবাদত করা যায় না। করলে তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। তাই ইবাদত করার জন্য প্রথমে তার নির্ভরযোগ্য দলীল চাই। দলীল না থাকলে যে কোন ইবাদত নিষিদ্ধ।

মোটকথা হচ্ছে মানুষের সকল ইবাদতকে ভালো ও গ্রহণযোগ্য বলা হবে যখন তাতে উপর্যুক্ত দু'টি শর্ত পালন করা হবে। প্রথমতঃ ইখলাস, বিশুদ্ধ অন্তর বা নিয়ত ঠিক রাখা। এবং দ্বিতীয়ত সুন্নাত তরীকায় হওয়া। অতএব যদি কোন নেক আমল বা ইবাদত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে না হয়ে সুনাম-সুখ্যাতি, নাম-যশ,স্বার্থ, লোকপ্রদর্শণ, চিত্তবিনোদন বা আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে করা হয় অথবা সে কাজ যদি শরিয়াত মোতাবেক সুন্নাত তরীকায় না হয় তাহলে তাকে নেক আমল বা ভাল কাজ তথা ইবাদত বলা যাবেনা এবং তা আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীতও হবে না।

ইবাদতের শির্‌কঃ

ইবাদতের শির্‌ক হল বিভিন্ন প্রকারের ইবাদতের মধ্য হতে কোন ইবাদত আলাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্য নির্ধারণ করা। তাওহিদী আকিদায় সর্বপ্রকার ইবাদাত, আরাধনা, উপাসনা বা বন্দেগী প্রাপ্যতার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌র এ অধিকারে অন্য কাউকে শরীক করলে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পাশাপাশি বা আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা হলে ইবাদতের শির্‌ক হয়। এককথায় বলা যায় গায়রুল্লাহ্‌র উপাসনা করাই হল ইবাদতের শির্‌ক। আল্লাহ্‌ যখন মানুষের ইবাদত প্রাপ্তিকেই তাঁর কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, তখন উপাসনার মাধ্যমে অপর কোন সৃষ্টির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সম্মান প্রদর্শন করার কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ মানুষ শুধু এক আল্লাহ্‌রই উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করবে না। উপরন্তু অন্যকোন সৃষ্টজীব বা সৃষ্টবস্তুর উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন কোন কাজ বা আচরণ করা ঠিক নয়, যা সে ব্যক্তি বা বস্তুকে উপাস্যে পরিণত করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরীক করতে নিষেধ করে বলেছেন,

"তোমরা একক ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।"

আল কোরআন, সুরা নিসা , আয়াত- ৩৬।

উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যে ইবাদত প্রাপ্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ্‌। অবশ্যই ইবাদতে শরীক স্থাপন করা আল্লাহ্‌ বরদাশ্‌ত করেন না।

মানুষ ইবাদতের মাধ্যমে স্রষ্টার একত্ব, স্বার্বভৌমত্ব, বড়ত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। যদি আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন সৃষ্টজীব বা সৃষ্ট বস্তুর ইবাদত করা হয় এবং সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে সৃষ্টজীব বা সৃষ্ট বস্তুর কাছে এর প্রতিদান বা পুরস্কার পাওয়ার আশা করা হয় তখন এ শির্‌ক সংঘটিত হয়। বস্তুতঃ ইবাদতের মাধ্যমেই সকল প্রকার শির্‌কের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। তাই অধিকাংশ আলেমগণ এটাকে শির্‌কের কেন্দ্রবিন্দু বিবেচনা করেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে ইবাদতে শরীক করা মুশরিকদের কর্ম। কাজেই মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে যে কেউ গায়রুল্লাহর উপাসনা করবে সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। গায়রুল্লাহর ইবাদত করা চরম ধৃষ্টতা। শিরক্‌কারীদের শির্‌ক থেকে আল্লাহ্‌ পবিত্র। আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী এবং তিনি নিজেই শিরক্‌কে খণ্ডন করেছেন। এতদসত্ত্বেও মানুষ দলীল-প্রমাণ ছাড়াই বিভিন্ন সৃষ্ট সত্তা, প্রাণী বা সৃষ্ট বস্তুকে আহ্বান করে থাকে নানাভাবে। এদেরকে ডাকা এবং এদের সাহায্য কামনা করার অর্থ হচ্ছে গায়রুল্লাহর উপাসনা করা। গায়রুল্লাহর উপাসনা করা যে শির্‌ক, সে বিষয়ে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। ইবাদতের শিরকের স্বরূপ উৎঘাটন করে গায়রুল্লাহ হিসেবে যাদেরকে ইবাদতের মাধ্যমে অংশীদার সাব্যস্ত করা হয় তার কিছু বাস্তব নমুনাও বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কোরআনে। এ পর্যায়ে গায়রুল্লাহ হিসেবে যাদেরকে উপসনা করা হয়, তার কিছু প্রকৃষ্ট উদাহরণ কোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি সহ উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হল:

০ মূর্তি পূজাঃ মূর্তি পূজা ইবাদতের শির্‌কের একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত আছে। তারা এদেরকে জীবনোপকরণের মালিক মনে করে। তারা এ সকল দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরী করে এবং এদের উপাসনা করে এবং এদের কাছে প্রার্থণা করে। বাঙ্গালী হিন্দুদের কাছে কতগুলি পূজা-পার্বন অতীব সমাদৃত। আনুষ্ঠানিক ভাবে এবং ঘরোয়া ভাবে এ পূজা-পার্বনগুলি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। লোকেরা প্রতিমার চরণে অঞ্জলী দেয় এবং সাহায্য কামনা করে

থাকে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মূর্তি অথবা কাল্পনিক দেব-দেবী এর কোনটাই মানুষের জীবনদাতা নয় বা প্রতিপালকও নয়; অধিকন্তু মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করার এমনকি নিজের হেফাযত করার ক্ষমতাটুকুও এদের কারো নেই। তাদের পূজা করে তো কোন সুফল পাওয়া যেতে পারে না। বস্তুতঃ মূর্তির কোনো ক্ষমতাই নেই যে, সে অপরের উপকার অথবা ক্ষতি করতে পারে। এমনকি এগুলো কারো জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতাও রাখে না। মূর্তিগুলোর কাছ থেকে ভয় পাবারও কিছু নেই আবার কল্যাণ লাভেরও কোন সুযোগ নেই। উপাসনা পাবার কোন যোগ্যতাই এদের নেই এবং এদের উপাসনা নিরর্থক। সুতরাং মূর্তি পূজা করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ তা'আলা মূর্তিপূজারী মুশরিকদের আকিদা-বিশ্বাসকে খণ্ডন করেছেন এভাবে–

"আর তারা আল্লাহ্ ছাড়া এমন বস্তু সমূহের ইবাদত করে যারা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুপারিশকারী; তুমি বলে দাও– তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমান আর না যমীনে? তিনি পবিত্র এবং মহান, তারা যে শেরেক করে তিনি তার চাইতে অনেক উর্দ্ধে।"

আল কোরআন, সুরা ইউনুস , আয়াত- ১৮

সর্বময় কর্তৃত্ব এক আল্লাহ্র এবং মানুষের সকল ইবাদত-বন্দেগী তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হওয়া বাঞ্ছণীয়। পবিত্র কোরআনে মূর্তি পূজার ভ্রান্ত আকিদা পরিহার করে এক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করার প্রতি আহ্বান করে বলা হয়েছে,

"তোমরা নিজেরা যেগুলি খোদাই করে নির্মান কর তোমরা কি তারই পূজা কর? অথচ আলাহ্ তা'অলাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কিছু বানাও তাদেরও।"

আল কোরআন, সুরা সাফ্ফাত, আয়াত-৯৫-৯৬

"তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত কেবল মূর্তি পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নহে। সুতরাং তোমরা কামনা কর আল্লাহ্র কাছে এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।"

আল কোরআন, সুরা আনকবুত-১৭।

মূর্তি পূজারীরা ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। কেননা মূর্তির পক্ষে কারো ডাকে সাড়া দেওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই জেনেও তারা এদেরকে আহ্বান করে যাচ্ছে। কোরআনে বলা হয়েছে,

"সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে হতে পারে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না এবং এগুলি তাদের প্রার্থনা সম্পর্কে অবহিতও নয়।"

আল কোরআন, সুরা আহকাফ, আয়াত- ৫।

মূর্তি পূজা কেবলমাত্র বর্তমান কালের আচরিত কর্ম নয়; বরং প্রাচীন জমানা থেকেই বংশ পরম্পরায় চলে আসছে এ কর্মটি। আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী সহ যুগে যুগে বহু নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর মূর্তি বিরোধী তৎপরতার কথা:

"আমি তো এর পূর্বে ইব্রাহীম (আঃ)-কে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে ছিলাম সম্যক অবগত। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললোঃ এই মূর্তিগুলো কি, তাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছে?

তারা বললোঃ আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি। সে বললঃ তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃ পুরুষরাও সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছো।"

আল কোরআন, সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫১-৫৪।

মূর্তি পূজা একটি চরম গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতা। এ অপরাধের জন্য রোজ কিয়ামতে চরম মূল্য দিতে হবে। তাই পিতৃ পুরুষদের মূর্তি পূজার অন্ধ অনুসরণ করে পথ হারিয়ে মিথ্যে মরিচিকার পিছনে না ঘুরে বরং তা পরিহার করে তাওহিদের পথে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখাই যুক্তিযুক্ত এবং প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণকর।

০ যীশুখ্রিষ্টের উপাসনা: ইবাদতের শিরকের উপর ভিত্তি করে ভুল বা মিথ্যা ধর্মের প্রবর্তন হয়। মানব তৈরী নিয়ম-নীতি যে কোন ভাবে তাদের অনুসারীদের সৃষ্ট জীবের উপাসনা করার জন্য আহ্বান করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, যীশুখ্রিষ্টের উপাসনা। খ্রিষ্টান সম্প্রদায় যিশুকে রক্তমাংসে গড়া মানবদেহী ঈশ্বর বলে দাবী করে এবং তার কাছে প্রার্থণা করে। আবার অনেকে যীশুখ্রিষ্টকে তিনজন ঈশ্বরের একজন বলে দাবী করে এবং তার উপাসনা করে। এর কোনটাই সঠিক নয়; বরং আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং ঈসা মাসীহ্ (আঃ) আল্লাহ্র একজন মনোনীত রাসূল মাত্র। কাজেই ঈসা (আঃ)- কে যারা ঈশ্বরের মর্যাদায় আসীন করে উপাসনায় রত আছে, তারা চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে শির্ক করে চলছেন। এ সম্পর্কে কোরআনপাক দিয়েছে সবচেয়ে সঠিক এবং স্বচ্ছ ধারণা। বলা হচ্ছে,

"নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়েছে, যারা বলেছে, আল্লাহ্ হচ্ছেন মারইয়াম পুত্র মাসীহ; অথচ মাসীহ নিজেই বলেছে–হে বানী ইসরাঈল! তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত কর যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও; নিশ্চয়ই যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাসস্থান হবে জাহান্নাম। নিঃসন্দেহে তারাও কুফরী করেছে যারা বলেছে আল্লাহ্ তিনজনের মধ্যে একজন, অথচ এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।"

আল কোরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত: ৭২-৭৩।

আবার ক্যাথলিক খ্রিষ্টানগণ 'ঈশ্বরের মা' হিসাবে মেরীর প্রার্থণা করে। এ সকল আচরণও শির্ক। আল্লাহ্ বলেছেন,

"মারইয়াম পুত্র মাসীহ তো কেবল একজন রাসূল ছাড়া কিছুই ছিল না, তার আগেও অনেক রাসূল গত হয়েছে; আর তার মাতা ছিল একজন তাপসী মহিলা ।"

আল-কোরআন, সুরা মায়দা, আয়াত-৭৫।

কোরআনের এ সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পরেও কি ঈসা (আঃ) বা তার মাতা বিবি মারইয়ম কে মা'বুদ জ্ঞান করা বা তাদের উপাসনা করার কোন অবকাশ আছে? এরপরেও যারা এদেরকে আলাহ্র সাথে শরীক করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন এবং তাদের উপাসনা করেন তারা চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছেন এবং প্রকাশ্য শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন।

০ ফেরেশতাদের উপাসনা: ফেরেশতাকুল আল্লাহ্র সৃষ্ট সত্তা এবং তাঁর একান্ত অনুগত দাস। তারাও আল্লাহ্র গুণগান এবং ইবাদতে মশগুল থাকে সারাক্ষণ। ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র নির্বাহী আদেশ পালনে

তৎপর থাকে প্রতিনিয়ত। তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম না করে, অত্যন্ত বিনীতভাবে এবং নিরলসভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে অনন্তকাল ধরে। মানুষের ভাল-মন্দ আমল লিপিবদ্ধ করা থেকে শুরু করে রিযিক প্রদান সহ নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু প্রদানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ফেরেশতাদের মাধ্যমে ফয়সালা হয়ে থাকে। সে হিসেবে ফেরেশতাদেরকে অত্যন্ত ক্ষমতাবান বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে যে, তাদের নিজের কোন ইচ্ছা শক্তি নেই এবং নিজের থেকে কিছু করারও কোন ক্ষমতা নেই; বরং তারা শুধু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা শক্তিতে পরিচালিত হয় এবং তাঁর নির্দেশক্রমেই সে মত কাজ করতে পারে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বাইরে তাদের এক চুলও নড়বার সামর্থ নেই। সে ক্ষেত্রে ফেরেশতাদেরকে উপাসনা করার অবকাশ কোথায়? তবে ফেরেশতাদের প্রতি অজ্ঞতা প্রসূত কিছু ধারণা এ শিরক্‌কে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এ জাতীয় শির্‌কের প্রচলন পরিলক্ষিত হয় প্রাচীনকালে আরব সমাজে। তৎকালীন মক্কার কাফির মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা মনে করত এবং এদের প্রতিমা তৈরী করে নারী বাচক নাম দিত। তারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে ঐ নারী মূর্তিগুলোর পূজায় রত থাকত। এটা ছিল তাদের অজ্ঞতার ফসল। তাদের এ আকিদাকে খণ্ডন করে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"তারা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী সাব্যস্ত করল; ফেরেশতাদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই; তারা তো শুধু মিথ্যাই বলছে।"

আল কোরআন, সুরা যুখরুখ, আয়াত: ১৯-২০।

এ সম্পর্কে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

"যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করেনা তারাই নারী বাচক (দেবী) নাম দিয়ে থাকে ফেরেশতাদেরকে। অথচ এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; সত্যের মোকাবেলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই।"

আল কোরআন, সুরা নাজম, আয়াত: ২৭-২৮।

এখান থেকে এটা অতি সহজেই অনুমেয় যে, আল্লাহ্‌র উপর সন্তান গ্রহনের অপবাদ আরোপ করা অবিশ্বাসী কাফিরদের কর্ম ছিল। তাদের এ দাবী অনুমান ভিত্তিক এবং তা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে একটি জঘণ্য মিথ্যাচার। উল্লিখিত আয়াতগুলিতে মুশরিকদের কতগুলি ভুল পরিস্ফুটিত হয়েছে। প্রথম ভুল হল এই যে, তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করেছে। তাদের দ্বিতীয় ভুল হলো এই যে, তারা ফেরেশতাদের প্রতিমা তৈরী করে নারী বাচক (দেবী) নাম দিয়ে ওদের পূজা করা শুরু করে দিয়েছে; অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন দলীল প্রমাণ নেই। তারা শুধু পূর্ব পুরুষের অনুসরণ করেছে। এ দু'টি বিষয় যে প্রকাশ্য শির্‌ক সংঘটিত করে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। উপর্যুপরি তাদের তৃতীয় ভুল হচ্ছে, তারা এটাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমোদিত বলেছে এই অযুহাতে যে, যদি আল্লাহ্‌ তাদের কাজে অসন্তুষ্ট থাকতেন তবে তাদের পক্ষে এ পূজা করা সম্ভব হতোনা। কিন্তু এটা তাদের চরম মুর্খতা আর অজ্ঞতার ফল। কেননা আল্লাহ্‌র কুদরত বা ক্ষমতা ও জ্ঞান সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। এটা তাদের অনুমান ভিত্তিক মিথ্যাচার মাত্র। আর এটা প্রকাশ্য বিষয় যে, সত্যের মোকাবেলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই। তথাপিও মুশরিকগণ সম্পূর্ণ অবাস্তব, ভিত্তিহীন এবং বানোয়াট ধারণার বশঃবর্তী হয়ে আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তার উপর সন্তান গ্রহণের অপবাদ আরোপ করার চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে তাঁর চরম অসন্তুষ্টি

ক্রয় করে নিয়েছে। সেই সাথে তারা ফেরেশতাদের মূর্তি বানিয়ে ওদের পূজা করে প্রকাশ্য শির্‌কে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

তৎকালীন মুশরিকদের ন্যায় বর্তমান সমাজেও এধরনের আচরনের বাস্তবতা একেবারে নেই, সে কথা হলফ করে বলা যায়না। হয়ত পৌত্তলিকদের মাঝে এ ধরনের আচরণ এখনও বিদ্যমান থাকতে পারে। তবে মুসলিমদের মাঝে পৌত্তলিকতার প্রচলন না থাকলেও তাদের কিছু কিছু আচরণ রয়েছে আপত্তিজনক এবং তা সীমালঙ্ঘনের অপরাধ পর্যন্তও পৌঁছে যেতে পারে। ফেরেশতারা নিঃসন্দেহে অতি মর্যাদা সম্পন্ন আল্লাহ্‌র বান্দা। ফেরেশতারা রিযিক বন্টনকারী, কল্যাণময়ী, সুপারিশকারী তথা জীবন হরণকারী হিসেবে পরিচিত। তবে তারা সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রাধীন। সেক্ষেত্রে কেউ যদি বাড়াবাড়ি করে তাদেরকেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তাদেরকে মা'বুদের স্থানে উন্নীত করে ফেলে এবং তাদের কাছে আর্জি পেশ করতে বসে যায় তাহলেই সেটা বিপত্তির কারণ হবে এবং সেখানে শির্‌ক সংঘটিত হওয়ার আশংকা দেখা দিবে। ফেরেশতারা সুপারিশের হকদার একথা সর্বজনবিদিত। তবে বিষয়টি এমন নয় যে, ফেরেশতাকে খুশী করার বিণিময়ে সে সুপারিশ করে কাউকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে। আবার এ কথাও দিবালোকের মত সত্যি যে, আসমান ও যমীনের সকলকে খুশী করেও আল্লাহ্‌র না-রাজীতে সব কিছু পণ্ড হয়ে যাবে। সুপারিশের বিষয় সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রাধীন। অতএব সুপারিশ তাদের কাছে চাইতে হবে, অন্যথায় পাওয়া যাবে না, এ ধরনের চিন্তা ভাবনা করে তাদের কাছে সুপারিশ বা কল্যাণ কামনা করার কোন বিধান নেই। বাস্তব কথা হল এই যে, পবিত্র ফেরেশতারাও এ সাহস রাখেনা যে, আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন অপরাধীর জন্য সুপারিশ করে। তারা আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত এবং সম্মানিত বান্দা। তারা কথায় ও কাজে সদা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিমগ্ন রয়েছে। কোন সময়েই তারা আগ বেড়ে কথা বলে না। কোন কাজে তারা আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীতও করে না। তারা আল্লাহ্‌র জ্ঞানের মধ্যে পরিবেষ্টিত। তাদের মধ্যে থেকে যে কেউ নিজেকে মা'বুদ বলে দাবী করবে তার প্রতিফল হবে জাহান্নাম। এ বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে পবিত্র কোরআনে,

"আকাশে যত ফেরেশতা রয়েছে! তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।"

আল কোরআন, সুরা নাজম, আয়াত:২৬

"তারা আগ বেড়ে কথা বলে না; তারাতো তার আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তার সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং তারা নিজেরাও তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যদি কেউ একথা বলেঃ আল্লাহ্‌ ব্যতীত আমিই হচ্ছি মা'বুদ, তাকে আমি প্রতিফল দেব জাহান্নাম।"

আল কোরআন, সুরা আম্বিয়া, আয়াত:২৭-২৯

এ আয়াতের মাধ্যমে ফেরেশতাদের মা'বুদ হওয়ার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেয়া হয়েছে। বিষয়টি যখন এতই পরিস্কার তখন কারো পক্ষেই ফেরেশতাদের আহ্বান করা, তাদের কাছে দোয়া চাওয়া বা তাদের উপাসনা করার কোন অবকাশই থাকেনা এবং এর কোন বৈধতাও দেয়া যায় না। এটা সুস্পষ্ট শির্‌ক এবং তা থেকে সকলেরই মুক্ত থাকা বাঞ্ছণীয়।

০ শয়তানের উপাসনা: শয়তান মানুষের চির শত্রু। সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে বিতারিত পাপিষ্ট ইবলীশ শয়তান আদম সন্তানের পিছু নিয়েছে। মানুষ প্রকৃতগতভাবে নিস্পাপ হয়ে ভূমিষ্ট হয়। ধীরে ধীরে

শয়তানের কুমন্ত্রণায় সে বিপথগামী হয়ে পড়ে। শয়তানের মিথ্যে প্রলোভনে সে আখিরাতকে ভুলে দুনিয়ার সুখ-শান্তি কামাই করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর জন্য সে জড়িয়ে পড়ে নানাবিধ অপকর্মের সাথে। শয়তান সকল অবৈধ কর্ম এবং অপরাধগুলোকে মানুষের কাছে এমন সুশোভিত করে উপাস্থাপন করে যে, সেগুলো আর তার কাছে অপরাধ বলে মনে হয় না বা কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা পূণ্যের কাজ বলেই মনে হয়, যেমন বিধর্মীদের মূর্তি পূজা আর মুসলিমদের বেলায় মাজার পূজা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ্য।

ইবলীশ শয়তান ছিল ফেরেশতাদের সান্নিধ্যে থাকা আল্লাহর একান্ত অনুগত দাস। সে ছিল অগ্নিশিখার তৈরী জ্বিন গোত্রের সদস্য। সে তার অসাধারণ প্রজ্ঞা, সৌর্য-বির্য ও ইবাদতের পরাকাষ্ঠার বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পত্র হয়ে ওঠে এবং ফেরেশতাকুলের শিরোমণি হয়ে যায়। অতঃপর সে অহংকারী হয়ে গেল এবং মাটির তৈরী আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করে বিদ্রোহী হয়ে গেল। তার এই ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরণের ফলে সে আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হয়ে অভিষপ্ত ইবলীশ শয়তান হিসেবে সেখান থেকে বিতারিত হল। সে আল্লাহ্র কাছে পূনঃরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ চেয়ে নিল এবং আদম সন্তানদের বিভিন্ন ভাবে ক্ষতি করার প্রতিজ্ঞা করল। এখান থেকে আদম সন্তানের চির শত্রু হিসেবে ইবলীশের যাত্রা শুরু। এরপর থেকে পৃথিবীর বুকে ইবলীশ শয়তান তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে মানুষের পিছনে লেগে আছে। এ সমুদয় ঘটনা পবিত্র কোরআনে বিবৃত হয়েছে বহু যায়গায়,

"স্মরণ কর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা করা। তখন সবাই সিজদা করল কিন্তু ইবলীশ ছাড়া; সে ছিল জ্বিনদেরই একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল।"

আল কোরআন, সুরা কাহফ, আয়াত: ৫০

"আমি ফেরেশতাদের বলেছি, আদমকে সিজদা কর। তখন সবাই সিজদা করল একমাত্র ইবলীশ ছাড়া, সে কিছুতেই সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন (হে ইবলীস), আমি যখন তোমাকে সিজদা করার আদেশ দিলাম, তখন কোন জিনিস তোমাকে সিজদা করা থেকে বিরত রাখলো? ইবলীশ বললো, আমিতো তার চাইতে উত্তম, তুমি আমাকে বানিয়েছ আগুণ থেকে আর তাকে বানিয়েছ মাটি থেকে। আল্লাহ্ বললেনঃ এক্ষুনি এই স্থান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে তুমি অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং বেড়িয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি অপমানিতদেরই একজন। সে বললঃ হে আল্লাহ্! আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেনঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো। ইবলীশ বললোঃ আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন এ কারনে আমিও শপথ করে বলছি, আমি তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য সরল পথের মাথায় অবশ্যই ওঁৎ পেতে বসে থাকব। অতঃপর আমি পথভ্রষ্ট করার জন্য তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসব; আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞরূপে পাবেন না। আল্লাহ্ বলেনঃ বের হয়ে যাও তুমি এখান থেকে অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায়। আদম সন্তানের যারাই তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয়ই আমি তাদের এবং তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।"

আল কোরআন, সুরা আরাফ, আয়াত:১১-১৮

সেদিন থেকে শয়তান তার প্রতিজ্ঞামত আদম সন্তানের পিছনে লেগে আছে। ইবলীশ চায় মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে গোমরাহীর দিকে ঠেলে দিতে; কিন্তু আল্লাহ্পাক তাঁর বান্দাদেরকে বলেন শয়তানের শৃংখল ভেঙ্গে কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"হে বানী আদম! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেই নি যে, তোমরা শয়তানের পূজা করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমরা শুধু আমারই ইবাদত কর, এটাই হচ্ছে সরল পথ।"

আল কোরআন, সুরা ইয়াসীন, আয়াত: ৬০-৬২

আবার কোরআনের অন্যত্র ইবাদতে শির্ক করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে,

"তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, কোন কিছুতে তাঁর সাথে অংশীদার বানিয়ো না।

আল কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত: ৩৬

এগুলি শয়তানের উপাসনা না করার জন্য পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত তো আমরা জানি; সেক্ষেত্রে শয়তানের উপাসনা কি? তবে বিষয়টি একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে। আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজগুলি থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং তাঁর নির্দেশিত সকল কাজ যথাযথ ভাবে আদায় করাই যখন আল্লাহ্‌র ইবাদতের মৌলিক বিষয়, তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে শয়তানের নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করাই হচ্ছে শয়তানের উপাসনা। অধিকন্তু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত কোনো কাজও যদি সুন্নাহ পরিপন্থী বা সুন্নাহ বহির্ভূত পন্থায় আদায় করা হয়, তাহলে সেটাও হবে শয়তানের উপাসনার শামিল। শয়তানের প্ররোচনায় যে সকল উপাসনা পরিচালনা করা হয় বা যে সকল উপাসনায় শয়তান খুশী হয় তা সবই শয়তানের উপাাসনার অন্তর্ভুক্ত। শয়তানের উপাসনার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে মূর্তি পূজা। মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত মাযার পূজাও মূর্তিপূজার অনুরূপ এবং সেটাও শয়তানের উপাসনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ছাড়াও পীর পূজা, হালাল-হারামের বিধান অমান্য করা, ইত্যাদি বিষয় সহ শয়তানের অনুসরণ করে শয়তানকে সন্তুষ্ট করার যাবতীয় আচরণ শয়তানের পূজার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আনুগত্য ও অনুসরণই হচ্ছে ইবাদতের অন্তর্নিহিত বিষয়। আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা যেমন আল্লাহ্‌র ইবাদত, তেমনি আল্লাহ্‌র আনুগত্য পরিহার করে অন্যকারো বা অন্যকিছুর অনুসরণ করা হলে সেটা গায়রুল্লাহর উপাসনা বলেই প্রতিপন্ন হবে। শয়তানের দেখানো পথ চলা বা শয়তানের আনুগত্য ও অনুসরণ করা হলে সেটা শয়তানের উপাসনা করা হবে বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে শয়তানের দেখান পথে চলতে নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"হে মানুষ! তোমরা যারা ইমান এনেছ, কখনও শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; তোমাদের মধ্যে যে কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করবে, অভিশপ্ত শয়তান তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের আদেশ দেবে।"

আল কোরআন, সুরা নূর , আয়াত: ২১

শয়তান মানুষকে যাবতীয় অবৈধ, অন্যায়, অশ্লীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। কিন্তু সে এ কাজগুলি মানুষের কাছে এত শোভন করে উপস্থাপন করে যে, মানুষ কোনভাবেই সেটা বুঝতে পারে না এবং অন্যায় ও অশ্লীলতাও তখন তার কাছে ন্যায় ও সুশীল বলে মনে হয়। ফলে সে খুব সহজেই শয়তানের কুমন্ত্রণার কাছে হার মেনে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ মানুষকে শয়তানের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। সেজন্য মানুষকে অতি সন্তর্পনে দেখে-শুনে পথ চলতে হবে।

ইসলামের পথে চলার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রদত্ত কতগুলি মূলনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক। সকল ফরয ও ওয়াজেব বিধান, হালাল হারামের বিধান এবং পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় বিধান ইত্যাদি সব কিছুই এ মূলনীতির আওতাধীন। এই মূলনীতির যথাযথ অনুসরণ করাই হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য। পক্ষান্তরে এই মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহ্র বিধান পরিপন্থী কোন নীতির অনুসরণ করা হলে সেটা বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ্ বিরোধী সকল অপশক্তিই শয়তানী শক্তি হিসেবে বিবেচিত। আর শয়তানই হচ্ছে সমস্ত পাপ কাজের উৎসমূল। শয়তানের মন্ত্রণায় মানুষ পাপের পথে ধাবিত হয়। কুফর, শির্ক, হত্যা, ধর্ষণ, সন্ত্রাস ইত্যাদি সহ সকল বড় ও ছোট এমন কোন গুণাহ নেই যেখানে শয়তানের স্পর্শ না থাকে। তাই শয়তানকে চিনে নিতে হবে এবং শযতানকে না বলতে হবে। সকল শয়তানী শক্তি বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। সর্বাবস্থায় শয়তানকে বর্জন করার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত বিজয় এবং জীবনের সার্থকতা। আল্লাহ্র ইবাদতে কোনভাবেই শয়তানকে শরীক করা যাবে না। পবিত্র কোরআনে এ কথাই ঘোষণা করা হয়েছে,

"আল্লাহ্র ইবাদত করবার ও তাগুতকে বর্জন করাবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।"

আল কোরআন, সুরা নাহল, আয়াত: ৩৬

এখানে তাগুত বলতে শয়তান সহ সকল আল্লাহ্ বিরোধী অপশক্তিকে বোঝান হয়েছে। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্র তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং শয়তান সহ সকল অপশক্তিকে বর্জন পূর্বক শির্ক থেকে মুক্ত থাকার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শয়তান বলতে আমরা সাধারণতঃ ইবলীশ শয়তানকেই বুঝে থাকি। বস্তুতঃ শয়তান শব্দটির অনেক ব্যপক অর্থ রয়েছে। শয়তান নানা প্রকৃতির হত পারে। প্রত্যেক কু-মন্ত্রণাদাতাই শয়তান হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। শয়তান হতে পারে জ্বিনদের মধ্যে থেকে অথবা হতে পারে মানবের মধ্যে থেকে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন,

"আমি প্রত্যেক নবীর জন্য বহু শয়তানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি। তাদের কতক শয়তান মানুষের মধ্যে এবং কতক শয়তান জ্বিনদের হতে হয়ে থাকে, যারা একে অন্যকে কতগুলো মনোমুগ্ধকর, ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে।"

আল কোরআন, সুরা আনআম, আয়াত: ১১২

ইবলীশ শয়তান মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই আদম সন্তানের পিছু নিয়েছে। ইবলীশ এবং তার বংশধরেরা জ্বিন বা দানব শয়তান এবং মানুষের মধ্যে থেকে ওদের অনুসারীরা মানব শয়তান হিসেবে পরিচিত। জ্বিন শয়তানকে সনাক্ত করা খুব দূরুহ কাজ। কেননা এরা থাকে দৃষ্টির অগোচরে লোকচক্ষুর অন্তরালে। মানুষের শিরা-উপশিরায় থাকে এদের চলাচল আর প্রভাব বিস্তার করে অন্তরের উপর। সে প্রতি পদক্ষেপে মানুষের ধ্বংস ও বরবাদির চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। প্রথমে তাকে পাপ কাজে উৎসাহিত করে এবং নানা প্রলোভন দিয়ে পাপ কাজের দিকে নিয়ে যায় এবং পথভ্রষ্ট করে ফেলে। এতে সফল না হলে মানুষের সৎকর্ম ও ইবাদত বিনষ্ট করবার জন্য রিয়া, নামযশ, গর্ব ও অহংকার অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়। জ্ঞানী লোকদের অন্তরে সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করে। এভাবে শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। শয়তানী কুমন্ত্রণা অত্যাধিক বিপজ্জনক এবং এর ক্ষতিও গুরুতর। কেননা শয়তানের অনিষ্ট মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয়কে বিশেষত পরকালকে বরবাদ করে দেয়।

শয়তান সুযোগ সন্ধানী। যখনই সুযোগ পায় তখনি সে নিতান্ত চুপিসারে মানুষের আন্তরে প্রবেশ করে এবং তাকে কুমন্ত্রণা যোগায়। তবে তার চক্রান্ত বড়ই দুর্বল। কেননা যখন তার সামনে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন শয়তান পালিয়ে যায়। আবার যখন মুমিনের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায় তখন সে ফেরত আসে এবং পূণরায় কুমন্ত্রণা দেয়। শয়তান এভাবেই মানুষকে ধোঁকা দিয়ে আসছে এবং চিরদিন সে আক্রমন চালাতে থাকবে। মানুষের জীবনকাল পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলতেই থাকবে। তবে একজন খাঁটি ঈমানদরকে সে সহজে কাবু করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের সাথে তার একজন করে শয়তান সংগী আছে। এ প্রসংগে একটি হাদিস বর্ণিত আছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে,

হুযুরে পাক (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

"তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই একটি করে শয়তান নির্ধারিত আছে।"

সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন,

"ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! **আপনার সাথেও কি?"**

তিনি বললেন,

"হাঁ, আমার সাথেও। তবে তার মোকাবেলায় আল্লাহ্‌পাক আমাকে সাহায্য করেছেন।"

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ৬৮৫০

অনুরূপ আর একটি হাদিস এসেছে মাযহারীর রেওয়াতে তফসীর মা'আরেফুল কোরআনে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দু'টি গৃহ আছে, একটিতে ফেরেশতা এবং অপরটিতে শয়তান বাস করে। ফেরেশতা সৎকাজ এবং শয়তান অসৎকাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র যিকির করে, তখন শয়তান পিছনে সরে যায় এবং যখন যিকিরে থাকে না তখন তার চঞ্চু অন্তরে স্থাপন করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।"

তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯০৩

এ জন্যই বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, আল্লাহ্‌র স্মরণে মানুষের অন্তর সদা জাগরিত রাখা আবশ্যক। দানব শয়তানের তুলনায় মানব শয়তানও কম বিপজ্জনক নয়। তারা কুমন্ত্রণা দেয় প্রকাশ্যে এবং অনেক সময় তাদের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়। তবে অনেকসময় মানবরূপী শয়তানদেরও চিহ্নিত করা বড় দুস্কর হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে তাদের কৃমন্ত্রণাও হতে পারে বিপজ্জনক । মানব শয়তানের হাত থেকে রেহাই পেতে তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে বাস্তব ধারণা থাকা অতি আবশ্যক। মানবরূপী শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা হতে পারে বহুমুখী। এর কিছু প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেয়া যেতে পারে:

- **ইহুদী নাছারা সহ অন্যান্য বিধর্মীদের ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ কারো অজানা নয়। ইসলামকে কলুষিত করার চক্রান্ত যুগ যুগ ধরে তারা চালিয়ে এসছে। তাদের কুমন্ত্রণার জালে ফেঁসেও গেছে অনেকে। ইসলামের এই শত্রুদের চিহ্নিত করে রাখা প্রয়োজন, এদের ষড়যন্ত্রের শিকার হলে ইহকাল ও পরকাল উভয়কাল ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের মুসলিম সমাজের অধিকাংশ শির্‌ক ও বেদয়াতী কর্ম এদরই ষড়যন্ত্রের ফসল।**

- **আমাদের সমাজে মুসলিমদের মধ্যে আলেমগণ একটি মর্যাদার আসনে আসীন রয়েছেন। সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় ব্যাপারে তাদেরকে অন্ধ অনুসরণ করতে দেখা যায়। এ অবস্থায় কোন আলেম যদি হয়**

শয়তানের দোসর, তাহলে তার অনুসারীরা বিপন্ন হয়ে পড়বে। বস্তুতঃ কোরআন ও হাদিস আনুসারে সাড়া মুসলিম উম্মার এক থাকার কথা। কিন্তু স্বার্থান্বেষীদের কবলে পড়ে এখানেও বিভক্তি এসেছে। ফলে ইসলামের মধ্যে যে বহু দল ও মতের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কে আসল আর কে শয়তান সেটা যাচাই করা খুবই দুস্কর হয়ে পড়েছে। তবে তার জন্য মেধা, প্রজ্ঞা আর কোরআন ও হাদিসের যথেষ্ট জ্ঞান থাকলে কাজটি সহজ হতে পারে। এ ধরনের কোন আলেমের কথা বা কোন দলের মতবাদ অন্ধভাবে অনুসরণ না করে কোরআন ও হাদিসের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিতে হবে। দলীল প্রমাণ ছাড়া কোন আলেম, পীর বা গোষ্ঠীর কথাই গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে রাখা প্রয়োজন। কেননা আলেমের বেশে কখন কোন শয়তান দুস্কৃতির বীজ বপন করে দেবে তা বোঝারই উপায় থাকবে না।

- **ক্ষমতাসীন লোকদের আশেপশের পারিষদবর্গ তাদের অন্তরে এমন সব কুমন্ত্রণা যোগাতে পারে যার বশঃবর্তী হয়ে সে সব শাসক সাড়া জাহানের মালিকের বিরুদ্ধে মেতে ওঠে এবং এভাবেই একসময় আল্লাহ্‌র যমীনে ফেতনা-ফেসাদের সূত্রপাত ঘটে।**

- **কিছু চোগলখোর আছে যারা কথা-বার্তায় রঙ-ঢঙ মাখিয়ে মানুষের কাছে এমন শোভন করে পেশ করে যেন শুনে মনে হয় এটাই সত্য ও সঠিক এবং এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। আবার কিছু সংখ্যক আছে যারা কামনা বাসনার বিষয় সমূহ বেচাকেনা করে, যা প্রাকৃতিক নিয়মনীতির বিপরীত জিনিসগুলোকে উত্তেজিত করে।**

- **একজন মানুষ বিশ্বস্থ বন্ধু সেজেও প্রতারণার জাল বিস্তার করে তার মন জয় করে নিতে পারে এবং অবশেষে চরিত্র হনন সহ নানাবিধ ক্ষতি করে ফেলতে পারে।**

আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে শয়তানদের অনুসরণ করতে নিষেধ করার পেছনে যে গুঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, শয়তান যে তাদেরকে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত করে কুফরী ও শির্‌ক সহ নানাবিধ অপরাধের সাথে জড়িয়ে ফেলে এবং তাদের সর্বনাশ ডেকে আনে, এ থেকে বিরত রাখার এটা একটি উপায় । দানব ও মানব শয়তানদের সাথে বন্ধুত্ব না করে এদেরকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমত্তার কাজ এবং কল্যাণকর। কতক মানুষ আছে যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্পর্কে অযথা বিতণ্ডা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানের সাথেই বন্ধুত্ব করে। এদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"মানুষের মধ্যে কিছু অজ্ঞ লোক আছে যারা না জেনে না বুঝে আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের; অথচ তার সম্পর্কে এ ফয়সালাতো হয়েই আছে যে, যে কেউই তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে গোমরাহ করে দেবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে।"

আল কোরআন, সুরা হাজ্জ, আয়াত: ৩-৪

এখানে বলা হচ্ছে যে, কিছু মানুষ জ্ঞানের অভাবে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে আর মনে করে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এটার উপর সক্ষম নন। যত বিদ'আতী ও পথভ্রষ্ট লোক রয়েছে তারা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর সুন্নতকে ছেড়ে দেয় এবং বাতিল ও মিথ্যার আনুগত্যে লেগে পড়ে এবং তাদের মনগড়া মতবাদের উপর আমল করে। এদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, যে কেউ এদের সাথে বন্ধুত্ব করবে এরা তাকে পথভ্রষ্ট করে নিয়ে যাবে জাহান্নামের শাস্তির দিকে। কাজেই শয়তান ও তার দোসরদের সাথে বন্ধুত্ব নয়, বরং উপেক্ষা আর প্রত্যাখ্যানই কল্যাণকর।

শয়তানের বহুমুখী আক্রমন থেকে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা করা প্রত্যেকের জন্যই জরুরী। শয়তান সে ব্যক্তির সামনে দুর্বল, যে তার গোপন প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত আছে এবং তা থেকে সতর্ক হয়ে তার অন্তরের গোপন ছিদ্রগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম। মানবরূপী শয়তান যখনই তার সামনে আসবে তখন সে জেগে যাবে এবং তাকে প্রত্যখ্যান করবে। এরপর অবশ্য সে আবারও আসে, তবে আসে নীরবে। দানব শয়তানের প্ররোচনা যেহেতু চলে দৃষ্টির আঁড়ালে অন্তরকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে, সেহেতু এদের মুখোমুখি হবার কোন সুযোগ নেই। তবে এদের হাত থেকে রেহাই পাবার মূলমন্ত্র হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্মরণ। ঈমান দৃঢ় ও মজবুত হলে শয়তানী নফস নিস্তেজ থাকে। তখন তার দ্বারা সব ভাল ভাল আমল সম্পাদিত হতে থাকে। পক্ষান্তরে ঈমান দুর্বল হলে শয়তানী নফস জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তখন তার দ্বারা সব অন্যায় এবং শির্‌ক ও কুফরের মত গুরুতর অপরাধসমূহ অবাধে সংঘটিত হতে পারে। শয়তানকে পরাস্ত করতে হলে তাই ঈমানী শক্তিকে বৃদ্ধি করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল থাকতে হবে। ঈমানী শক্তি এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, সে আলোর তেজস্ক্রিয়ায় শয়তান দিশেহারা হয়ে পালিয়ে বেড়ায়। শয়তান থেকে আশ্রয় গ্রহণ করার পদ্ধতি স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলাই মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"কখনো যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে সাথে সাথেই তুমি আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাও; অবশ্যই তিনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন।"

আল কোরআন, সুরা আরাফ, আয়াত: ২০০

কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

"তুমি বলো, হে আমার মালিক! শয়তানের যাবতীয় ওয়াসওয়াসা থেকে আমি তোমার পানাহ চাই।"

আল কোরআন, সুরা মোমেনুন, আয়াত: ৯৭

আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কোরআনের সবশেষ সুরাটিতে মানব ও দানব শয়তানের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার মূলমন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন,

"তুমি বলোঃ আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের কাছে, মানুষের অধিপতির কাছে, মানুষের মা'বুদের কাছে, আত্মগোপণকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, জ্বিনদের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে।"

আল কোরআন, সুরা নাস, আয়াত: ১-৬

o জ্বিনের উপাসনা: জ্বিনজাতি আল্লাহ্‌ তা'আলার এক অনন্য সৃষ্টি। জ্বিন হচ্ছে একপ্রকার শরীরি, আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্ট জীব। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। এ কারনেই তাদেরকে জ্বিন বলা হয়। তারা অগ্নিশিখা থেকে সৃষ্টি। এ জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। জ্বিনকেও আল্লাহ্‌ তা'আলার তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন বলে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন,

"আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এ জন্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।"

আল কোরআন, সুরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬

মানুষ যেমন আল্লাহ্‌র বান্দা, জ্বিনও তেমনি আল্লাহ্‌র বান্দা। উভয়কেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। সেক্ষেত্রে মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি জ্বিনদেরও ইবাদত শুরু করে দেয় তাহলে সেটা হয় চরম পথভ্রষ্টতা। তথাপিও অজ্ঞতাবশতঃ মানুষকে বিভিন্ন সময়ে জ্বিনদের স্মরণাপন্ন হতে দেখা যায়– যা প্রকারান্তে এদেরকে উপাসনারই শামিল। জ্বিনদের আলাহ্‌ই পয়দা করেছেন তবুও মানুষ এদেরকে আলাহ্‌র শরীক মনে করে থাকে। যেমন পবিত্র কোরআনে উলেখ রয়েছে,

"তারা জ্বিনকে আলাহ্‌র সাথে শরীক মনে করে, অথচ আলাহ্ তা'আলাই জ্বিনদের পয়দা করেছেন।"

আল কোরআন, সুরা আনআম, আয়াত: ১০০

এখানে পবিত্র কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মানুষ জ্বিনদেরকে আলাহ্‌র সাথে শরীক করে। প্রাচীন আরবের মুশরিকগণ নানাভাবে জ্বিনদেরকে আলাহ্‌র শরীক সাব্যস্ড় করত এবং তাদের উপাসনা করত। কোরআনপাকে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে বাহ্যত তারাও জ্বিনদের দুষ্ট শ্রেণীর নাম। শয়তানের উপাসনা শিরোনামে যদিও মূলত জ্বিনেরই উপাসনা আলোচিত হয়েছে তবুও বিষয়টি এখানে জ্বিনের উপাসনা নামে আলাদা শিরোনামে উপস্থাপন করা হলো। কেননা জ্বিন জাতির একটি আলাদা পরিচিতি আছে। মুনলিমগণ সরাসরি জ্বিনদের উপাসনা না করলেও তাদের মাঝে জ্বিনের প্রতি ধারণাপ্রসূত এমন কিছু আচার-আচরণ পরিলক্ষিত হয় যা বাহ্যত উপাসনা না বোঝালেও তা প্রকারান্ড়ে তাদের উপাসনারই শামিল। এ বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব প্রদান করার উদ্দেশ্যে তা আলাদা ভাবে এ শিরোণামে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

জ্বিনের মধ্যে কিছু আছে মুমিন আর কিছু আছে কাফির জ্বিন। কাফির জ্বিনগুলি দুষ্ট প্রকৃতির জ্বিন। এদের মাধ্যমেই মানুষের অনিষ্ট সাধিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে জ্বিনরা মানুষকে ভয় করত। কিন্তু কিছু মানুষের আচরণে তাদের ভয় ভেঙ্গে যায় এবং তারা নানাভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা করতে থাকে। তারা ভয়-ভীতি দেখিয়ে, উৎপীড়ন করে এবং অন্যন্য ভাবে মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে। এতে মানুষের ধারণা জন্মে যে, যদি জ্বিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করা হয়, তাহলে এদের উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। এ ধারণার বশঃবর্তী হয়ে মানুষ বিপদে পড়ে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য জ্বিনদের আহ্বান করতে শুরু করে। মানুষের এ অবস্থা দেখে দুষ্ট জ্বিনের সাহস আরও বেড়ে যায় এবং তারা আরও বেশী বেশী মানুষের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠল। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের আশ্রয় গ্রহণ করতো, ফলে তারা জ্বিনের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত।"

আল কোরআন, সুরা জ্বিন, আয়াত: ৬

তফসীর ইবনে কাসীরের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, জ্বিনদের এত ঔদ্ধত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ছিল তাদের কাছে আত্মসমার্পণকারী কিছু মানুষের আচরণ। প্রকৃতপক্ষে জ্বিনরা মানবদেরকে ভয় করত, এমনকি যে জঙ্গলে বা উপত্যাকায় মানুষ যেত সেখান থেকে জ্বিনেরা পালিয়ে যেত। কিন্তু যখন তারা পর্যাবেক্ষণ করলো যে, মুশরিকরা যখন কোন বিজন জঙ্গলে বা উপত্যাকায় অবস্থান করতো তখন এই বলে প্রান্তরের জ্বিনদের আশ্রয় প্রার্থণা করতো, "এই উপত্যাকার জ্বিন সরদারের আমরা স্মরণাপন্ন হলাম এই স্বার্থে যে, সে আমাদের ও আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের ধন-মালের কোন ক্ষতি সাধন করবে না"– তখন থেকে

জ্বিনদের সাহস বেড়ে গেল। তারা মনে করলো যে, মানুষরাই তো তাদের ভয় করে। সুতরাং তারা নানা প্রকারে মানবকে ভয় দেখাতে, কষ্ট দিতে ও উৎপীড়ন করতে লাগল।

জ্বিনের মাধ্যমে মানুষের অনিষ্ট সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং এ ভয়ে তাদেরকে আহ্বান করা ও তাদের আশ্রয় প্রার্থণা করা এক ধরনের জ্বিনের উপাসনা বৈ কিছু নয়। কিন্তু উলুহ্যিয়াতের বৈশিষ্টের দাবীতে উপাসনা পাবার হকদার কেবলমাত্র এবং একমাত্র আল্লাহ্। সেক্ষেত্রে জ্বিনদের প্রতি এ জাতীয় আচরণ করা হলে এ হককে অগ্রাহ্য করা হয় এবং জ্বিনদেরকে আল্লাহ্র উপাসনায় শরীক সাব্যস্ত করা হয়– যা ইবাদতের শিরক হিসেবে গণ্য হয়।

আমাদের বর্তমান সমাজিক প্রেক্ষাপটেও মুসলিমদের মাঝে জ্বিন কেন্দ্রিক এ জাতীয় উপাসনাগত আচরণ পরিলক্ষিত হয় সমাজের আনাচে-কানাচে। অজ্ঞ লোকেরা জ্বিনের অনিষ্ট হতে ভয় পায় এবং এর জন্য তারা জ্বিনকে নানা ভাবে খুশী করতে ব্যস্ত থাকে। মুসলিমদের যে সকল আচরণে এ জাতীয় শির্ক সংঘটিত হতে পারে তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

০ নবী রাসূলদের উপাসনা: মহান আল্লাহ্র তা'আলা যুগে যুগে আসমানী কিতাব ও সহীফা সহ বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে সত্য দ্বীন তথা হিদায়েতের পথ প্রদর্শনের জন্য। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐশীবাণীর সর্বশেষ সংস্করণ পবিত্র আল-কোরআন সহ প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানব জাতির জন্য। তার মাধ্যমে নবুয়াত এবং রিসালাতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটেছে বিধায় তিনি আল্লাহ্র মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে বিবেচিত। পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণ বিভিন্ন সময়ে প্রেরিত হয়েছেন নির্দিষ্ট একটি জাতি বা গোত্রের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্য থেকেই সব নবী রাসূলদের মনোনীত করেছেন। যেমন আল্লাহপাক্ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

"তোমার পূর্বে আমি মানুষকেই (সব সময় নবী বানিয়ে) তাদের কাছে পাঠিয়েছি। তোমরা যদি না জান তাহলে আগের কেতাব ওয়ালাদের কাছে জিজ্ঞেস কর। আমি তাদের এমন সব দেহাবয়াবব দিয়ে পয়দা করিনি যে তারা খাদ্য খেত না, তারা কেউ চিরস্থায়ীও হয়নি।"

আল কোরআন, সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৭-৮

কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

"তোমার পূর্বে আমি জনপদবাসীদের মধ্য হতে যত জনকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছি তারা সবাই (তোমার মত) মানুষই ছিল। আমি তাদের উপর ওহী নাযিল করতাম।"

আল কোরআন, সুরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৯

আবার বলা হয়েছে,

"(হে নবী!) তোমার আগে আমি আরো কতো রাসূল পাঠিয়েছি, তারা মানুষের মতই আহার করতো, তারা হাটে বাজারে যেত। মানুষের মধ্য থেকে রাসূল পাঠিয়ে আমি তোমাদের একজনকে আরেকজনের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি"

আল কোরআন, সুরা ফোরকান, আয়াত: ২০

উপর্যুপরি আয়াতগুলি থেকে এটা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, যমীনে বসবাসকারী মানুষের মধ্য থেকেই সব সময় নবী রাসূল মনোনীত হয়েছে এবং সকল নবী রাসূলগণই ছিলেন মানুষ। আমাদের শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -ও এর ব্যতিক্রম নন।

নবী রাসূলগণ প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদের পয়গাম এবং সত্যের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। তারা নিজেরা যেমন এক আল্লাহ্র ইবাদত করেছেন তেমনি নিজ নিজ সম্প্রদায়কেও এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এক আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য এবং সকল আল্লাহ্ বিরোধী শক্তিগুলোকে বর্জন করার নির্দেশ দিবার জন্যই তিনি তাদেরকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহপাক বলেন,

"আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি, যাতে করে সে বলতে পারে, তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিরোধী শক্তিসমূহকে বর্জন করো।"

আল কোরআন, সুরা নাহল, আয়াতঃ৩৬

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

"আমি তোমার আগে এমন কোন নবী পাঠাই নি যার কাছে ওহী পাঠিয়ে আমি বলিনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং তোমরা সবাই আমার ইবাদত কর।"

আল কোরআন, সুরা আম্বিয়া, আয়াতঃ ২৫

উপর্যুপরি আয়াতসমূহ এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইবাদত প্রাপ্যতার হকদার একমাত্র আল্লাহ্। কোন নবী রাসূলগণই এ হকের দাবীদার নহেন। তারা নিজেরাও যেমন এক আল্লাহ্র ইবাদত করতেন তেমনি উম্মতদেরকেও এক আল্লাহ্রই ইবাদত করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। কোন নবীই আল্লাহ্কে ছেড়ে তার নিজের ইবাদত করতে বলেননি। সেক্ষেত্রে কোন প্রকার উপাসনা যদি নবী রাসূলদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা হয়, তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে শির্কে পরিগণিত হবে।

কোন নবী রাসূলের কেহই নিজেকে মা'বুদ বলে দাবী করেননি বা তার অনুসারীদেরকেও তার ইবাদত করতে বলেন নি। তাদের কেইই মানবরূপী মা'বুদও ছিলেন না। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"কোন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাঁর কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুয়াত দান করবেন, অতঃপর সে লোকদের বলবেঃ তোমরা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে আমার দাস হয়ে যাও, বরং সে বলবে তোমরা তোমাদের মালিকের বান্দা হয়ে যাও"

আল কোরআন, সুরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ৭৯

সুতরাং নবী রাসূলদের ইলাহ্ হওয়ার বা তাদের উপাসনা করার কোন দলীল-প্রমাণ নেই। এতদসত্বেও হযরত ইসা (আঃ)-কে তার অনুসারীরা মানবরূপী আল্লাহ্ ভেবে নিয়ে তার উপাসনা করে থাকে। এটা তাদের ধৃষ্টতা এবং শির্কী আচরণ। এ বিষয়ে যীশুখ্রিষ্টের উপাসনা শিরোণামে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেরিত হয়েছেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে সারা বিশ্বজাহানের জন্য মানবতার রহমত স্বরূপ। অন্যান্য নবী রাসূলের মত তিনিও মনোনীত হয়েছেন মানুষের মধ্যে থেকেই। এক আল্লাহ্র ঘোষণা সহ সত্য দ্বীনের প্রচার এবং একমাত্র তাঁর ইবাদতে লেগে

থাকার দাওয়াত প্রদানের জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

"হে নবী! তুমি বলো, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; কিন্তু আমার উপর ওহী হয় যে, তোমাদের মা'বুদ হচ্ছে একজন, অতএব তোমরা তাঁর ইবাদতের দিকেই সোজা হয়ে থাক আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা কর আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।"

আল কোরআন, সুরা হা-মীম আস্ সাজদা, আয়াত:৬

নিঃসন্দেহে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন একজন মানুষ ও রাসূল। সে কারণেই তিনি হচ্ছেন আদম সন্তান। স্বভাবতঃই শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন মাটির তৈরী দেহাবয়াব বিশিষ্ট মানুষ। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা তাকে নূরের তৈরী রাসূল বলার ধৃষ্টতা দেখায়, এমনকি একশ্রেণীর অতি উৎসাহী নবী প্রেমিক আলেমেরও অনুরূপ ধারণা। তাদের এ ধারণা বস্তুতঃ খ্রিষ্টানদের ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র আসনে সমাসীন করার মত অপচেষ্টা বৈ কিছু নয়। তাদের এ বক্তব্যের পিছনে যে সকল প্রমাণাদি তারা উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করে থাকে, সেগুলি মূলত তাদের পক্ষ থেকে মূল বিষয়ের অপব্যাখ্যার ফসল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর অন্তর ছিল জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত। যে দ্বীনের আলোকে তিনি আলোকিত ছিলেন সেটাকেই বস্তুতঃ বিরুদ্ধবাদীরা তার দেহাবয়বের নূর বলে চালিয়ে দিচ্ছেন এবং তাকে নুরের তৈরী বলছেন। কিন্তু তাদের এ অপচেষ্টা ব্যর্থ হবারই। কেননা সত্য আগত হলে মিথ্যা আপনা থেকেই অপসারিত হয়। কোরআনের বর্ণনা মতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন মাটির তৈরী আদম সন্তান এবং একজন পয়গম্বর। আল্লাহ্পাক বলেন,

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের একই ব্যক্তি (আদম আঃ) হতে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনি তা হতে তার সহধর্মীনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।"

আল কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত:১

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি প্রথমতঃ মৃত্তিকা হতে, অতপর শুক্র হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে তারপর মাংশপিণ্ড হতে।"

আল কোরআন, সুরা হাজ্জ, আয়াত:৫

কোরআনের এ সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা সত্বেও নিন্দুকদের পক্ষ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে নুরের তৈরী বলা ধৃষ্টতা বৈ কি!

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- কে আল্লাহ্ তা'আলা সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন মানুষের জন্য সরলপথের দাওয়াত নিয়ে। তিনি ছিলেন একজন আল্লাহ্র শাস্তির ভয় প্রদর্শণকারী, সতর্ককারী এবং জান্নাতের সুসংবাদদাতা। যেমন আল্লাহ্পাক বলেন,

"অবশ্যই আমি তোমাকে সত্যদ্বীনসহ একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি; কখনও কোনো উম্মত এমন ছিলো না, যার জন্য কোনো সতর্ককারী অতিবাহিত হয়নি।"

আল কোরআন, সুরা ফাতির, আয়াত: ২৪

নবীর উম্মত হিসেবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। পবিত্র কোরআনে বহু জায়গায় আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ এসেছে।

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।'

আল কোরআন, সুরা আনফাল, আয়াত: ২০

এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করা অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্য রাসূলের আনুগত্য বা অনুসরণ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। রাসূলের অনুসরণ ছাড়া আল্লাহ্‌র আনুগত্য অর্থহীন। তবে রাসূলের আনুগত্য বলতে কি বুঝায়, এ সম্পর্কে আমাদের সকলেরই পরিষ্কার এবং সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। একজন মানুষের ইবাদত সহ সারা জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড রাসূলের আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত করা অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ করাই হল তাঁর আনুগত্য। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিজে করেছেন, যা করার জন্য সাহাবাগণকে আদেশ দিয়েছেন বা যা করার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন তা পালন করা এবং যা নিজে করেননি এবং অন্যদেরকেও করতে বলেননি অথবা যা করতে নিষেধ করেছেন বা যা করার অনুমতি দেননি–সে সকল আচরণ থেকে বিরত থাকাই প্রকৃতপক্ষে রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ। রাসূলের সুন্নাত পরিপন্থী কোন আমল বিদ'আত হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্যও হবে না; অধিকন্তু প্রত্যেকটি বিদ'আতই হচ্ছে গোমরাহী এবং এর মধ্যে দিয়েই শির্‌কের মত কঠিন আপরাধগুলোর উদ্ভাবন হওয়াটাও স্বাভাবিক।

মানুষের উচিত রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁর রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম পেশ করা। আল্লাহ্ স্বয়ং তার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর উপর দরূদ পৌঁছান; অতএব হে ঈমানদার ব্যক্তিরা তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ পাঠাতে থাক এবং সালাম পেশ করো।"
আল কোরআন, সুরা আহযাব, আয়াত: ৫৬

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করা প্রতিটি মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে তার সাহাবীদেরকে তার উপর কিভাবে দরূদ পাঠাতে হবে তা বলে দিয়েছেন। আমাদের উচিত তার সুন্নাতের অনুসরণেই তার উপর দরূদ পাঠান। অন্যথায় যদি কেউ মনগড়া দরূদ তৈরী করে তা পেশ করার চেষ্টা করে, তবে সেটা বিদ'আত হতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা শির্‌কেও পর্যবশিত হতে পারে। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর আনুগত্যের নামে এমন কোন বিশ্বাস পোষণ বা আচরণ করা যাবে না, যা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেকে কখনো উপাস্য হিসেবে দাবী করেন নি বা অন্য কাউকেও তার উপাসনা করতে বলেন নি; বরং নিজেকে তিনি রাসূল হিসেবেই পরিচয় দিয়েছেন এবং এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই বলে ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে তাকে উদ্দেশ্য করে এ কথাই বলা হয়েছে,

"হে মুহাম্মদ! তুমি বলোঃ হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার

রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই।"

আল কোরআন, সুরা আরাফ, আয়াতঃ ১৫৮

আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং নবীর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন,

"আল্লাহ্র ফেরেশতা ও তাঁর নবীদের প্রতিপালকরূপে স্বীকার করে নিতে এ ব্যক্তি তোমাদের কখনো আদেশ দিবে না।"

আল কোরআন, সুরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ৮০

এত সুস্পষ্ট ঘোষণার পরেও মানুষ পদে পদে ভুল করে এবং মুর্খতাবশতঃ নবী রাসূলদের উপাসনা এমনকি অন্যান্য সৃষ্টির উপাসনা পর্যন্ত করে ফেলে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- কে সিজদা করা, তার যিকির করা, তার কাছে দোয়া চাওয়া বা শাফায়াত কামনা করা ইত্যাদি প্রকারের আচরণ প্রকারান্তে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর উপাসনার শামিল এবং তা শিরকী কর্ম। এ বিষয়ে ২য় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার করার প্রচেষ্টা করা হবে।

০ পীর-মাশায়েখ ও আলেমদের উপাসনাঃ মানুষ মানুষের উপাসনা করতে পারে এটা অবাস্তব বলে মনে হলেও বিষয়টি মোটেই তা নয়। কেননা উপাসনা শুধু সিজদা দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং উপাসনার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। মানুষের বিশ্বাস আচরণের মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা উপাসনার অন্তর্ভুক্ত। মানুষের যে সকল আমল কেবলমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়া উচিত তা কোন মানুষের উদ্দেশ্যে করা প্রকারান্তে তাদের উপাসনার শামিল। এভাবেই মানুষকে আল্লহ্ তা'আলার পাশাপাশি পীর-অলি, ধর্মীয় গুরু তথা শাসক-প্রশাসকের উপাসনা করতে দেখা যায়। অন্ধ অনুসরণ, আনুগত্য, মানত কিংবা ভরসা, ভয় ও বিশেষ ভালোবাসা প্রকাশক সকল আচার-আচরণ এ জাতীয় উপাসনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মানুষের জীবন সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ্ মানুষকে কতগুলো নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন। আর নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলার জন্য মানুষকে উপহার দিয়েছেন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আল-কোরআন। মানুষের ধর্মীয় জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই এর বিধান অনুসারেই পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছণীয়। সেই সাথে শরিয়তের আর একটি মূল্যবান উপাদান হচ্ছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর সুন্নাহ। তাই আনুগত্য ও অনুসরনের মৌলিক বিষয় হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। এ মৌলের আওতায় থেকে মানুষ যে কাউকে অনুসরণ করতে পারে। এ হিসেবে শরিয়তে সংযোজিত হয়েছে এজমা ও কিয়াস। কোরআনের অস্পষ্ট বিষয়গুলি হাদিসের সহায়তার এজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে ফয়সালা করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোরআন ও সুন্নার সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিষয় কোনভাবেই শরীয়তে গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে না। সেক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী মানুষের তৈরী কোন নিয়ম-নীতির অনুসরণ করা তাদেরকে মা'বুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর। ইহুদী ও খ্রীষ্টনরা এভাবেই তাদের পুরোহিত ও ধর্মযাজকদের রব বানিয়ে নিয়েছিল। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন,

"তারা (ইহুদী খ্রীষ্টানগণ) আল্লাহ্কে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্মযাজকদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে।"

আল কোরআন, সুরা তাওবা, আয়াতঃ ৩১

ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তাদের আলেম ও যাজকদের পরিষ্কার ভাষায় মা'বুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র রয়েছে, তাকে তারা ওদের জন্য উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ তারা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে চলে তা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের যতই বরখেলাপ হোক না কেন! এভাবে ইহুদী খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সার্থপর পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে–এটাই তাদেরকে উপাসনার শামিল। কোরআনে বর্ণিত এ আয়াতটি মুসলিমদের জন্যও অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কেননা মুসলিমদের অবস্থাও ঐ ইহুদি খ্রীষ্টানদের মত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা আবশ্যক। মুসলিমদের মাঝেও ইমাম, পীর, আলেম জাতীয় ধর্মগুরুর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে এদের অধিকাংশই সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন বা আছেন। তারা শরিয়তের জটিল বিষয়গুলি কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করে সহজ ও সরল সমাধান বের করে তার উপর আমল করেন এবং অন্যদেরকেও প্রভাবিত করেন। আর সাধারণ মানুষ মুজতাহিদ ইমামদের পায়রবী করে। এই পায়রবী হলো কোরআনের নির্দেশক্রমে, কাজেই তা মূলত আল্লাহ্‌রই পায়রবী। তবে ইজতেহাদী মাসালা সহীহ সুন্নাহ দ্বারা ভুল প্রমাণিত হলে, তার উপর আমল করা জায়েয নয়। সেক্ষেত্রে সুন্নার অনুসরণই অগ্রগন্য এবং বাধ্যতামূলক। কোনো ইজতেহাদী মাসালার বিপরীতে সহীহ হাদিস পাওয়া গেলেও মুজতাহিদ ইমামের সিদ্ধান্তের উপর অনঢ় থাকা এক ধরনের গোঁড়ামী এবং এর নাম অন্ধ অনুসরণ। কিন্তু ইসলামে এ ধরনের অন্ধ অনুসরণের কোনো স্থান নেই এবং এটা নিশ্চিত দোষণীয়। এভাবে চোখ, কান বন্ধ করে কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী মতামতে কোনো ইমাম, পীর বা আলেমের অন্ধ অনুসরণ প্রকারান্তে তার উপাসনার শামিল।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে পীর, ইমাম ও আলেমদের অবদান অনস্বীকার্য। সাধারণ মানুষের জন্য তারা নিঃসন্দেহে আশির্বাদ স্বরূপ। তথাপিও এর উল্টো পিঠের চিত্রটিও আমাদের একবার খতিয়ে দেখা দরকার। এ সমাজে দ্বীনের মধ্যে অনেক বিভক্তি লক্ষণীয়। ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের পীর ও আলেমদের অস্তিত্ব সাধারণ মানুষের জন্য একটি হুমকি স্বরূপ। বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন মতাবাদের কারণে সৃষ্ট অন্তঃদ্বন্দে তারা অনেকসময় দিশেহারা হয়ে পড়ে। কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক সেটা তারা বুঝে উঠতে পারে না। আবার একটু সচেতন অনুসারীর বেলায় এ দ্বন্দ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফেতনার সৃষ্টি করে ফেলে। এভাবেই আমাদের সমাজে একটি আন্তঃমাযহাব ঠাণ্ডা লড়াই চলে আসছে বহুদিন থেকে। কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে এ বিভক্তি কারো কাম্য নয় এবং এর পরিণতিও সুখকর নয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ বলেন,

"নিশ্চয়ই যারা স্বীয় দ্বীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে (হে নবী!) তোমার কোন সম্পর্ক নেই, তাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাওলায় রয়েছে।"

আল-কোরআন, সুরা আনআম, আয়াত-১৫৯

কাজেই দ্বীনের মধ্যে বিদ্যমান বিভেদ দূর করা জরুরী। সেজন্য প্রয়োজন আলেমদের সদিচ্ছা, সহনশীলতা, ত্যাগ আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলকেই সহীহ সুন্নার দিকে এগিয়ে আসতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন কোরআনে ও সুন্নার সাথে সাংঘর্ষিক কোন ইজতেহাদী মতবাদ সাধারণ মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয় না হয়। প্রত্যেকটি মাযহাবেরই সহীহ হাদিস সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। এর পরিপ্রেক্ষিতে যার মতবাদ সহীহ সুন্নার দিকে যায়, তাকেই অনুসরণ করা কর্তব্য।

মাযহাবের ইমমগণেরও ছিল এই বক্তব্য। তবে মাযহাব অনুসারী আলেমগণ অনেকসময় বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ান। তাদের গোঁড়ামীর কারণে তারা নিজের ইমামকে ছাড়তে নারাজ এবং ইমামের মতামত ভুল প্রমাণিত হলেও তাদের মতামতের উপর বহাল থাকতেই তারা পছন্দ করেন। এটা তাদের গোঁড়ামী এবং কোরআনে বর্ণিত অনুসরণের মূলনীতি বিরুদ্ধ আচরণ। এ বিষয়ে ইমামদের অনুসারী আলেমদের উচিত সহীহ হাদিসের আলোকে স্ব-স্ব মাযহাবে বিদ্যমান ভুল-ত্রুটিগুলি শুধরে নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তা প্রচার করা। তাহলে হয়ত দ্বীনের মধ্যে বিভক্তি অনেকটা কমে যেত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে সবাই সঠিক পথের দিশা পেতে সক্ষম হত। অন্যথায় দ্বীনের এ বিভক্তি কাটিয়ে পূর্ণকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ।

একশ্রেণীর আলেম রয়েছেন যারা উল্টো-পাল্টা ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে সমাজে এক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকেন। এদের কোরআন ও সুন্নার সাথে সাংঘর্ষিক ফতোয়া প্রদানের ফলে সমাজে অনেকসময় অঘটন ঘটার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের আলেমগণ সমাজের জন্য বিপজ্জনক। তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে ঐ জাতীয় পীর বা আলেম যারা নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে। তারা লোভের বশঃবর্তী হয়ে শর'ই বিধানের পরিবর্তন করে নেয় বা নিজেদের সুবিধামত বিধান তৈরী করে নেয় এবং তা মানুষের মধ্যে চালু করে দেয়। এ জাতীয় ধর্মীয় নেতা আমাদের সমাজে বিড়ল নহে। তারা দুনিয়াবী স্বার্থে ধর্মের নামে মনগড়া নিয়ম-নীতি তৈরী করে নেয় এবং তাদের অনুসারীদের সেদিকে পরিচালিত করে। এ ধরনের স্বার্থান্বেষী মহলের অনুসরণ কোন অবস্থাতেই বৈধ নহে। এ ধরনের অনুসরণ বস্তুতঃ এক প্রকারের পীর পূজার নামান্তর। তাদের অবস্থাও ঐ ইহুদী খ্রীষ্টানদের ন্যায় নিজেদের আলেমদেরকে মা'বুদ বানিয়ে নেওয়ার শামিল।

০ মাজার পূজা বা উপাসনাঃ মাজার শব্দটি দরগাহ শব্দের প্রতিশব্দ। এর ধাতুগত অর্থ 'যিয়ারতের স্থান'। মাজারকে রওযা বা কবরও বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে মাজার বলতে আউলিয়া-দরবেশ বা পীর-অলিগণের সমাধিস্থলকে বোঝায়। উপমহাদেশের উল্ল্যেখযোগ্য মাজারগুলির মধ্যে রয়েছে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর মাজার, নিজামুদ্দিন আওলিয়ার মাজার, হরত শাহ জালালের মাজার, বায়েজীদ বোস্তামির মাজার, খানজাহান আলীর মাজার ইত্যাদি– (বাংলা পিডিয়া)।

মাজার পূজা বলতে মাজারে সমাধিস্ত মৃত ব্যক্তির উপাসনা করাকে বোঝায়। এটাও একপ্রকার উপাসনার শির্ক। এ শির্ক সংঘটিত হতে পারে মাজার জিয়ারতকালে মাজারে সিজদা করা, মাজারের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা এবং মাজার কেন্দ্রিক আরো অনেক আচার আচরণের মাধ্যমে।

নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে কবর জিয়ারত করেছেন এবং তিনি তার উম্মতদের কবর যিয়ারত করতে উৎসাহিত করেছেন। আর সাহাবীগণও কবর যিয়ারত করেছেন, একথা সত্য। তবে তারা কখনই কোন কবর বা মাজারে দোয়া চাইতে যাননি। তারা কবরে সালাম পেশ করেছেন এবং মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করেছেন। সুন্নাতের এ শিক্ষার বাইরে কোন স্থানে বা সময়ে বা কোন মৃতব্যক্তির কাছে গিয়ে দোয়া করাকে কবুলের মাধ্যম মনে করা এবং এটাকে দোয়া করার রীতি হিসেবে গ্রহণ করা খেলাফে সুন্নাত বা বিদ'আত। আজকের যুগে অনেকেই হাজত পূরণের লক্ষ্যে মৃতব্যক্তির কাছে দোয়া চাইতে যান। আবার অনেকেই হয়ত কবরস্থ মৃতব্যক্তির কাছে কিছু চান না, তবে আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাওয়া প্রয়োজন হলে তারা চলে যান কোন পীর-অলির মাজারে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তো মানুষের খুব নিকটবর্তী রয়েছেন, সেখানে

মাজারে যাওয়ার প্রয়োজনটা কি? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়ার জন্য কারো মাজারে যাওয়া আল্লাহ্‌র ওয়াদায় অবিশ্বাস করার নামান্তর। কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌পাক বলছেন,

"(হে নবী) আমার কোন বান্দা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (তাকে তুমি বলে দিও) আমি তার একান্ত কাছেই আছি; আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে।"

আল-কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত-১৮৬

অতএব আল্লহ্‌পাক যখন বলছেন যে, তিনি কাছেই আছেন এবং বান্দা ডাকলেই সাড়া দেবেন, তখন তাঁর কথায় বিশ্বাস না করে আপনি দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। কেন দৌড়াচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি কখনো কোথাও বলেছেন যে, কোনো অলি বা বুজুর্গের মাজারে গিয়ে দোয়া করলে তা কবুল হবে? না, কোথাও বলেন নি; বরং তিনি বিভিন্ন হাদিসে শুধুমাত্র যিয়ারত অর্থাৎ কবরস্থ ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া ও তার জন্য দোয়া করা ছাড়া কবরের কাছে অন্য কোন ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন– (এহইয়াউস সুনান)।

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগের অনেক পরে মানুষের মাঝে বুজুর্গগণের কবরের নিকট দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে নিজের হাজত প্রয়োজন প্রার্থণার রীতি ক্রমান্নয়ে দেখা যেতে থাকে। ইসলামী শিক্ষার অভাব, কুসংস্কার ও জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস ছিল এর কারণ। জনশ্রুতি আছে– অমুক বুজুর্গের কবরের কাছে দোয়া করলে তা কবুল হয়। ওমনি মানুষ ছুটলেন সেখানে দোয়া করতে। সরলমনা অনেক আলেম ও নেককার মানুষও এ সকল বিষয়ে জড়িয়ে গেছেন। এভাবে আমাদের সমাজের অসংখ্য মুসলিম বিপদ-আপদ, রোগ-ব্যাধি, মামলা-মোকদ্দমা, ফসল, সন্তান, বিবাহ ইত্যাদি জাগতিক সমস্যাদির জন্য দেশের অগনিত মাজারে গিয়ে মাজারে শায়িত মৃতব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করেন। তাদের নিকট সমস্যা মিটানোর আব্দার করেন। তারা যেন খুশী হয়ে সমস্যা মিটানোর ব্যবস্থা করেন এই আশায় প্রার্থণার পূর্বে সিজদা, ক্রন্দন, নজর, মানত, ভেট, উৎসর্গ, টাকা-পয়সা, ইত্যাদি পেশ করা হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মাজার কেন্দ্রীক এ জাতীয় আচরণ মূর্তি পূজার ন্যায় মাজার পূজার শামিল এবং শির্‌ক।

সিজদা হচ্ছে কারো কাছে আত্নসমার্পণের প্রতীক এবং ইবাদতের চুরান্ত বহিঃপ্রকাশ। কাউকে মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদানের সর্বোচ্চ নিদর্শণ হচ্ছে সিজদা। সেক্ষেত্রে মর্য়াদার দাবীতে সিজদা পাওয়ার হকদার একমাত্র আল্লাহ্‌পাক। সিজদার মাধ্যমে এ সম্মান অন্যকারো প্রাপ্য নয়। কাজেই আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যকারো উদ্দেশ্যে সিজদা করা বৈধ নহে। কবরকে সিজদা করা হলে কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শণ করা হয়। মাজারকে সামনে রেখে বা কবরমুখী হয়ে সালাত আদায় করা বা কবরেকে সিজদা করা সংশ্লিষ্ট পীর-আউলিয়ার উপাসনারই নামান্তর এবং এ জাতীয় আচরণ প্রকাশ্য শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত।

মাজারে মানত মানা, ভোগ দেওয়া, দান ক্ষয়রাত করা বা পশু উৎসর্গ করা ইত্যাদি মাজারকেন্দ্রিক আচরণের কোন বৈধতা নেই। এগুলি একপ্রকারের ইবাদত এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই তা সম্পাদন করতে হয়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"তুমি বলে দাও– আমার সালাত, আমার সকল ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছু সারাজাহানের রব আল্লাহ্‌র জন্য।"

আল-কোরআন, সুরা আনআম, আয়াত-১৬২

কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ্‌পাক বলেন,

"সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কোরবানী কর।"

আল-কোরআন, সুরা কাওসার, আয়াত-২

সালাত হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। তাই এর গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করা হারাম বলে জানতে হবে। কোরবানীও একটি কম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নয়। মুশরিকরাতো মুর্তি পূজা করে এবং মূর্তির নামেই পশু উৎসর্গ করে। আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং কলুষমুক্ত অন্তর নিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র উপাসনায় নিমগ্ন থাকতে মুসলমানদেরকে হুকুম করেছেন। কাজেই পশু জবাই সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্র নামে হওয়া অত্যাবশ্যক। আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যকারো নামে পশু উৎসর্গ করা হলে আল্লাহ্র মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়। মানুষ যখন পীর-আউলিয়াদের ক্ষমতাশীল মনে করে তাদের কাছে কল্যাণ কামনা করে এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের নামে পশু উৎসর্গ করে, তখন সেটা তাদেরকে প্রতিপালকের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। আর এধরনের আচরণ প্রকারান্তে তাদের ইবাদতের শামিল এবং নিঃসন্দেহে তা প্রকাশ্য শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকারো নামে পশু উৎসর্গ করা একটি অপবিত্র এবং শয়তানী কর্ম। শয়তান সর্বদাই গায়রুল্লাহর নামে পশু জবাই করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে এই মুশরিকী আকিদা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যে জন্তু জবাই করার সময় আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়নি, তা ভক্ষণ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্পাক বলেন,

"যবাইর সময় যার উপর আল্লাহ্ তা'আলার নাম নেয়া হয়নি, তা তোমরা ভক্ষণ করো না, কেননা এটা গর্হিত বস্তু; শয়তানের কাজই হচ্ছে তার সঙ্গী সাথীদের প্ররোচনা দেয়া, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়, যদি তোমরা তাদের আকিদা বিশ্বাস ও কাজকর্মে আনুগত্য কর, তবে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।"

আল-কোরআন, সুরা আনআম, আয়াত-১২১

প্রিয় পাঠক! কোরআন ও হাদিসের উপর আস্থা রাখুন এবং মাজার কেন্দ্রিক সকল বিভ্রান্তি পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র আল্লাহ্কেই ডাকুন। তাঁর রহমতের উপর আস্থা হারাবেন না। আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুণ!

০ সন্তান-সন্ততির উপাসনা: সন্তান-সন্ততি মানুষের অতি আদরের ধন। সন্তানের উপর তাদের দায়িত্বও অনেক। তাদেরকে মানুষ করা, ভরণ-পোষণ করা, শিক্ষা দান করা ইত্যাদির সাথে আর একটি গুরু দায়িত্ব রয়েছে, সেটি হল ধর্মীয় জ্ঞান দান করা। সকলের মনে এ প্রশ্নটি জাগা স্বাভাবিক যে, সন্তান-সন্ততির উপাসনা কি অবাস্তব নয়? তবে বিষয়টি যে মোটেই অবাস্তব অথবা অস্বাভাবিক নয় তা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে। প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ সন্তান-সন্ততিদের মহব্বত করে থাকেন; সেটা দোষনীয় নয়, কিন্তু সন্তানের প্রতি এমন বিশেষ ভালোবাসা প্রদর্শন করা বিপজ্জনক যে ধরনের ভালোবাসা আল্লাহ্র প্রাপ্য। সন্তানের ভালোবাসায় পিতা যখন অন্ধ হয়ে যান, তখন সীমালঙ্ঘনের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। অর্থাৎ সন্তানকে ভালোবাসতে গিয়ে বা সন্তানকে খুশী করতে গিয়ে আল্লাহ্র নাফরমানী করা হলে সীমালঙ্ঘনের অপরাধ হয়। যখন আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা সন্তানের প্রতি ভালোবাসার কাছে হীনমূল্যায়িত হয়, তখন সেটা সন্তান-সন্ততির উপাসনা বৈ কি! কাজেই যে লোক সন্তানকে খুশী করতে গিয়ে আল্লাহ্র ভালোবাসাকে জলাঞ্জলি দিল অর্থাৎ আল্লাহ্র নাফরমানী করল, সে তো প্রকারান্তে সন্তানেরই উপাসনা করল।

সন্তান-সন্ততি মানুষের সবচেয়ে কাছের মানুষ। কিন্তু কখনো কখনো তারা পিতামাতার দুশমনও হয়ে যেতে পারে। যেমন আল্লাহ্পাক বলেন,

"হে মুমিনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন, অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।"

আল-কোরআন, সুরা তাগাবুন, আয়াত-১৪

সন্তান-সন্ততি নিজেদের ইহলৌকিক উপকারের জন্য এমন কিছু আদেশ করতে পারে যাতে পিতামাতার পারলৌকিক অনিষ্ট নিহিত রয়েছে। সন্তানের সুখ-স্বাছন্দ এবং স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে তাদের এ অন্যায় আবদার পূরণ করতে পিতামাতাকে অনেক সময় সত্য ও ন্যায়ের বিপক্ষে অবস্থান নিতে হতে পারে। এ অবস্থায় তাদের দ্বীন থেকে পদস্খলন ঘটে যেতে পারে এবং তা তাদের জন্য বয়ে আনতে পারে পরকালীন শাস্তি। অতএব যাদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তারা তো দুশমনই বটে! একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান-সন্ততিদের দিক থেকে উক্তরূপ আদেশ পালনে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে সন্তান-সন্ততি মানুষের জন্য পরীক্ষা সরূপ। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

"তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার "

আল-কোরআন, সুরা তাগাবুন, আয়াত-১৫।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন– এগুলি পেয়ে কে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁর আনুগত্য করে আর কে এগুলির মহব্বতে পড়ে আল্লাহ্র স্মরণে উদাসীন হয়ে পড়ে কিংবা তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়।

সন্তানকে নিয়ন্ত্রন রাখা পিতামাতারই প্রথম দায়িত্ব। তাদের সেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেয়া হলে সে দায়িত্বে অবহেলা করা হয়। স্নেহাস্পদ সন্তানের মহব্বতেই অধিকাংশ সময় মানুষ গুণাহে- বিশেষতঃ অবৈধ উপার্জনে লিপ্ত হয়। হালাল উপার্জনের পাশাপাশি কিংবা পুরোপুরিভাবেই সে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বা হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আবার সন্তানের ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে অনেক সময় তাদের অন্যায় আবদারগুলোকে স্বচ্ছন্দে মেনে নেয়া হয়– ফলে তাদের অপরাধের মাত্রা আরও বাড়তে থাকে। এভাবে সরাবী, যেনাকার, সন্ত্রাসী বা জুয়ারী এবং অন্যন্য অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সন্তানকে শাসন করার বদলে যদি প্রশ্রয় দেয়া হয় তাহলে সেটা সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক ভালোবাসার প্রকাশ নয় বরং তা ভালোবাসার সীমালঙ্ঘন এবং এভাবে আল্লাহ্র নেয়া সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তর্ণ হওয়া যায়না। এমতাবস্থায় বিগড়ে যাওয়া সন্তানকে হয় বুঝিয়ে-সুজিয়ে পথে আনতে হবে নয় তো নিজে শাসন করে তাদেরকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে, আর তা নাহলে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে- এটাই সত্যিকারের ভালোবাসার পরিচয় এবং এটাই হবে উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক। অন্যথায় সন্তান এবং পিতামাতা উভয়ের পরকালই ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

আমাদের সমাজে অনেকের মুখে এ ধরনের কথা শোনা যায় যে, সন্তানের ভবিষ্যৎ সুখের জন্যই তো উপার্জন করছি। আর এর বাস্তব প্রতিফলনও এদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু তারা একটি বারের জন্যও

ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করে না যে, তার উপার্জনটা হক পথে হচ্ছে না অবৈধ পথ থেকে আসছে। এভাবেই ন্যায়-অন্যায় বাছ-বিচার না করে তারা অর্থোপার্জনের পিছনে রেসের ঘোড়ার মত দৌড়াতে থাকে। হালাল উপার্জনের পাশাপাশি হারাম পন্থায় অথবা স্রেফ হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জনে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, ধোঁকাবাজী সহ এমন কোন অপকর্ম নেই যা তার দ্বারা সম্ভব হয় না। আবার খরচ করার বেলাও তারা কার্পণ্য করে। এমনকি ফরয হজ্জ ও যাকাতের মত ইবাদত সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইবদিতগুলি থেকে সে গাফেল থাকে। সেটা তখন আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কারণ হয়ে তার জন্য আখিরাতের শাস্তি বয়ে আনে। এটাতো নিজের আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে পরকালের শাস্তির বিণিময়ে সন্তানের ইহকালীন সুখ খরিদ করা হলো। কিন্তু সেটাতো নিতান্তই বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। সন্তানের ভালোবাসার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে আল্লাহ্‌পাকের অবাধ্য হওয়া এবং তার অসন্তুষ্টি ক্রয় করা মোটেই কারো জন্য সমীচীন নহে। সন্তান-সন্ততির প্রতি ভালোবাসা স্বাভাবিক মাত্রার মধেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এমন যেন না হয় যে, তাদের ভালোবাসা আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয় অথবা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কারণ হয়ে যায়– সেটা হবে সমূহ ক্ষতির কারণ। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে মানুষকে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌পাক বলেন,

“হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পর্দ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন না করে– যারা উদাসীন হবে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”

আল-কোরআন, সুরা মুনাফিকুন, আয়াত-৯।

এখানে বলা হয়েছে যে, মানুষ যেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রেমে পড়ে আল্লাহ্‌কে ভুলে না যায়। সন্তানদের প্রয়োজন ও আবদার পূর্ণ করতে গিয়ে তারা যেন কোন ভাবেই দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি উদাসীন না থাকে। তবে অনেকেই ছেলে-মেয়ে এবং সম্পদের প্রেমে অন্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ খুব কমই করে, এমনকি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে বসে। এভাবে তাদের প্রেমে পড়ে আহকামে ইলাহীকে হীনমূল্যায়িত করে পৃষ্ঠের পিছনে ফেলে দেয়। এটাই সন্তান-সন্ততির উপাসনা এবং সেই আল্লাহ্‌ বিমুখতাই পরিনামে আখিরাতে তার শাস্তির কারণ হয়ে থাকে।

০ ব্যক্তির উপাসনাঃ ব্যক্তির উপাসনা বলতে বুঝায় এমন সব আচরণ যা কোন ব্যক্তিকে অতিমাত্রায় সম্মান প্রদর্শণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা’য়ালার সমপর্যায়ে উন্নীত করে ফেলে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি হতে পারে বাবা-মা কিংবা প্রিয় নেতা, প্রিয় লেখক, প্রিয় নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা বা প্রিয় খেলোয়ার অথবা অন্য কেউ। ব্যক্তির উপাসনা হয় ব্যক্তির প্রতি অত্যাধিক প্রেম-ভালবাসা বা অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে কিংবা তা’যীম করে এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় ব্যক্তির নিঃশর্ত আনুগত্যে করার মাধ্যমে। আল্লাহ্‌ তা’য়ালা ও রাসূলের আনুগত্যের উপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া অথবা আল্লাহ্‌ তা’য়ালা ও রাসূলের চেয়ে তৃতীয় কাউকে প্রিয় মনে করা ও অধিক ভালবাসা জ্ঞাপন করা হলে এ প্রকারের শির্‌ক সংঘটিত হয়। ব্যক্তির প্রতি ধ্যান-ধারণা ও আচরণের ভিত্তিতে যেভাবে শির্‌ক সংঘটিত হয়ে থাকে তার কিছু বাস্তব দিক তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হল:

ক. পিতা-মাতাঃ পিতা-মাতার আনুগত্য করা ফরয; কিন্তু তা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় পিতা-মাতার আনুগত্য করা জায়েয নয়। কিন্তু কেউ যদি তাদের প্রতি ভালবাসা ও ভয়ের কারণে আল্লাহ্‌ তা’য়ালার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে, তবে তা ভালবাসা ও ভয়ের ক্ষেত্রে শির্‌কের

পর্যায়ে পৌঁছে যাবার আশংকা রয়েছে। এর বাস্তবতা উপলব্ধি করা যায় তখন, যখন কোন পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার জন্য রোজাব্রত পালন করা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেন অথবা এভাবে অন্যান্য ইবাদতে বাধা প্রদান করেন এবং সন্তানও তা নির্দিধায় মেনে নেয়– এটা সন্তানের পক্ষ থেকে পিতা-মাতার উপাসনার শামিল এবং শির্কও বটে।

আবার মৃত পিতা-মাতার ছবি টানিয়ে যদি ফুলের মালা দিয়ে সম্মানিত করা হয় অথবা কোন প্রকার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয় তবে সেটা মূর্তিপূজার শামিল।

খ. আদর্শ মতবাদের প্রবক্তা কিংবা নেতা: ইসলাম একটি পূণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হওয়ার কারণে শাসন-প্রশাসনের ক্ষেত্রেও কোরআন ও সুন্নাহ অনুসারে আইন প্রনয়ণ ও তার বাস্তবায়ন থাকা আবশ্যক। শর'ই বিরোধী আইন প্রণয়ণ করা এবং তা অনুসরণ করা উভয়টিই দোষণীয়। কেননা আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র আইন বলবৎ থাকাটাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ মানুষকে আদেশ দিয়েছেন শরীয়তের আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য। যারা দেশপরিচালনার জন্য আল্লাহ্ দেয়া বিধানের অনুসরণ করে না বা এ বিধানের বিরোধী আইন তৈরী করে তা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয় তাদের জন্য রয়েছে অশনি সংকেত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলছেন,

"তারা কি আল্লাহ্‌র দ্বীনি ব্যবস্থার বদলে অন্য কোন বিধানের সন্ধান করছে? অথচ আসমান যমীনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহ্ তা'আলার সামনে আত্মসমার্পণ করে আছে এবং প্রত্যেককে তো তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।"

আল-কোরআন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত-৮৩

কোন মানব রচিত মতাদর্শের প্রবক্তা বা নেতার নিঃশর্ত অনুসরণ করা করা হলে শির্ক সংঘটিত হতে পারে। যদি কেউ আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কোন বিষয়ের উপর এর সাথে সাংঘর্ষিক বা এর বিরোধী কোন আদর্শ, নীতি, ধ্যান-ধারণা কিংবা কারো মতামতকে প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে সে আনুগত্যের উপাসনায় ঐ ব্যক্তি বা নেতাকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে নিল। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

"আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেণ তখন কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সে বিষয়ে কোন ইখতিয়ার নেই যে তাতে রদবদল করবে; যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে, সে নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।"

আল কোরআন, সুরা আহযাব, আয়াত-৩৬

কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখছি যে মানুষ আল্লাহ্‌র বিধানের পরিবর্তে মানব তৈরী নিয়ম-নীতি, শাসন ব্যবস্থা বা ধ্যান-ধারণাকে উত্তম মনে করে স্বেচ্ছায় তা মেনে নিচ্ছে। কিন্তু এ জাতীয় আচরণ শর'য়ী দৃষ্টিতে প্রকাশ্য শির্কের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ যখন কাল মার্কস, মাও সেতুং কিংবা লেনিনের আদর্শ ও মতবাদকে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া বিধানের চাইতে উত্তম মনে করে সেই আদর্শ রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়নে লেগে যায়– সেটা নিঃসন্দেহে শির্ক। অনুরূপভাবে যে কোন নেতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা নিবেদন করে বা ভয় করে তার আদর্শকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়াও শির্ক।

নেতাকে সর্বোচ্চ ভালবাসা ও সম্মান প্রদান করা, তাকে অস্বাভাবিক ভয় করে চলা এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় নেতার নিঃশর্ত আনুগত্য করা ইত্যাদি আচার-আচরণ শির্‌ক হিসেবে বিবেচিত রয়েছে।

প্রায়াত নেতার সম্মানে তার আদর্শকে আঁকড়ে ধরা, চাই তা যতই আল্লাহ্‌ বিরোধী নীতিই হোকনা কেন, এক প্রকারের শির্‌ক। নেতার কবরে বা মাজারে পুস্পার্ঘ্য দিয়ে সম্মান জানানো, নেতার তা'যীমের জন্য তার ছবি দেওয়ালে টানিয়ে শ্রদ্ধা জানানো ইত্যাদি আচরণ মূর্তি পূজার শামিল এবং শির্‌কও বটে!

বিশ্বের অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন কিছু ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হচ্ছেন যা স্পষ্টত আল্লাহ্‌ তা'আলা যা নাযিল করেছেন মৌলিকভাবে তার বিপরীত। যারা এসব বিভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের প্রচার প্রসারকারী তাদের কথা ও লেখা থেকে বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এরা আল্লাহ্‌র হেদায়েত ও শেষ বিচারের দিনে তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় চুড়ান্তভাবে সন্দেহগ্রস্থ।

আমাদের তরুণ সমাজকে ভাবতে হবে যে, তারা যে সব সাহিত্য-সংস্কৃতি, সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শচিন্তা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য ঐ সকল আদর্শের প্রবক্তা ও প্রচার প্রসারকারীদের প্রতি পরম ভালেবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি রেখে তাদেও আদেশ মাথা পেতে নিচ্ছেন, তারা কোন পথের যাত্রী? তারা কি জাহান্নামের পথে যাচ্ছে না? এভাবে নেতাদের অনুসরণ করার শেষ পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে,

"(কিয়ামতের দিন) অনুসৃতরা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, অনুসারীরা বলবেঃ যদি আমরা দুনিয়াতে ফিরে যেতে পারতাম তবে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রথ্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রুপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম। এভাবেই আল্লাহ্‌ তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করবার জন্য। অথচ তারা কস্মিনকালেও জাহান্নাম হতে উদ্ধার পাবে না।"

আল কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত-১৬৬-১৬৭

এ ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, মানুষ যাদেরকে তাদের নেতা মনে করে দুনিয়াতে অনুসরণ করছিল, কিয়ামতের দিন ঐ নেতারা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। অনুসারীরা শত অনুতাপ করে দুনিয়ায় ফিরে আসার বাসনা করলেও সেটা সফল হবে না। ফলে তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় নেতার অনুসরণের বিরুদ্ধে কোরআনের কত পরিষ্কার এবং দ্ব্যার্থহীন ঘোষণা! তবে আমাদের জন্যেও এটা ভাববার বিষয় যে, এদের কাছে কোরআনের এ বক্তব্য কি আদৌ পৌঁছেছে? কিংবা তারা কি কোরআন পড়ার চেষ্টা করেছে? অথবা আমরা কি তা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি? যদি পৌঁছে না থাকে তাহলে এ ব্যর্থতার দায় সকলের। আর যদি পৌঁছোবার পরেও কারো হুঁশ না হয় তবে সম্পূর্ণ দায়ভার তাকেই নিতে হবে। বস্তুতঃ সময় থাকতে যাদের হুঁশ না হয় তারা তো ক্ষতিগ্রস্থদের দলেই শামিল হবে। সুতরাং সময় থাকতে দুনিয়ায় অবস্থান কালেই সাবধান হতে হবে এবং যার যার আমলকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে যাতে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে নেতার অনুসরণ না করা হয় এবং নেতাকে অধিক ভালবাসা প্রদান না করা হয়।

গ. প্রিয় তারকা বা প্রিয় ব্যক্তিত্বঃ এ প্রকারের শির্কের প্রচলন পরিলক্ষিত হয় বিশেষ করে তরুণ সমাজের মাঝে। আবেগের বশে তরুনরা তাদের প্রিয় ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এমন মাতামাতি করে যা একপর্যায়ে শির্কের রূপ নিতে পারে। প্রিয় নায়ক-নায়িকা, প্রিয় গায়ক-গায়িকা, প্রিয় খেলোয়ার বা প্রিয় লেখককে ঘিরে ভক্তদের আচরণে এ শির্কের উৎপত্তি হয়। ভক্তরা প্রিয় ব্যক্তিত্বকে সম্মান জানাতে বা ভালবাসা প্রদান করতে গিয়ে শর'য়ী সীমা লংঘন করে ফেলে যেখানে তাদের ভালবাসা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিত্বের উপাসনায় পর্যবশিত হয়ে যায়, যার খবরই কেউ রাখেনা। আজকের যুগে তাই টম ক্রুজ, শাহরূখ খান, সালমান খান, দেব, শচীন টেণ্ডুলকার, ডেভিব বেকহাম আর লিওনেল মেসির মত তারকারা তরুন-তরুনীদের উপসনার বস্তু। বাংলাদেশের শহুরে সমাজ তো বটেই, এমনকি গ্রামে-গঞ্জেও আজ ছড়িয়ে পড়েছে টেলিভিশন, স্যাটেলাইট আর ইন্টাননেট সহ বিনোদনের বহু মাধ্যম। এর ফলে তারকাদের ভক্তের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। প্রিয় তারকাকে ঘিরে ভক্তদের উৎসাহ উদ্দীপনার শেষ থাকে না। বিভিন্ন সিরিয়াল আর ভিডিও সিনেমা দেখতে গিয়ে তারা ভুলে যায় সালাত সহ অন্যান্য ইবাদতের কথা আর দ্বীনে ইলাহীকে ফেলে দেয় পৃষ্ঠের পেছনে। এ ছাড়াও ভক্তদের মাঝে দেখা যায় অন্য এক প্রকারের উন্মাদনা। ভক্তরা তাদের প্রিয় তারকার ছবি বা পোষ্টারে পোষ্টারে ভরে ফেলে রুমের দেওয়াল, এমনকি টয়লেটে পর্যন্ত হিন্দী সিনেমা ও সিরিয়ালের নায়ক-নায়িকা, ক্রিকেট বা ফুটবল তারকা কিংবা ব্যাণ্ড সংগীতের শিল্পীর পোষ্টার। অনেকেই আবার মোবাইল ফোনের ওয়ালপেপার আর কম্পুটারের মনিটারে ধরে রাখে প্রিয় তারকার ছবি– এ যেন মূর্তি পূজার এক নতুন রূপ। এ সমস্ত তারকাদের লাইভ অনুষ্ঠানে থাকে ভক্তদের উপচেপরা ভীর আর অটোগ্রাফ নেওয়ার দীর্ঘ লাইন। শুধু তাই নয় সরাসরি সাক্ষাত হলে মনে হয় ভক্তরা তাদের জীবনের সবকিছু এদের জন্য উজার করে বিলিয়ে দিতেও পিছ পা হবে না। এটা কিসের আলামত? এর চেয়ে অধিক ব্যক্তির উপাসনা আর কি হতে পারে? প্রিয় তারকাকে দেখলে তরুন-তরুনীর চেহারায় যে আনন্দ, বিস্ময়, উচ্ছাস, আবেগ ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখা যায়, সে ধরনের অনুভুতি এক আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণে ব্যতীত আর কারো উদ্দেশ্যে হবার কথা নয়। তাই এ জাতীয় সকল আচরণ শির্ক।

০ ধন-সম্পদের উপাসনাঃ ধন-সম্পদ মানুষের জীবন ধারনের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। এর উপকারীতার দিকটা যেমন জানা আছে তেমনি এর ক্ষতির দিকটাও একবার খতিয়ে দেখা দরকার। পৃথিবীতে অধিকাংশ অঘটনের মূলে রয়েছে সম্পদ তথা প্রতিপত্তির মোহ। সম্পদের মোহ মানুষকে অনেক সময় অমানুষ করে তোলে। সম্পদ হাসিলের জন্য তখন সে হন্যে হয়ে ওঠে এবং এহেন অপকর্ম নেই যা সে করতে পারে না। সম্পদের মোহে সে এমনই অন্ধ হয়ে যায় যে, তখন সে আর স্রষ্ঠার নাফরমানী করতে একটুও দ্বিধা করে না।

সম্পদের প্রতি মানুষের স্বভাবতঃই কিছু না কিছু আকর্ষণ থাকে। কিন্তু এর প্রতি যখন মাত্রতিরিক্ত আকর্ষণ জন্মে তখন সেটাকে বলে মোহ বা লালসা। কিন্তু সম্পদের প্রতি লালসা থাকাটা দোষণীয় এবং এর কারণে সমাজে নানা রকম অনাসৃষ্টির উদ্ভব হয়। ধন-সম্পদ এর মোহ মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে বিপথগামী করে ফেলতে পারে। দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ যতক্ষণ মানুষের অন্তরে প্রাধান্য বিস্তার না করে, ততক্ষণ তা মানুষের ইহকাল ও পরকালের জন্য উপকারী ও সহায়ক। পক্ষান্তরে অর্থ-সম্পদ যদি মানুষের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবেই তার অন্তরের মৃত্যু ঘটে এবং তখন মানুষ এগুলির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে স্রষ্টাকে ভুলে যায়। তখন শয়তান তার দোসর হয়ে যায় এবং ধন-সম্পদকে তার দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেয়। সে মনে করে একমাত্র অর্থ-সম্পদই তাকে সুখ দিতে পারে এবং সকল আরাম-

আয়েসের ব্যবস্থা করতে পারে। টাকা-কড়ির জন্য অত্যধিক ভালবাসা বা আসক্তি প্রকারান্তে ধন-সম্পদের উপাসনা বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই মানুষ অর্থ-সম্পদের পূজারী হয়ে যায়। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদকেই সে তখন তার ইলাহ্ বানিয়ে নেয়। কেননা বান্দা ও আল্লাহর মাঝে যদি অন্যকিছুর ভালবাসা স্থান পায় তাহলে সে বস্তুর ইবাদতই করা হয়। এভাবে অর্থ-সম্পদ (Money) একজন ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারে। সম্পদের ভালবাসায় মত্ত হয়ে মানুষ যখন অর্থ উপার্যন এবং তা ব্যায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধকে অমান্য করে ফেলে তখন সেটা বস্তুতঃ আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং ভালবাসার ইবাদতে সম্পদ তখন আল্লাহ্র একজন প্রতিদ্বন্দী দাঁড় হয়ে শির্কের মত কঠিন অপরাধ সংঘটিত করে। সম্পদের নেশায় মানুষ যখন বিভোর থাকে, সম্পদ অর্জনই তখন তার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে যায়। সম্পদ অর্জনের জন্য তাই সে দিশেহারা হয়ে যায় এবং হারাম-হালাল তথা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন অবৈধ পন্থা বা আল্লাহ্ ঘোষিত নিষিদ্ধ পন্থার আশ্রয় নেয়। যেমন সুদ, ঘুষ, প্রতারনা, যুলুম, সন্ত্রাস ইত্যাদি সহ অন্যান্য অপরাধ মূলক কাজকে অর্থোপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে নেয়। এভাবে মানুষ ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আরোপিত সীমা অতিক্রম করে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে পাপে লিপ্ত হচ্ছে। কম-বেশী সমাজের অধিকাংশ পেশার মানুষের মাঝে এর সংশ্লিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরনস্বরূপ, একজন শিক্ষক, আইনজীবি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিচারক, চাকুরিজীবি, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, ঠিকাদার, শ্রমজীবি প্রভৃতি সহ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ কম-বেশী কোন না কোন ভাবে এ পাপের সাথে জড়িত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, নাহক পন্থায় অর্জিত অর্থ কোন ভাবেই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, উপরন্তু তা শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে একটি হাদিস প্রনিধানযোগ্য। আলী ইবনে হুজর (রাঃ) বর্ননা করেছেন, নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি সম্পদ নিষিদ্ধ পন্থায় উপার্জন করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ভক্ষণ করে কিন্তু তৃপ্তি লাভ করে না; বরং রোজ কিয়ামতে এই সম্পদ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।"

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ-২২৯২।

সুতরাং সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে ন্যায়, সততা ও আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত নির্ধারিত সীমা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। সেই সাথে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ হক ও অধিকারের সীমা অতিক্রম না করার প্রতি যত্নশীল থাকা আবশ্যক। প্রত্যেককেই গভীরভাবে চিন্তা করা নেয়া উচিত যে তার উপার্জনের সকল উৎস যুলুম অথবা অপবিত্রতা বর্জিত কিনা। যদি কোন প্রকার না-হক পন্থার সাথে কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা থাকে, তবে সেটা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।

মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই। তবে একজন প্রকৃত ঈমানদার বা আল্লাহ ভীরু ব্যক্তি অল্পতেই সন্তষ্ট থাকতে পারেন। কেননা অতিরিক্ত সম্পদের বোঝা যে কতটা ভারী এবং এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ হতে পারে, তা তিনি প্রতিটি মূহুর্তেই স্মরণে রাখেন। এ সম্পর্কে একটি হাদিস আছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে তিনি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

"আদম সন্তানের কারও দু'টি ময়দান ভরা ধন-সম্পদ মজুদ থাকলেও সে তৃতীয় ময়দান ভরার অভিলাষী হবে। একমাত্র মাটিই আদম সন্তানের পেট ভরাতে পারে। অবশ্য তওবাকারীর তওবা আল্লাহ্ কবুল করে থাকেন।"

হাদিস, সহীহ্ বোখারী শরিফ- নং ২৪৩০; মোসলেম শরীফ- নং ২২৮৭

কিন্তু মানুষ একদিকে যেমন অর্থ উপার্জনের পিছনে ছুটতে থাকে হন্যে হয়ে তেমনি টাকা-পয়সা খরচের বেলায়ও কার্পণ্য করে। তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে টাকা খরচ করে না। যাকাতের মত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকনকেও তারা অস্বীকার করে অথবা আদায় করতে দ্বিধা বোধ করে। এ ছাড়াও পালনকর্তার নির্দেশিত এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিধানগুলিও তারা মান্য করে না; যেমন দান-খয়রাত করা, আত্মীয়ের হক তথা ইয়াতীম-মিসকিনের হক পালন করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজে এরূপ একটি চিত্র পরিলক্ষিত হয় যে, কিছু বিত্তশালী লোক অর্থ পুঞ্জীভূত করে আর যাকাত আদায়ের দায় থেকে রেহাই পাবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা বা ইমারত তৈরী করতে থাকেন কিন্তু নিঃস্ব, গরীব তথা আত্মীয়- স্বজনের হকের কথা বেমালুম ভুলে যান। ধন-সম্পদের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ এবং ভালোবাসার কারণেই এমনটি হতে পারে। এভাবে ধন-সম্পদের ভালোবাসার কাছে আল্লাহ্‌র ভালোবাসাকে জলাঞ্জলি দেয়া হয় আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় সম্পদ খরচ না করে তাঁর নাফরমানী করার মাধ্যমে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন অর্জিত সম্পদ থেকে সাদকা করতে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেন,

"আমি তোমাদের যা কিছু অর্থসম্পদ দিয়েছি তা থেকে তোমরা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই।"

আল-কোরআন, সুরা মুনাফিকুন, আয়াত-১০

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় বলতে তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যাবহৃত ব্যয় খাতকে বোঝান হয়েছে। এর মধ্যে ফরয ব্যায়খাত হচ্ছে যাকাত এবং অন্যন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়খাতের মধ্যে রয়েছে আত্মীয়-স্বজন হক আদায় করা তথা ফকির-মিসকীদের দান-সাদকা করা। আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ খরচ না করে তা কুক্ষিগত করে রাখা নিজেকে ধ্বংসে মুখে ঠেলে দেওয়ার শামিল। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেন,

"আল্লাহ্‌র পথে অর্থসম্পদ ব্যয় করো, অর্থসম্পদ আঁকড়ে ধরে নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না এবং হিতসাধন করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লহ্ তা'আলা অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।

আল-কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত-১৯৫

অর্থসম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার জোর তাগীদ থাকা সত্বেও মানুষ এ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন রয়েছে এবং কোনভাবেই দ্বীনের কাজে এবং ফরয ও নফল দান-সাদকা আদায় করা থেকে বিরত থাকছে। কিন্তু এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ এ কথা উল্লিখিত আয়াতদৃষ্টে অতি সহজেই অনুমেয়। তবুও মানষের বোধোদয় হয়না। মানুষ ভাবে একমাত্র সঞ্চিত অর্থই তার সকল সাফল্যের কারণ হবে। অর্থই সকল সুখের মূল ভেবে সে টাকা-কড়িকেই ইলাহ রূপে গণ্য করে। এভাবে মানুষ মূল্যবোধের চরম নিম্নস্তরে পৌঁছে যায় যা তার নিজের জন্য ধ্বংসাত্নক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। সম্পদের দাসদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র লা'নত। এ সম্পর্কে সহীহ্ তিরমিযী শরীফে আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"দিনার ও দিরহামের (মুদ্রার) দাসরা (উপাসনাকারী) লা'নতপ্রাপ্ত"।

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ২৩১৬

০ প্রবৃত্তির উপাসনাঃ মানুষের ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে প্রবৃত্তির একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মানুষ যখন প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হয় তখন সে হয়ে যায় প্রবৃত্তির দাস। এ অবস্থায় মন যা চায় তাই সে ভাল মনে করে এবং সেটাই হয় তার দ্বীন, সেটাই হয় তার মাযহাব। আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করে নিজের খেয়াল-খুশী মত ইবাদত করা এবং সেমতে জীবন পরিচালনা করাই প্রবৃত্তির অনুসরন এবং সেটা প্রকারান্তে নিজ প্রবৃত্তির উপাসনার শামিল। এভাবে প্রবৃত্তি মানুষের ইলাহে (উপাস্য) পরিণত হতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন,

"তুমি কি দেখনা তাকে যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে?"

আল-কোরআন, সুরা ফুরকান, আয়াত-৪৩; সুরা জাসিয়াহ, আয়াত-২৩।

এ আয়াতে এসব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা প্রবৃত্তি অর্থাৎ লোভ-লালসা বা কামনা-বাসনাকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সে মতে জীবন পরিচালনা করে, তাদের সকলকেই প্রবৃত্তির দাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তারা মন চাইলে সেটা করে আবার মন না চাইলে সেটা প্রত্যখ্যান করে। এ ধরনের কাজ যারা করে তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে নিজেদের প্রবৃত্তিকেই নিজের মা'বুদ বানিয়ে নিয়ে থাকবেন। যারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, সে প্রবৃত্তির উপাসনার কথা মুখে না বললেও বা প্রবৃত্তির উপাসনার কথা অস্বীকার করলেও তার কার্য-কলাপে প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তিই তার উপাস্য হয়ে যায়। মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে মূর্তি পূজা, সূর্য পূজা, পাথর পূজা, গাছ পূজা সহ নানাবিধ সৃষ্ট বস্তুর পূজায় রত রয়েছে নির্বিকারে। মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই সালাত, সিয়াম, হজ্জ এবং যাকাত সহ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলি থেকে উদাসীন রয়েছে প্রবৃত্তিরই প্রভাবে। আবার প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ হালাল-হারামের বিধান তথা ন্যায় অন্যায় ভুলে গিয়ে অবৈধ ভাবে সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা হাসিলের প্রচেষ্টার নিজেকে রত রেখেছে সারাক্ষণ। সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে মানুষ জাঁক-জমক আর ঐশ্বর্যের নেশায় বিভোর রয়েছে সারাক্ষণ। তারা বেমালুম ভুলে গেছে মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা। এগুলি সব প্রবৃত্তির উপাসনা বৈ কিছু নয়।

মানুষের মধ্যে দু'টি বিপরীতধর্মী প্রবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। একটি আল্লাহ্‌-মুখী ভাল প্রবৃত্তি, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি না; আর অন্যটি হচ্ছে কু-প্রবৃত্তি বা শয়তানী প্রবৃত্তি, যেটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছি। কু-প্রবৃত্তির অনুপ্রেরণা যোগায় শয়তান। লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, মোহ ইত্যাদির জন্ম দেয় কু-প্রবৃত্তি। এগুলি মানুষকে আল্লাহর কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেয়। মানুষ যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থাকে, শয়তান তখন তার দোসর হয় এবং কুমন্ত্রণা দেয়। তার কাছে তখন সকল অবৈধ বা অপরাধমূলক কাজ বৈধ মনে হয় এবং সকল ভাল কাজ থেকে সে বিমুখ হয়ে পড়ে এবং সীমালঙ্ঘন করে পাপের পঙ্কিল সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। প্রবৃত্তির অনুসরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ মানুষকে সাবধান করেছেন এভাবে,

"যে সীমালঙ্ঘন করে এবং দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দেয়, অবশ্যই জাহান্নাম হবে তার আবাসস্থল। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হবার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা।"

আল-কোরআন, সুরা নাযিয়াত, আয়াত-৩৭-৪১।

মানুষের ইচ্ছাশক্তি যখন আসক্তিতে পরিণত হয় তখন সেটা হয় অপশক্তির আরাধনা। তখন মানুষ আল্লাহর আদেশ নিষেধের তোয়াক্কা করে না এবং মন যা চায় তাই করে। অর্থাৎ কামনা-বাসনাই তখন তার ইলাহ রূপে ধরা দেয়। এ ভাবেই মানুষ সৎ পথ ছেড়ে অসৎ পথে পা বাড়ায় এবং বহুবিধ অন্যায় বা

অপকর্মের সাথে জড়িয়ে যায়। প্রবৃত্তির অনুসরণ করে মানুষ দ্বীন থেকে বহু দূরে ছিটকে পরতে পারে। কিন্তু নাহক তথা শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর সমর্থনে নিম্নোক্ত কোরআনের আয়াতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। আল্লাহ্ বলেন,

"আল্লাহর ইবাদত করার জন্য ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দিতে আমিতো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি"

আল-কোরআন, সুরা নাহল, আয়াত-৩৬।

তাগুত হচ্ছে এমন অপশক্তি (শয়তান, প্রবৃত্তি বা অন্যান্য বিভ্রান্তিকর উপায়-উপকরণ) যাকে আল্লাহর সাথে বা আল্লাহর পরিবর্তে উপাসনা করা হয়। যে আনুগত্য কেবলমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য, সেখানে সৃষ্টসত্তা বা সৃষ্টবস্তুর আনুগত্য করা বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হলে তা বস্তুতঃ তাগুতের উপাসনা করার শামিল।

ফরজ ও ওয়াজিব ইবাদতগুলি সর্বাবস্থায় সঠিকভাবে পালন করার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এ ইবাদতগুলি থেকে ইচ্ছাকৃত বা অলসতার কারণে গাফেল থাকলে বা অহংকারবশে পরিত্যাগ করা হলে তা শয়তানের প্ররোচনায় নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ বই কিছু নয়। যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করলো সে তো আল্লাহ্রই ইবাদত করলো; আর যে ব্যক্তি মন চাইলে নামায পড়লো আর মন না চাইলে নামায পড়লো না, সে তো তার মনের পূজা করলো অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে সে তার মা'বুদ বানিয়ে নিল। এইভাবে যাকাত না দেয়া, হজ্জ না করা, রমযানের রোজা না রাখা ইত্যাদি সহ অন্যন্য ইবাদত এবং দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আনুগত্য না করে নিজের ইচ্ছাধীন জীবন পরিচালনা করা নিশ্চিত নিজ প্রবৃত্তির উপাসনার শামিল। এভাবে শয়তানের বিছান জালে আটকা পড়ে সে কু-প্রবৃত্তির মোহে অন্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য অপরাধের সাথেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। তখন ন্যায় তথা হক তার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। এক কথায় সে প্রবৃত্তির দাস হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন একটি অন্যায় করে, সেটি তখন তাকে আর একটি অন্যায় করতে উদ্বুদ্ধ করে। পর্যায়ক্রমে মানুষ অন্যায়ের জালে জড়িয়ে যায় এবং সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডই তার কাছে তখন বৈধ মনে হয়। এভাবে শয়তানের দেখানো পথ চলতে চলতে সে সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী কে পছন্দ করেন না এবং তার জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। এর সত্যতা প্রমাণিত হয় হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিরমিযী শরীফের একটি সহীহ হাদিসে মাধ্যমে। তিনি বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"দোযখ (জাহান্নাম) কু-প্রবৃত্তি ও লালসা দ্বারা পরিবেষ্টিত"

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ২৪৯৮

অর্থাৎ কু-প্রবৃত্তি ও লালসার অনুসরণকারীরা জাহান্নামের অধিবাসী হবে। অতএব জাহান্নামের অগ্নি থেকে রেহাই পেতে প্রবৃত্তির উপাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে, সেটা আরাধনার ক্ষেত্রে হোক অথবা জীবনের অন্যান্য দিকই হোক। খাঁটি ঈমানে এক আল্লাহ্র উপাসনায় রত থাকা চাই। শয়তানের দেখানো সকল অবৈধ পন্থা পরিহার করে সীমালঙ্ঘণের অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সকলকেই সচেষ্ট থাকতে হবে।

ইবাদতের মাধ্যম ও প্রকারঃ

আল্লাহ্‌র উপর ঈমান থাকা সত্বেও মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত অধিকাংশ শির্‌ক ইবাদতের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই সকলেরই ইবাদতের প্রকার, আচরণ পদ্ধতি এবং এর প্রত্যেকটির সাথে শির্‌কের সম্পর্ক জানা থাকা আবশ্যক। মুসলিমদের ধর্মীয় রীতিতে অনেকগুলি বৈধ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ইবাদত রয়েছে। সকল ইবাদত খাঁটি দিলে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায় করতে হবে। পবিত্র কোরআনে আছে,

"তুমি বল, অবশ্যই আমার সালাত, আমার ইবাদত (হজ্জ, কোরবানী), আমার জীবন, আমার মৃত্যু, সবকিছুই জগৎ সমুহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উদ্দ্যেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই। "

আল কোরআন, সুরা আন'আম, আয়াত- ১৬২-১৬৩।

আল্লাহ যেমন মানুষকে ইবাদত কবার জন্য নির্দেশ দান করেছেন তেমনি বিভিন্ন মাধ্যমে ইবাদতের পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে বর্ণিত ইবাদতগুলি তাঁর প্রিয় রাসূল কর্তৃক বাস্তব ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সকল মানুষের কোরআন এবং সহীহ্‌ হাদিসের অনুসরণ করে সেই অনুযায়ী সকল ইবাদত পরিচালনা করা উচিত। একজন ঈমানদার ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্য-কলাপ, চিন্তা-চেতনাই ইবাদতে পরিণত হতে পারে যখন সেটা একনিষ্ঠভাবে আন্তরিকতার সাথে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয়। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কথা, কাজ ও নিয়তে বিশুদ্ধতা, একনিষ্ঠতা এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ থাকলে তা ইবাদত হিসেবে বিবেচিত হয়। সকল প্রকার ইবাদত মূলত দু'টি মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। সে হিসেবে ইবাদতকে প্রধাণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

ক) বাহ্যিক বা শারীরিক বা আঙ্গিক ইবাদত

খ) অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক বা মানসিক ইবাদত

ক) বাহ্যিক ইবাদতঃ

বাহ্যিক ইবাদতগুলি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। বাহ্যিক ইবাদত হতে পারে আনুষ্ঠানিকভাবে বা অনানুষ্ঠানিকভাবে। বাহ্যিক ইবাদতগুলির মধ্যে সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত বা সদকা, কুরবানী ইত্যাদি বিশেষ উল্ল্যেখযোগ্য। প্রতিটি ইবাদতই একনিষ্টতার সাথে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হতে হয়। আল্লাহ্‌ ছাড়া তৃতীয় কোন সত্তাকে রাজি-খুশী করার জন্য ইবাদত করা হলে সেটা শির্‌ক।

সালাতঃ

সালাত একটি ফরয ইবাদত এবং ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। এটি মূলত অঙ্গ-প্রতঙ্গের ইবাদত। যদিও আত্মিক ব্যাপারটি এর সাথে জড়িত তবুও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সালাত পরিচালিত হয় বলে এটা বাহ্যিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। সালাতের অনেকগুলি রোকনের মধ্যে কিয়াম, রুকু ও সিজ্‌দা–এ তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোকন, যেগুলি একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই সম্পাদন করতে হয়। গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে এর কোনটিই সম্পাদন করার কোন ইখতিয়ার কারো নেই। এর মাধ্যমে যেভাবে শির্‌ক করা হয় তার কিছু বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা হল:

কিয়াম করা বা দাঁড়িয়ে বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে শির্ক: সালাতের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়াতে হয়। এ অবস্থানটি আল্লাহ্‌ভীতি ও তাঁর প্রতি আনুগত্যতার বহিঃপ্রকাশ। সেজন্য কোন মানুষ বা কোন বস্তুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিনয়ভাব প্রকাশ করা বা এমন কোন কর্ম করা যাবেনা, যা বাহ্যত তার উপাসনার শামিল হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন,

"তোমরা সালাতসমূহের ওপর যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের ব্যপারে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে দাঁড়াও।"

আল কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত- ২৩৮

যেহেতু দাঁড়িয়ে বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ আল্লাহ্‌র উপাসনা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নির্ধারিত, সেহেতু কোন পীর-মাশায়েখ, অলি, বুজুর্গ, ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক নেতা, ভাস্কর্য বা স্মৃতিসৌধ, কবর ইত্যাদির সম্মুখে বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা বৈধ নহে। এভাবে কোন বিদেহী আত্মার স্মরণে নীরবে দাঁড়িয়ে তার ইজ্জত করাও ঠিক নয়। কেননা তাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার শানে বিনয় প্রকাশের পদ্ধতিতে তাদের প্রতি বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশিত হয়, যা শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত।

রুকু ও সিজ্‌দার মাধ্যমে শির্‌ক: সালাতের মধ্যে 'রুকু ও সিজদা' অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দু'টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। এ অবস্থান দু'টির মাধ্যমে একজন সালাত আদায়কারী পরিপূর্ণভাবে নিজেকে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করে থাকে। রুকু ও সিজদা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের চুড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে তাঁর উদ্দেশ্যে রুকু ও সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে রুকু ও সিজদা কর এবং তোমাদের মালিকের যথাযথ ইবাদত কর।"

আল কোরআন, সুরা হাজ্জ, আয়াত- ৭৭

সুতরাং একজন ঈমানদার কর্তৃক সালাতের মাধ্যমে রুকু ও সিজদা করা আল্লাহ্‌র আজ্ঞানুবর্তিতা এবং আনুগত্যের চরম দৃষ্টান্ত। রুকু এবং সিজদা যখন আল্লাহ্‌র উপাসনার প্রতীক তখন কোন মানুষ বা অন্যকোন সত্তার প্রতি তা করা শির্‌ক। যেমন নবী, রাসূল, পীর, অলি, দরবেশ প্রমুখের সম্মানার্থে তাদের কবরে সিজদা করা শির্‌ক। অনুরূপভাবে কোন জীবিত ব্যক্তি যেমন পীর, অলি, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নেতা, মুরব্বী প্রমুখের সম্মানার্থে তাদের সামনে রুকু বা সিজদা করা শির্‌ক। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, কাউকে অভিবাদন করার জন্য মাথা নত করা বা বাবা-মা সহ অন্যান্য মুরুব্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কদম্বুসি করা যদিও শির্‌কের পর্যায়ভুক্ত নয়, তথাপি তা ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা অমুসলিম, বিশেষত হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা বর্জন করা অপরিহার্য।

হজ্জ:

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে হজ্জ। নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্ধারিত আচরণসমূহ পালনের মাধ্যমে হজ্জ সম্পাদিত হয়। পবিত্র কা'বা গৃহ ত্বাও'আফ এবং আরাফা-মোজদালিফায় অবস্থান– এ দু'টি বিশেষ আচরণ মূলতঃ হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন। আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্যতার জন্য রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসৃত পন্থায় হজ্জ সম্পাদন করাই শর্ত। এ জাতীয় উপাসনাদি আল্লাহ্‌র ভালবাসা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অন্যত্র কোথাও করার বৈধতা নেই।

আর অন্য কোনস্থানে বা অন্যসময়ে গণজমায়েত করে হজ্জের মর্যাদা প্রদান করা হলে সেটা তাঁর উপাসনা না হয়ে বিদ'আতি কর্ম হিসেবে গণ্য হবে। সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফ ব্যতীত অপরকোন গৃহ, মাযার, কবর কিংবা মন্দির ইত্যাদি ত্বাও'আফ বা প্রদক্ষিণ করা শির্ক। বরকত ও পূণ্য লাভের আশায় কা'বা গৃহ ও হযরে-আস্ওয়াদ ব্যতীত অন্যকোন গৃহ, মাযার, কবর, কবরের বেষ্টনী ও গিলাফ ইত্যাদি স্পর্শ ও চুম্বন করাও বৈধ নয়। ফায়দা হাসিলের জন্য কোন দূরবর্তী মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না।

সওম বা রোযাঃ

রোযা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশের এবং আল্লাহ্ ভীতি প্রদর্শনের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হলো রোযা। মূলত আত্মিক ইবাদত হলেও রোযার কিছু বাহ্যিক আচরণও রয়েছে, যেমন: সেহ্রী করা, ইফতার করা, দিবাভাগে পানাহার ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। রোযার নিয়্যাত থেকে শুরু করে সকল আচরণই তাকওয়ার ভিত্তিতে কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হয়। আল্লাহ্ ছাড়া গায়রুল্লাহ্র নামে সওমের ইবাদত অবৈধ এবং শির্ক। কোন দেবতা, মানব-দানব, গাউস, কুতুব কিংবা অন্যকোন সৃষ্ট সত্তার ভয়ে বা তাদের নিকট হতে ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে তাদের নামে সওম পালন করার কোন বিধান নেই এবং এধরনের আচরণ শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

কোরবানীঃ

কোরবানী একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন জন্তু উৎসর্গ করার মাধ্যমে এ আনুষ্ঠানিকতা পালিত হয়। যদিও বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে কোরবানী অনুষ্ঠিত হয়, তবুও এর মূল বিষয়টি সম্পূর্ণ আত্মিক। আল্লাহ্র মহত্ব প্রকাশের জন্য অন্তরে আল্লাহ্ভীতি নিয়ে এবং আল্লাহ্র নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করার মন মানসিকতা নিয়ে কোরবানী করতে হয়। কোরবানীর মূল উদ্দেশ্যটি হতে হয় আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টা করা। কিন্তু কোরবানীর অনুকরণে পশু জবেহ'র আড়ালে আমাদের সমাজে বেশ কিছু শির্ক প্রচলিত আছে; যেখানে আল্লাহ্র পরিবর্তে গায়রুল্লাহ্কে খুশী করার প্রবণতাটাই মূখ্য বলে প্রতীয়মান হয়। উদাহরণসরূপ: বিপদাপদ দূরীকরণার্থে বা ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে মাযারে মানত করা এবং মানত পূর্ণ করার জন্য মাযারবাসীর নামে পশু জবেহ করা অথবা কোন প্রতিমার সম্মুখে বা পূজার বেদীতে পশু জবেহ করা এবং মুশরিকদের ওরস বসার স্থানে জবেহ করা ইত্যাদি সকল আচরণ গায়রুল্লাহ্র ইবাদত হিসেবে বিবেচিত এবং তা শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

দান-সাদকাঃ

দান ও সাদকা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের ক্ষেত্রে একটি উপকারী মাধ্যম। কিন্তু এ সাদকা সঠিক হওয়া এবং এটিকে উপাসনায় পরিণত করার জন্য দু'টি পূর্বশর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ সাদকা কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ যে স্থানের জন্য সদকা করা হচ্ছে সে স্থানটি শির্ক সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্য স্থান হওয়া থেকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু সমাজের বাস্তবতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর বিপরীত আচরণ পরিলক্ষিত হয়। তাই দান-খয়রাতের মাধ্যমে সওয়াব হাসিলের পরিবর্তে মানুষ শির্কে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মাযার কেন্দ্রীক আচরণ এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণতঃ মানুষ মাযারে দানের মাধ্যমে মাযারস্ত পীর বা অলির সন্তুষ্টি লাভ করে

তাদের নিকট থেকে বা তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন তথা ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ কামনা করে থাকে। কিন্তু এ জাতীয় দান বা কামনা শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এখানে আল্লাহ্‌কে পাশ কাটিয়ে সরাসরি পীর বা অলির কাছে অথবা তাদের মধ্যস্ততায় আল্লাহ্‌র নিকট চাওয়া হয় বলে আল্লাহ্‌র মর্যাদার হানি হয়, যা প্রকৃতপক্ষে শির্‌ক।

মানতঃ

মানত শব্দের আভিধানিক অর্থ নিজের দায়িত্বে নেওয়া; যা নিজের দায়িত্বে নয় তা অপরিহার্য করে নেওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় মানত বলা হয় নিজের উপর এমন কিছু আবষ্যিক করে নেয়া যা আসলে বাধ্যতামূলক ছিলনা। সেটা শর্তযুক্তও হতে পারে আবার শর্তমুক্তও হতে পারে।

মানত এমন প্রকারের ইবাদত যা লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের উপর চাপিয়ে নেয়। কোন বিশেষ অবস্থায় মানতকে মানুষ ইবাদতের মাধ্যম করে নেয়। মানতের মাধ্যমে তারা আপদ-বিপদ, ক্ষয়-ক্ষতি, বালা-মুছিবত ইত্যাদি থেকে রেহাই পেতে চায় বা ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে চায়।

মানতের হুকুম বা বিধানঃ শরিয়তের হুকুমে মানত কোন ফরয, ওয়াজেব, সুন্নত বা মোস্তাহাব বিষয় নয়। আমরা অনেকেই মনেকরি মানত খুব সওয়াবের কাজ। আসলে এটি কোন সওয়াবের কাজ নয় বরং মাকরূহ। অধিকাংশ ইমাম ও ফেকাহবিদদের অভিমত এটাই। কেননা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে সব উম্মতদের নিরুৎসাহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানত মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এ সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের একটি হাদিস প্রনিধাণযোগ্য। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"তোমরা মানত করো না। কেননা মানত তকদীরের কোন বদল করতে পারে না। এর দ্বারা কৃপণের কিছু ব্যয় হয় মাত্র।"

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ১৪৮০

মানতের প্রকারঃ বৈধতার দৃষ্টিকোণ থেকে মানত প্রধানতঃ দুই প্রকার।

ক) বৈধ মানত বা শরিয়ত অনুমোদিত ভাল কাজের মানত। এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ শর্ত সাপেক্ষে কিছু ইবাদত বা ভাল কাজ করার মানত করা হয়; যেমন কেউ বললঃ যদি আমি সুস্থ হই তাহলে একটি ছাগল ছদকা করব অথবা তিনটা রোজা রাখব। এখানে মানতের বিষয়টি শরিয়ত অনুমোদিত ভাল কাজ ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বিষয়। কেউ এ ধরণের আল্লাহ্‌র আনুগত্যমূলক মানত করতে চাইলে সেটা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে শর্ত পূরণ হলে মানত পূরণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

খ) অবৈধ মানত বা শরিয়ত নিষিদ্ধ মন্দ ও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতামূলক কাজ করার মানত। এ জাতীয় মানতেও কিছু শর্ত রাখা হয়। তবে যে কাজের জন্য বা যে ধরনের মানতের জন্য শর্ত রাখা হয় তার কোন শরই বৈধতা নেই এবং সেটা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতামূলক কাজ। যেমন কেউ বললঃ আজ যদি অমুক দল খেলায় জয়লাভ করে তবে আমি তোমাদের মদ্য পান করাব। শর্ত পূরণ হোক কিংবা না হোক এ জাতীয় মানত মোটেই পূরণ করা যাবে না। যে কাজ নিজের এবং ধর্মের জন্য ক্ষতিকর সে কাজের জন্য

মানত করা জায়েয নয়। এমনিভাবে মানতের মাধ্যমে কোন বৈধ কাজকে অবৈধ করা যায়না তদ্রুপ কোন অবৈধ কাজের জন্যও মানত করা যায়না। যেমন কেউ মানত করল ইলেকশনে জিতে গেলে একটি গানের জলসা করব। এ ধরনের মানত পালনযোগ্য নয়। আবার শির্ক সংঘটিত হবার সম্ভাব্য স্থান যেমন মাজার, কবর, ওরশ প্রভৃতি স্থানের নামে মানত করার কোন বৈধতা নেই এবং সে মানত পুরা করাও না-জায়েয।

মানতের শির্কঃ

মানত আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় কোন ইবাদত নয়। তবুও শর্তসাপেক্ষে আল্লাহ্‌র নামে মানত করার বৈধতা রয়েছে এবং সে মানত পুরা করাও জরুরী। কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করার কোন বৈধতা নেই। গায়রুল্লাহর নামে মানত করা শির্ক। এতদসত্বেও বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ আল্লাহ্‌র স্মরণাপন্ন না হয়ে গায়রুল্লাহর নামে মানত করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সন্তান লাভের আশায়, বিপদমুক্তির আশায়, ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য, রোগ-বালা দূর করার জন্য ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের প্রয়োজন পুরা করার জন্য মানত করা এবং তা পূর্ণ করার প্রবণতা প্রচলিত রয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শর্তের কথা বিবেচনায় না এনে তারা মহান আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে গায়রুল্লাহর নামে যেমন- ফেরেশতা, নবী-রাসূল, জ্বিন, অলি-আউলিয়া, পীর-মাশায়েখ, বুজুর্গ, ফকির-দরবেশ, কবর, মাজার ও খানকা ইত্যাদির নামে মানত মানে দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল এবং কল্যাণ লাভের আশায়। এসবক্ষেত্রে টাকা-পয়সা থেকে শুরু করে হাঁস-মুরগী, কবুতর, গরু-ছাগল পর্যন্ত, এমনকি মিঠাই-মণ্ডা, শিরণী-পায়েস এবং আগরবাতি, মোমবাতি, চেরাগ, ফুল, গোলাপজল ইত্যাদি জিনিসপত্র বিভিন্ন মাজার, কবর, খানকা, ওরশ বা করো দরবারে মানত বা নযর দিতে দেখা যায়। মানতের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পীর-অলিকে অতি উচ্চ মর্যাদায় উপনীত করে আল্লাহ্‌র সমস্তরে উন্নীত করা হয়– যা একপ্রকার ইবাদতের শামিল এবং প্রকাশ্য শির্ক। মানতটি পুরা করার সময় যদিও বা আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়ে থাকে, তবুও তাদের এ মানত দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা মাযার ও কবরস্ত পীর, অলি বা দরবেশদেরই সম্মান প্রদর্শিত হয়ে থাকে বলে তা শির্ক। গায়রুল্লাহর নামে উৎসর্গকৃত জন্তু-জানোয়ার বা পশু-পাখী ভক্ষণ করাও মানুষের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"যে জন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই বা উৎসর্গ করা হয়েছে, তা সবই তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে ।"

আল কোরআন, সুরা মায়েদা, আয়াত- ৩

দু'আঃ

দু'আ শব্দের আক্ষরিক অর্থ আহ্বান, প্রার্থণা। শরিয়তের পরিভাষায় দু'আ বলা হয় কল্যাণ ও উপকার লাভের উদ্দেশ্যে এবং ক্ষতি ও অপকার রোধকল্পে মহান আল্লাহ্‌কে ডাকা এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থণা করা। দু'আর মাধ্যমে মানুষ বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে যাবতীয় আর্জি পেশ করে থাকে।

দু'আর ফজিলতঃ দু'আ মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত। দু'আ ইবাদত হওয়ার সপক্ষে দলিল হিসেবে একটি হাদিস এখানে প্রণিধানযোগ্য। হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্নিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"দু'আ হলো ইবাদত।"

হাদিস, তফসীর ইবনে কাসির, ১৬ তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৩

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দু'আর কোনো বিকল্প নেই। বিপদাপদ দূর করা, রোগমুক্তি কামনা করা, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন পুরা করা সহ দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি ইত্যাদি সকল প্রকার চাওয়া বা কামনা দু'আর মধ্যে শামিল। দু'আতে রয়েছে প্রভূত ফযিলত, মহাপুরষ্কার, শুভ পরিণতি ও অনেক কল্যাণ। দু'আকারী ব্যক্তি দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করে এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। তবে দু'আ চাইতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর সমীপে। আল্লাহ্‌র উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের মর্যাদার দাবীতে দু'আর ইবাদত প্রাপ্যতার একমাত্র হকদার আল্লাহ্‌। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ মানুষকে তাঁর কাছে দু'আ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে,

"আর তোমাদের রব বলেছেনঃ তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।"

আল কোরআন, সুরা মোমন, আয়াত- ৬০

এ আয়াতের মাধ্যমে দু'আ সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌ মানুষকে তাঁর কাছে দু'আ করতে নির্দেশ দান করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি মানুষের ডাকে সাড়া দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদেরকে দু'আ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এর মধ্যেই রয়েছে মানুষের দু'আ কবুলের ইঙ্গিত। তৃতীয়তঃ যারা ইবাদত বিমুখ অর্থাৎ অহংকারবশতঃ যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে গাফিল থাকে বা তাঁর কাছে দু'আ করা থেকে বিরত থাকে, তাদেরকে আল্লাহ্‌ তিরস্কার করেছেন এবং দু'আ বিমুখতার জন্য তাদেরকে লাঞ্ছিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ঘোষণা দিয়েছেন।

দু'আ কবুলের শর্তাবলীঃ মুমিনের প্রত্যাশা মহান আল্লাহ্‌ যেন তার দু'আ কবুল করেন এবং তার মনের আশা পূরণ করেন। কিন্তু দু'আ কবুলের জন্য কিছু শর্ত আছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

ক) ইখলাস: এটি আমল কবুল হওয়ার মূল শর্ত। সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য ইবাদতকে নিরঙ্কুশ করার নাম ইখলাস। এ শর্তানুযায়ী দু'আ করতে হবে খাঁটি দিলে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে। আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ করা হলে তা কবুল হবে না; উপরন্তু সেটা হবে সীমালঙ্ঘণের অপরাধ। পবিত্র কোআনে মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন মাবুদকে ডাকে, যার স্বপক্ষে কোন দলীল তার কাছে নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না।"

আল কোরআন, সুরা মু'মিনুন, আয়াত- ১১৭

খ) দু'আকারী ব্যক্তির সম্পদ হালাল হওয়া: ইসলামে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি হেদায়েত করেছেন এভাবে,

"হে রাসূলগণ! পবিত্র দ্রব্য-সামগ্রী খাও ও নেক আমল কর। তোমরা যা কিছুই কর, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"

আল কোরআন, সুরা মু'মিনুন, আয়াত- ৫১

নেক আমলের ব্যাপারে পবিত্র অর্থাৎ হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। হালাল খাদ্য গ্রহণে দু'আ কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশংকাই বেশী। এক কথায় দু'আ কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল খাদ্য গ্রহণ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

"যে লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহ্‌র সামনে দু'আর জন্য দু'হাত তুলে ইয়া রব! ইয়া পরওয়ারদেগার! বলে ডাকতে থাকে; কিন্তু তার পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোষাক-পরিচ্ছদও হারাম পয়সায় তৈরী, এমতবস্থায় তার দু'আ কিরূপে কবুল হতে পারে?"

তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৮

এ থেকে বোঝা গেল যে, ইবাদত ও দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব রয়েছে এবং হারাম ভক্ষণের ফলে ইবাদত ও দু'আ কবুল হওয়ার যোগ্য হয়না। হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদিসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"সে সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ– বান্দা যখন নিজের পেটে হারাম লোকমা ঢোকায়, তখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন আমল কবুল হয় না। আর যার শরীরের মাংস হারাম মাল দ্বারা গঠিত, সে মাংসের জন্য তো জাহান্নামের আগুণই যোগ্য স্থান।"

তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৬

গ) দু'আয় সীমালঙ্ঘণ না করা: দু'আর সময় বান্দা বৈধ সীমারেখায় বিচরণ করবে। পাপের কাজ সিদ্ধ করা বা অত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অথবা সামান্য ভুলের শাস্তিস্বরূপ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ধ্বংসের জন্য দু'আ করবে না। দু'আতে অবৈধ ওসীলা গ্রহণ করা এবং বিদআতী পন্থায় দু'আ করাও সীমালঙ্ঘণের আওতায় পড়ে। সুতরাং এ সকল বিষয় পরিহার করে দু'আ করা হলে দু'আ কবুলের আশা করা যায়।

দু'আ কবুলের অন্তরায়সমূহ: উপরে বর্ণিত দু'আ কবুলের শর্তগুলি বিশ্লেষণ করে দু'আ কবুলের অন্তরায় সমূহ অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সে হিসেবে দু'আ কবুলের অন্তরায়সমূহ নিম্নরূপ:

- দু'আতে ইখলাস না থাকা
- হারাম ভক্ষণ করা
- আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা
- সুন্নতের খেলাপ বা বিদআত করে দু'আ করা
- মৃত বা কবরস্থ ব্যক্তির ওসীলা গ্রহণ করে দু'আ করা
- আদবের খেলাপ করে দু'আ করা ইত্যাদি।

দু'আর আদবসমূহ: দু'আ ইবাদত হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য আদবের সাথে দু'আ করা আবশ্যক। অন্যথায় দোয়ার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘণের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। দু'আর কিছু সঠিক পদ্ধতি রয়েছে।

সে পদ্ধতি অবলম্বন করে দু'আ করা হলে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে যায়। দু'আর আদবসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- **বিনয়, নম্রতা ও একাগ্রতার সাথে চুপিসারে দু'আ করাঃ** দু'আর আদব সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেন,

  "তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনীতভাবে ও চুপিসারে আহ্বান কর, নিশ্চয়ই তিনি যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের পছন্দ করেন না।"

  আল কোরআন, সুরা আরাফ, আয়াত- ৫৫

  আল্লাহ্ মানুষের সকল কিছু দেখেন ও শোনেন। তাই দু'আর আদব হলো, অত্যন্ত বিনীতভাবে ও চুপিসারে বা অনুচ্চস্বরে আল্লাহ্‌কে আহ্বান করা। বাগাড়ম্বর করে উচ্চস্বরে দু'আ করা আল্লাহ্‌র সাথে বেয়াদবি করার শামিল। দু'আর মাধ্যমে মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হতে পারে কিন্তু দু'আর ক্ষেত্রে আদবের খেলাপ হলে বা সীমালঙ্ঘণ করা হলে, আল্লাহ্ তা পছন্দ করেন না; উপরন্তু সেটা তাঁর ক্রোধের কারণ হয়।

- **ভয় ও আশার সংমিশ্রনে দু'আ করাঃ** অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় রেখে এবং প্রার্থিত বিষয়টি লাভের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে দু'আ করতে হবে। কেননা দেবার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং সংশয় চিত্তে তাঁর কাছে কোন কিছু কামনা করা আদবের খেলাপ এবং সে দু'আ কবুল না হওয়ারই সম্ভাবনা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সর্বদা তাঁর শাস্তির ভয় ও রহমতের আশায় থেকেই তাঁকে আহ্বান করতে নির্দেশ করে বলেছেন, করেন,

  "তোমরা ভয় ও আশা নিয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকো।"

  আল কোরআন, সুরা আরাফ, আয়াত- ৫৬

- **দু'আর জন্য উত্তম সময় ও স্থান বেছে নেওয়াঃ** শরিয়ত সমর্থিত কিছু উত্তম সময় ও স্থান রয়েছে, সে সময়ে এবং সে সকল স্থানে উপস্থিত হয়ে দু'আ করা হলে সে দু'আ কবুল হবার আশা করা যায়। যেমন আরাফা দিবস, রমযান মান, জুমার দিন, কদরের রাত, প্রত্যেক রাতের শেষাংশ, সালাতে সিজদারত অবস্থা, আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়, সফরকালীন সময়, সিয়ামের সময়, হজ্বের সময় বিশেষভাবে ত্বাওয়াফ ও সায়ীর সময় এবং জামারাতে পাথর নিক্ষেপের পর ইত্যাদি সময় ও স্থান সমূহ দু'আর জন্য বেছে নেওয়া।

- **পবিত্র অবস্থায় কেবলামুখী হয়ে হাত তুলে দোয়া করাঃ** দু'আ করার জন্য প্রথমেই পবিত্রতা হাসিল করে নিতে হয়। অতঃপর কেবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দু'আ করতে হয়। দু'আর শুরু এবং শেষাংশে আলাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা এবং রাসূলুলাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর সালাত ও সালাম পেশ করা আবশ্যক। এ রীতিতে প্রথমেই আল্লাহ্ তা'আলাকে রব বলে স্বীকৃতি প্রদান পূর্বক তাঁর দেয়া সীমাহীন নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতঃ তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে হয়। অতঃপর তিনি ছাড়া আর কাউকেও দাতা ও অভাবপূরণকারী মনে না করে কেবলমাত্র তাঁকেই ইবাদত প্রাপ্যতার যোগ্য হকদার বলে স্বীকৃতি প্রদান পূর্বক তাঁর কাছে স্বীয় মকসুদ পূরণের আর্জি পেশ করতে হয় আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করতে হয়। এ নিয়মে দু'আ করা হলে, তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আশা করা যায়।

দু'আর শির্‌কঃ

দু'আর শির্ক বলতে পূণ্য লাভের আশায় অথবা মানুষের সাধ্যের বাইরে এমন কোন পার্থিব লাভের আশায় কিংবা পার্থিব ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করাকে বোঝায়। সকল আহ্বান বা দু'আ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য এবং তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। দু'আর মাধ্যমে যেহেতু আল্লাহ্র উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকা বা তাঁর সাথে অন্যদেরকে ডাকা বা অন্যদের মাধ্যমে তাঁকে আহ্বান করা হলে উলূহিয়্যাতের শির্ক সংঘটিত হয়। এভাবে মানুষ যখন নবী, রাসূল, পীর, অলি, সুফী, দরবেশ, বুজুর্গ প্রমূখ সত্তার কাছে সরাসরি দু'আ করে কিংবা তাদেরকে ওসীলা বানিয়ে তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে তখন শির্ক সংঘটিত হয়। অনুরূপভাবে কোন মাযার বা কবরকে উদ্দেশ্য করে দু'আ কামনা করাও শির্ক। আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি অন্য কাউকে ডাকার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সুরা জ্বিনে–

"নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের জন্য, অতএব তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি অন্য কাউকে ডেকো না।"

আল কোরআন, সুরা জ্বিন, আয়াত- ১৮

যারা আল্লাহ্ ব্যাতীত অপর কাউকে আহ্বান করে, অপরের নিকট অনুশোচনা ও বিনয় প্রকাশ করে, তারা প্রকারান্তে আল্লাহ্র পরিবর্তে তাদেরকে ইলাহ্ বানিয়ে নেয়। তাদের হিসাব রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ,

"যারা আল্লাহ্র সাথে অপর কোন ইলাহ্কে আহ্বান করে, যে আহ্বানের বৈধতার পিছনে তার নিকট দলীল প্রমাণ নেই, তার এ আহ্বানের হিসাব রয়েছে তার রবের নিকট, বস্তুতঃ কাফিরগণ কোন অবস্থাতেই কৃতকার্য হতে পারে না।"

আল কোরআন, সুরা মুমিনুন, আয়াত- ১১৭

আল্লাহ্ ছাড়া মানুষ আর যাদেরকে আহ্বান করে, তারা তো আল্লাহ্রই মুখাপেক্ষী এবং তাঁর দয়া প্রত্যাশী। অন্যকে সাহায্য করাতো দূরের কথা তারা নিজেরাইতো আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের উপায় খুঁজতে থাকে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারা নিজেরাই তো প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় তালাশ করতে থাকে এবং তারা তাঁরই দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর আযাবকে ভয় করে।"

আল কোরআন, সুরা বানী ইসরাঈল, আয়াত- ৫৭।

আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের জন্য একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যাবশকীয়। দু'আ যেহেতু ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং কোন কিছুর আশা করা বা চাওয়া যেমন রোগ মুক্তি কামনা, বিপদ থেকে পরিত্রান, কোন প্রকার জাগতিক বা পরকালীন কল্যাণ কামনা ইত্যাদি যখন দু'আর মধ্যে শামিল তখন কেবলমাত্র আল্লাহ্র কাছেই দু'আ করতে হবে। দু'আ গ্রহণযোগ্যতার জন্য এর শর্তগুলিও পূরণ হওয়া আবশ্যক। দু'আর ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘণ করা যাবেনা। যেমন গায়রুল্লাহর কাছে দু'আ করা, বিদ'য়াতি পন্থায় দু'আ করা, দু'আর জন্য মৃত ব্যক্তিকে মাধ্যম বানান ইত্যাদি গর্হিত কাজ এবং শির্ক। কিন্তু একমাত্র শির্ক বর্জিত ইবাদতই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। আর তাই ইবাদত হতে হবে

আল্লাহ্‌র জন্য এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই জন্য। অন্যথায় কল্যাণ লাভের পরিবর্তে দু'আকারী ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"আর তুমি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া এমন কাউকে ডেকোনা, যে তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। এমন করলে তুমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কোন ক্ষতির সম্মুখীন করেন তাহলে তিনিই একমাত্র তোমাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের গতি রোধ করার সাধ্য কারোরই নেই। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান অনুগ্রহ করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু।"

আল কোরআন, সুরা ইউনুস, আয়াত-১০৬-১০৭।

মুসলিম সমাজের একদল অতিসংবেদনশীল মানুষ আবেগতারিত হয়ে বা অজ্ঞতার কারণে এ ধরনের শির্‌ক করে বসে। তারা নবী মোহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর কাছে আর্জি পূরনের প্রার্থনা করে, জাগতিক বা পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধি ও মুক্তির জন্য আবেদন করে এই ধারণায় যে, তিনি তাদের প্রার্থণার জবাব দেন এবং মঞ্জুর করতে পারেন। অনেকসময় এ ধরনের ব্যক্তিরা তার সমাধিতে সিজদা পর্যন্ত করতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন এ ধরনের আচরণ অবশ্যই শির্‌ক। কারণ হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন মানুষ এবং আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল। এ সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"তোমরা আমাকে এমন ভাবে বাড়িয়ে দিওনা যেভাবে খ্রিষ্টানেরা হযরত ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ) কে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি একজন দাস মাত্র। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র দাস ও আল্লাহ্‌র রাসূল বলবে।"

সহীহ বুখারী শরীফ।

যুগে যুগে আল্লাহ্ পৃথিবীতে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষের মাঝে তাঁর বাণী প্রচার ও সত্যের দাওয়াত সহ। আল্লাহ্ কোন রাসূলকেই ইলাহ রূপে পাঠান নি। এর স্বপক্ষে কোরআনের এ আয়াতই যথেষ্ট,

"(হে মোহাম্মদ) তুমি বলো আমার নিজের ভালো-মন্দেও মালিকও তো আমি নই, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যা চান তাই হয়। আমি তো শুধু একজন (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী সতর্ককারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী মাত্র, শুধু সে জাতির জন্যে যারা আমার উপর ঈমান আনে।"

আল-কোরআন, সুরা আরাফ, আয়াত-১৮৮।

বর্তমান কালে মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরও কিছু বিতর্কিত আচার-আচরণ এই শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, মাজার কেন্দ্রিক ইবাদত বা 'মাজার পূজা'। এক শ্রেণীর মানুষ পীর, আউলিয়া, দরবেশ, সুফী, বুজুর্গ প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাদের সমাধি পাকা-পোখ্‌ত করে, গম্বুজ, কুব্বা ইত্যাদি নির্মাণ করে, মোমবাতি বা আগরবাতি জ্বালিয়ে কবরকে ইজ্জত করে এবং এ স্থানকে ইবাদতখানায় পরিণত করে। লোকের কাছে এ স্থানটি পীরের মাজার হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। এশিয়ার মধ্যে এ ধরনের অনেক পীরের মাজারের অস্তিত্ব রয়েছে যেমনঃ বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাহঃ), খাজা মাইনুদ্দিন চিশ্‌তি (রাহঃ), খাজা খান জাহান আলী (রাহঃ), হজরত শাহ জালাল (রাহঃ) প্রমুখের মাজার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারন মানুষ এদের মাজারকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করে। তারা মাজারের উদ্দেশ্যে মানত

করে, জন্তু জবাই করে, মাজার ত্বাওয়াফ করে এবং ফায়দা হাসিলের দু'আ চায় যেমন- নিঃসন্তান লোক সন্তান কামনা করে, অসুস্থ লোক সুস্থতা বা রোগমুক্তি কামনা করে, বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণ চায় ইত্যাদি। তাদের ধারণা যে, এ সমস্ত পূন্যাত্মা রূহানী ক্ষমতার অধিকারী এবং অলৌকিক ভাবেই তারা মানুষের প্রার্থণা শুনতে পারে এবং ফায়দা দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন,

"একজন জীবিত মানুষ এবং একজন মৃত মানুষ সমান নয়; আলাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে শোনান, তুমি কখনো শোনাতে পারবে না যারা কবরে রয়েছে তাদের।"

আল-কোরআন, সুরা ফাতির, আয়াত-২২।

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সমাধিস্থ মানুষকে ডাকা বৃথা কারণ তারা না শুনতে পায়, না জবাব দিতে পারে। সুতরাং কবর বাসীকে ডাকা যেমন অর্থহীন তেমনি মানুষের মাজার কেন্দ্রিক সকল আচরণও মূল্যহীন; উপরন্তু তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসে মানুষ মাজারকে তাজিম করে, মাজার বাসীর কাছে প্রার্থনা করে, এমনকি কোন কোন সময় সিজদা পর্যন্ত করে। এক কথায় এদেরকে মানুষ মা'বুদ বানিয়ে নেয়। এখানে উল্লেখ্য যে বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাহঃ) কে মানুষ 'গাউসে-আজম' অর্থাৎ ত্রান-কর্তা রূপে ভাবে। কিন্তু এ ধরনের বিশ্বাস এবং মাজার কেন্দ্রিক সমুদয় আচরণ অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং শির্ক। কারণ এ ধরনের আচরণ কার্যত আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী স্থাপনের শামিল এবং তাওহিদী আকিদার বিপরীত। ইবাদতে তাওহীদ পরিপন্থী কোন কাজই আল্লাহ্ বরদাস্ত করেন না। একমাত্র আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং সকল প্রার্থণা কবুল করার মালিক। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে মানুষকে সাবধান করে বলেছেন,

"অতএব, তুমি কখনো আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কোনো মা'বুদকে ডেকো না, ডাকলে তুমিও শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

আল-কোরআন, সুরা শুয়ারা, আয়াত-২১৩।

আবার কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন,

"তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহ্র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে বা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?" আল-কোরআন, সুরা আনআম, আয়াত-৪০।

সুতরাং একজন মুমিন ব্যক্তির জন্য এটা কথনই শোভনীয় নয় যে, সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে ডাকে বা তার কাছে সাহায্য প্রার্থণা করে। কেননা কিয়ামত দিবসের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ এবং সেদিন আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে কোন প্রকার সাহায্য করার ক্ষমতা থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কাউকে ডাকা হলেও তারা কখনো কারো ডাকে সাড়া দেবেনা। বরং তাদেরকে ডাকা সর্বদা ব্যর্থ ও নিষ্ফল হতে বাধ্য। মুশরিক ও কাফিরদের দু'আ কবুল হয় না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"তাঁকে (আল্লাহ্কে) ডাকাই সঠিক, যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের ডাকে, এরা কখনই সাড়া দেবে না; তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে পিপাসায় কাতর হয়ে নিজের উভয় হাত প্রসারিত করে এ আশায় যে, পানি তার মুখে এসে পৌঁছবে, অথচ তা তার কাছে পৌঁছাবার নয়, কাফিরদের আহ্বান এমনিভাবে নিষ্ফল।"

আল-কোরআন, সুরা রাদ, আয়াত- ১৪।

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকা হয় তারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কারো ডাকে সাড়া দিতে সমর্থ নয়। কেননা তারাতো ভক্তদের প্রার্থণা সম্পর্কে অবহিতই নয়। আর যারা অন্য কাউকে ডাকে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"সে ব্যক্তি ব্যতীত আর অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে? যে আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কস্মিনকালেও তার ডাকে সাড়া দেবেনা এবং তারাতো ওদের প্রার্থণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। "

আল-কোরআন, সুরা আহকাফ, আয়াত-৫

দু'আয় ওসীলা গ্রহণ: 'ওসীলা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ মাধ্যম ও নৈকট্য। হাদিসের পরিভাষায় এর তৃতীয় আর একটি অর্থ হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ স্থান। সেদিক থেকে বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থানটির নাম ওসীলা। সাধারণভাবে মাধ্যম বা নৈকট্য, এ উভয় অর্থেই ওসীলা শব্দটির ব্যবহার হতে পারে। কোরআনে বর্ণিত ওসীলা শব্দের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট তাফসীরবিদগণ এ শব্দটিকে মাধ্যম অর্থে ব্যবহার না করে 'নৈকট্য' অন্বেষণের অর্থে ব্যবহার করেছেন। তবে আমাদের সমাজে 'মাধ্যম' অর্থেই ওসীলা শব্দটি প্রচলিত হয়ে আসছে। এর ফলশ্রুতিতে দু'আর ক্ষেত্রে ওসীলা গ্রহণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে যে, আল্লাহ্র কাছে দু'আ করার জন্য কোন ওসীলা বা মাধ্যম ধরার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ সরাসরি মানুষের দু'আ শ্রবণ করে থাকেন এবং এর বিণিময় দিয়ে থাকেন। কিন্তু কারো নাম ও মর্যদার ওসীলায় আল্লাহ্র কাছে দু'আ করা সুন্নাহ্ পরিপন্থী একটি বিদ'আতী কর্ম এবং তা অনেকসময় শির্কের মত কঠিন অপরাধ সংঘটিত করে ফেলে। তবুও মানুষ অনেক সময় অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে দু'আর মধ্যে অন্যদেরকে ওসীলা বা মাধ্যম বানিয়ে নেয়। তাদের ধারণা যে নবী-রাসূল, ফেরেশতা, জ্বিন, দানব, মানব, পীর, মোর্শেদ, অলি, আউলিয়া, সুফী প্রমুখ পূণ্যাত্মাগণ সুপারিশ করে তাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিলের রাস্তা করে দেবে বা এদের মর্যাদার কারণে আল্লাহ্ তাদের দু'আ কবুল করে নেবেন। তাই তারা এদের খুশী করতে সদা ব্যস্ত থাকে এবং এদের কাছে প্রার্থণা করে থাকে বা এদের ওসীলা বানিয়ে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে থাকে। এ ধরনের ওসীলা গ্রহণের সপক্ষে তারা কোরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন, তা হল:

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য (ওসীলা) অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।"

আল-কোরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত-৩৫

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ তফসীরবিদগণ ওসীলা শব্দটিকে নৈকট্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাদের মতে প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটিতে 'ওসীলা' শব্দটি মাধ্যম না বুঝিয়ে নৈকট্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আল্লাহ্কে ভয় করে ঈমান ও আমলে সলেহ দ্বারা তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিলের প্রচেষ্টা করা প্রত্যেক মুমিনেরই অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য হাসিলের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে খাঁটি ঈমানের সাথে সৎকাজ সম্পাদন করা এবং নেক নিয়তে একমাত্র আল্লাহ্র কাছে সকল আর্জি পেশ করা। এখানে আল্লাহ্র পথে জেহাদ করাকে একটি বিশেষ সৎকর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সকল সৎকর্ম এবং ইবাদতও তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় হয়ে যাবে যদি তা খাঁটি ঈমান সহকারে কেবলমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এবং তাঁর ভয়ে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সাহাবী ও

তাবেঈদের আমল দ্বারাও এটাই প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু একশ্রেণীর আলেম এ আয়াতটির অপব্যাখ্যা প্রদান করে পয়গাম্বর ও মৃত অলি-আউলিয়া বা নেক বান্দাদের মর্যাদা ও তাদের নামের ওসীলায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করার কথা বুঝিয়েছেন এবং তারা অত্যন্ত সফলভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধারণাটির অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। এভাবে এদেরকে ওসীলা করে আল্লাহ্র কাছে দু'আ চাওয়ার বিষয়টি প্রচলিত হয়ে আসছে মুসলিমদের মাঝে। অথচ এটা সম্পূর্ণ একটি ভুল ধারণা। আবার ওসীলা সম্পর্কে কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে ঠিকই, তবে সেখানে হাদিসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ধূম্রজাল তৈরী করা হয়ে থাকে। আর তাই যে সব সহীহ হাদিস দ্বারা বাহ্যত এমনটি বোঝা যায়, আসলে সে সবের দ্বারা রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দোয়ার ওসীলা-ই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাঁর নাম ও মর্যাদার ওসীলা করা হয়নি। তবে নবী-রাসূল বা নেক বান্দাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করে তাদের প্রতি গভীর ভালবাসা প্রদর্শণ করা কর্তব্য। কেননা পয়গাম্বর, পীর-অলি বা মৃত নেক মানুষদের মহব্বত করা আর তাদের নামের ওসীলায় দোয়া করা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন বিষয়। প্রথমটি মানুষের ঈমানের পরিচায়ক আর অপরটি সুন্নাহ্ বহির্ভূত একটি বেদ'আতী কর্ম। কিন্তু তা সত্বেও অজ্ঞ মানুষেরা ওসীলা সম্পর্কিত বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে গিয়ে পথভ্রষ্টতায় পতিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তবে সারকথা হল এই যে, আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য হাসিলের জন্য কোন মাধ্যম তালাশ করার প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্ সরাসরি মানুষের কথা শুনে থাকেন এবং তাদের আর্জি পূরণ করেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"তোমাদের প্রভু বলেনঃ তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো; যারা অহংকারের কারণে অমার ইবাদত থেকে না-ফরমানি করে, অচিরেই তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

আল-কোরআন, সুরা মোমেন, আয়াত-৬০

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এ সকল সত্তা যত বড় মর্যাদার আধিকারীই হোক না কেন তারা আল্লাহ্র কাছে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও শক্তিহীন এবং সকলেই তাঁর দাস। তাদের এ অধিকার পর্যন্ত নেই যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া তারা কারো জন্য সুপারিশের জন্য মুখ খুলতে পারে। সুতরাং ওসীলা তালাশ করা মানুষের নিতান্তই একটি ভ্রান্ত ধারণা। মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে তাদের এ ভুল আকিদাকে খন্ডন করেছেন এভাবে,

"জেনে রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্রই প্রাপ্য। যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তো এদের উপাসনা এজন্যই করি যে, এরা আমাদের আল্লাহ্র সান্নিধ্য এনে দেবে।' তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ্ তার ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

আল-কোরআন, সুরা যুমার, আয়াত-৩।

সুতরাং এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ এবং সকল ইবাদত তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ্কে পেতে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই এবং আল্লাহ্র কোন অংশীদার বা শরীক নেই। তাই নবী-রাসূল, পীর-আউলিয়া, সুফী, দরবেশ বা অন্যান্য বুজুর্গগণের কাছে বা তাদের মাধ্যমে নয় বরং সকল কিছুই সরাসরি আল্লাহ্র কাছে চাইতে হবে। এর সমর্থনে একটি হাদীস উপস্থাপন করা যেতে পারে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

"আমার পরে অচিরেই কারো উপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া শুরু হবে এবং এমন কিছু কর্ম হবে যা তোমরা পছন্দ করবে না।"

সাহাবীগন নিবেদন করলেন,

'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি আমাদের কি আদেশ করেন?'

তিনি বললেন,

"তোমাদের উপর যে সব হক রয়েছে সে সব আদায় করবে আর তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে।"

রিয়াদুস সলেহীন, হাদীস-৫১।

আল্লাহ্ তা'আলা অমুখাপেক্ষী, তাই কারো নাম বা মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ না করে সর্বাবস্থায় সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন পেশ করাই সকলের জন্য সমীচীন।

ওসীলা গ্রহণের বৈধ ও অবৈধ পন্থা: ওসীলা গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র কাছে আর্জি পেশ করার কয়েকটি বৈধ পন্থা রয়েছে। সেগুলি হল:

- **আল্লাহ্‌র সুন্দর নামাবলী ও গুণাবলীর ওসীলায় দু'আ করা।**
- **আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়নের ওসীলায় দু'আ করা।**
- **নিজের নেক আমলের বা সৎকর্মের ওসীলায় দু'আ চাওয়া।**
- **নিজের দুর্দশা ও অপরাধ স্বীকার করার ওসীলায় দু'আ করা।**
- **জীবিত মানুষের দু'আর ওসীলা গ্রহণ করা ও তাদের দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করান।**

উলিখিত বৈধ ওসীলার বাইরে ওসীলা গ্রহণের অন্য সকল উপায়ই অবৈধ পন্থা হিসাবে বিবেচিত হবে। উপরে বর্ণিত ওসীলার বৈধতা দলীল সম্মত এবং এর স্বপক্ষে কোরআন এবং হাদিসের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। এপর্যায়ে দলীল সহ প্রতিটি বিষয়ের উপর সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হলো:

আল্লাহ্ তা'আলার রয়েছে সব সুন্দর সুন্দর গুণবাচক নাম। আল্লাহ্‌র সেসব নামাবলীর ওসীলায় দু'আ করার বৈধতা পবিত্র কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর উত্তম নামাবলীর ওসীলায় অহ্বান করার জন্য নির্দেশ দান করেছেন এভাবে,

"আর আল্লাহ্‌র রয়েছে সব উত্তম নাম, সুতরাং সে নাম ধরেই তাঁকে আহ্বান কর।"

আল-কোরআন, সুরা আ'রাফ, আয়াত-১৮০

আল্লাহ্ যেখানে আমাদেরকে তাঁর নামের ওসীলায় তাঁকে আহ্বান করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে আমরা তাঁর নির্দেশ ব্যতীত তাঁকে কোনভাবেই তাঁর কোন সৃষ্টির নামের ওসীলায় আহ্বান করতে পারি না, যদিও সে সৃষ্টি তাঁর নিকট তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে অধিক ভালবাসার পাত্রও হয়ে থাকেন। আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা। তাই আমাদের জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন কোন সৃষ্টির মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তাঁর কাছেই জানাব, এটাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের ওসীলায় দু'আ করার বৈধতা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বয়ং তার বান্দাদেরকে দু'আ করতে শিখিয়ে দিচ্ছেন এভাবে,

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি এ মর্মে আহ্বান

করতে শুনেছি যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনায়ন কর, তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! অতঃপর আমাদের সকল গুণাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করে দাও।"

আল-কোরআন, সুরা আলে-ইমরান, আয়াত-১৯৩

ঈমানের রোকনসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের ওসীলায় দু'আ করা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা কিছু নাযিল করেছ আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুগত হয়েছি, অতএব তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে লিখে নাও।"

আল-কোরআন, সুরা আলে-ইমরান, আয়াত-৫৩

নিজের নেক আমল বা সৎকর্মের ওসীলায়ও দু'আ করার বৈধতা রয়েছে। মানুষের নেক আমলের মধ্যে উত্তম দু'টি আমল হচ্ছে নামায ও সবর। মহান আল্লাহ্ এ দু'টির ওসীলায় দোয়া করার প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

"(হে ঈমানদারগণ!) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য কামনা কর।" আল-কোরআন, সুরা বাকারাহ, আয়াত-৪৫

এছাড়াও আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় নিজের অন্যান্য সৎকর্মের ওসীলা করেও আল্লাহ্র কাছে কিছু প্রাপ্তির জন্য দোয়া করা যেতে পারে।

আল্লাহ্র নিকট নিজের বিপদ ও দুঃখের কথা বলে নিজের দুর্বলতা প্রকাশের ওসীলায় দু'আ করার বৈধতাও পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে। হযরত আয়ুব (আঃ) দীর্ঘ দিন অসুখে ভোগার পরে নিজের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ কামনা করে রোগমুক্ত হয়েছিলেন। কোরআনে বর্ণিত আছে,

"যখন আয়ুব (আঃ) তার মালিককে ডেকে বলেছিলো, হে আলাহু! আমাকে এক কঠিন অসুখে পেয়ে বসেছে, নিরাময় করো, তুমিই হচ্ছো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা আমি দূর করে দিলাম, তাকে যে শুধু তার পরিবার পরিজনই ফিরিয়ে দিলাম তা নয়; বরং তাদের আমার কাছ থেকে বিশেষ দয়া এবং আমার বান্দাদের জন্যে উপদেশ হিসেবে আরো অনুগ্রহ দান করলাম।"

আল-কোরআন, সুরা আম্বিয়া, আয়াত-৮৩

এ আয়াতে কারীমার মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের জন্য প্রভূত শিক্ষণীয় বিষয়। বিপদাপদ দূর করার মালিক এবং যাবতীয় কল্যাণ প্রদানের মালিক হচ্ছেন আলাহ্। তাঁর কাছে চাওয়ার জন্য কোন ব্যক্তির মর্যদার ওসীলা গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। নিজের অসয়াত্বের কথা তুলে ধরে আল্লাহ্র কাছে চাওয়া হলে, তিনি সরাসরি বান্দার আর্জি শুনেন এবং তা পুরণ করে থাকেন। সকল অনুগ্রহ একমাত্র আলাহ্র কাছ হতে আসে।

নিজের অপরাধ স্বীকার করার ওসীলায় দু'আ চাওয়ার বৈধতাও কোরআনের বাণী দ্বারা প্রমাণিত আছে। নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করার ওসীলায় হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) আল্লাহ্র কাছে তা মার্জনার জন্য দু'আ করে বলেছিলেন,

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নিজেদের উপর জুলুম করেছি, তুমি যদি ক্ষমা ও দয়া না কর, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"

আল-কোরআন, সুরা আরাফ-২৩

জীবিত মানুষের দু'আর ওসীলায়ও আল্লাহ্‌র নিকট কিছু চাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে কোন পূণ্যবান ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে নিজের জন্য বা পরিবারের সদস্যদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করার জন্য বলা যেতে পারে। তিনি দু'আ করলে নিজে সে দু'আয় শরীক হওয়া যায় অথবা পরবর্তীতে তার দু'আর ওসীলা দিয়ে নিজেও আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে তা কবুল করার আর্জি পেশ করা যায়। এ জাতীয় ওসীলা করার বৈধতা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। এরূপ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন,

"খলিফা ওমরের আমলে অনাবৃষ্টির দরুন জনগণ দুর্ভিক্ষে পতিত হলে তিনি নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)**-এর চাচা আব্বাস (রাঃ) দ্বারা দোয়া করাতেন। ওমর (রাঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ বলতেন– হে আল্লাহ্‌! আমরা আমাদের নবীর ওসীলায় আপনার নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করতাম, আপনি আমাদের বৃষ্টির দ্বারা পরিতৃপ্ত করতেন। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার ওসীলায় আপনার নিকট বৃষ্টি চাচ্ছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। অতঃপর আব্বাস (রাঃ) দু'আ করতেন এবং সকলের জন্য পরিতৃপ্তির বৃষ্টি হত।"**

হাদিস, বোখারী শরীফ, নং-৫৪৯

এ হাদিস দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবিতাবস্থায় যেমন তাঁর দু'আর ওসীলায় বৃষ্টি কামনা করা হত তেমনি তাঁর ওফাতের পরে তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর দু'আর ওসীলায় বৃষ্টির প্রার্থণা করা হয়েছে। এ হাদিসদৃষ্টে ব্যক্তির দু'আর ওসীলা করে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়; কিন্তু কারো ব্যক্তিসত্তা বা মর্যদার ওসীলা করে দু'আ করার কোন বৈধতা প্রমানিত হয় না। যদি তাই হত তাহলে দু'আর জন্য আব্বাস (রাঃ)-কে ডাকার প্রয়োজন ছিলনা, সাহাবাগণ নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামের ওসীলায়-ই দু'আ করতে পারতেন, কিন্তু তা করা হয়নি। তবে আমাদের সমাজে ওসীলা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ধারণা এবং মতামত বিদ্যমান রয়েছে। অনেকেই এ হাদিস দ্বারা ব্যক্তির জাতসত্তা বা মর্যদার ওসীলায় দু'আ করাকে জায়েয বলে দাবী করেন। এবং এর ভিত্তিতেই তারা নবী-রাসূল, পীর-মোর্শেদ, গাউস-কুতুব, অলি-আউলিয়া বা জীবিত ও মৃত নেক মানুষের জাতসত্তা তাঁদের নাম ও মর্যাদার ওসীলায় দু'আ করে থাকেন। প্রচলিতভাবে বিভিন্ন সময় নামাযান্তে বা কোন অনুষ্ঠান শেষে যৌথভাবে এদেরকে ওসীলা করে পাপ মার্জনা সহ ইহকাল-পরকালের কল্যাণ কামনা ও অকল্যাণ দূরীকরণের এবং নাযাতের দু'আ করা হয়ে থাকে। তারা এ জাতীয় ওসীলা বৈধ প্রমাণ করার জন্য উল্লিখিত হাদিসটিকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। তবে যারা এ ধারণার ভিত্তিতে ওসীলার বৈধতা প্রদান করেছেন তারা বস্তুতঃ হাদিসটির মূলভাব থেকে দূরে সরে গেছেন এবং হাদিসটির ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুপস্থিতিতে দু'আর অনুষ্ঠানে আব্বাস (রাঃ)-র উপস্থিতি এবং দু'আয় অংশগ্রহণ ও তার দ্বারা দু'আ পরিচালনা করা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ব্যক্তির দু'আর ওসীলা গ্রহণ করা জায়েয রয়েছে; কিন্তু এখানে ব্যক্তির মর্যদার ওসীলা গ্রহণ করার বৈধতা কোনভাবেই বৈধ নয়। এ ছাড়াও ওসীলার স্বপক্ষে তারা আরো কিছু হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন, যে গুলির মধ্যেও তারা ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়েছেন; অধিকন্তু হাদিস বিশেষজ্ঞদের মতে এর মধ্যে কিছু হাদিস রয়েছে দুর্বল অথবা বাতিল হাদিস। উদাহরণসরূপ রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মর্যদার ওসীলায় হযরত আদম (আঃ) গুণাহ্‌ থেকে মাফ পেয়েছিলেন বলে যে হাদিসটির উদ্ধৃতি দেয়া

হয়, সে হাদিসটি আসলে ভিত্তিহীন। হাদিসটি কোন সহীহ সনদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে বিশেষজ্ঞদের কাছে সেটা জাল হাদিস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। আবার কোরআন থেকে যেটা প্রমাণিত হয় তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে একটি দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন এবং সে দু'আ পাঠ করেই তিনি গুণাহ্ থেকে মুক্ত হয়েছেন। অতএব রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মর্যাদর ওসীলা করে দু'আ করার বৈধতা কোনভাবেই দলীলসিদ্ধ নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর ওফাতের পরেও তাঁর সাহাবীদের মাঝে তাঁর মর্যাদা ও তাঁর নাম নিয়ে এমন ওসীলার প্রচলন ছিলনা। আল্লাহ্ তা'আলার জাত সত্তা এবং তাঁর নামের গুণাবলীর ওসীলা ব্যতীত অন্যকোন জাতসত্তা বা বস্তুর ওসীলায় দু'আ করা হলে আল্লাহ্র মর্যাদার হানি করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর পরিচালনাগত কাজে কাউকে শরীক রাখেন না। কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি মানুষের দু'আ তিনি শ্রবণ করে থাকেন এবং বিণিময় দিয়ে থাকেন, সেখানে কোন নবী-রাসূল কিংবা অন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ যেহেতু অমুখাপেক্ষী, তাই তিনি কার মর্যাদার দ্বারা প্রভাবিত হন না। উপরন্তু কারো মর্যাদার ওসীলা করে তাঁর কাছে কামনা করা বা কোন আর্জি পেশ করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র মর্যাদা হানি করারই নামান্তর। তাই আল্লাহ্ পাকের মর্যাদার দাবীতে, কোন ওসীলা বা মাধ্যম গ্রহণ না করে সরাসরি আল্লাহ্র কাছে কামনা করাই যুক্তিযুক্ত এবং শরিয়ত সম্মত। তবে জীবিত নেক মানুষের দু'আর ওসীলা করে বা তাদের দিয়ে দু'আ করানোর মাধ্যমে আল্লাহ্র দরবারে নিজের আর্জি পেশ করার বৈধতা রয়েছে এবং এটি দু'আর একটি সিদ্ধ পন্থা। তাই যারা সিদ্ধপন্থা পরিহার করে ব্যক্তির জাতসত্তা বা মর্যাদার ওসীলায় বিশ্বাস করেন এবং বাস্তবে আচার-আচরণ দিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করেন, তারা প্রকৃতপক্ষে বিদ'আতী পন্থা অবলম্বন করার কারণে সীমালঙ্ঘণের অপরাধ করে শির্কে জড়িয়ে যাচ্ছেন। বিশিষ্ট ওলামাদের মতে সাধারণভাবে ওসীলা গ্রহণ ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত; তবে ব্যক্তির বিশ্বাস, অন্তরের অবস্থা ও আচরণের প্রেক্ষিতে এটা বড় শির্কেও রূপান্তরিত হতে পারে। সুতরাং নবী-রাসূল, পীর-মোর্শেদ, অলি-আউলিয়া তথা সুফী, দরবেশ কিংবা মৃত নেক নেক বান্দাদের জাতসত্তা, তাদের নাম, অধিকার ও মর্যদার ওসীলা গ্রহণ করা তথা ওসীলার অন্যান্য সকল বিভ্রান্তি থেকে মানুষকে সরে আসা উচিত। আর সীমালঙ্ঘণকারী না হয়ে বিশুদ্ধ পন্থায় এক আল্লাহ্র ইবাদত করে শির্কের অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাই সকলের জন্য বাঞ্ছনীয়।

দু'আ এবং শাফায়াত: শাফায়াত শব্দের অর্থ সুপারিশ। শরিয়তের পরিভাষায় কল্যাণ লাভ অথবা অকল্যাণ প্রতিহত করার নিমিত্তে অপরের জন্য মধ্যস্ড়তা করাকে শাফায়াত বলে। এটা হতে পারে দুনিয়াবী বিষয়ের সুপারিশ অথবা পরকালীন বিষয়ের সুপারিশ। তবে প্রচলিতভাবে মানুষ শাফায়াত বলতে পরকালীন সুপারিশকেই বুঝে থাকে এবং এ মর্মেই শাফায়াত শব্দটি সর্বজনবিদিত। শাফায়াত হচ্ছে রোজ কিয়ামতে মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি সুবর্ণ সুযোগ। তবে রোজ কিয়ামতে শাফায়াতের বিষয়টি থাকবে সম্পূর্ণ আলাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রাধীন। সেদিন কেবল তিনি ব্যতীত মানুষের জন্য অন্য কোন সাহায্যকারী বা সুপারিশকারী থাকবে না। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া সেদিন কেউ-ই কারো পক্ষে মুখ খোলার সাহসটুকুও পাবে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"যখন সেদিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবে না।

আল-কোরআন, সুরা হুদ-১০৫

শরিয়ত সম্মত শাফায়াতের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে:

- শাফায়াত কারীর উপর আলাহ্র সন্তুষ্টি থাকা।
- যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার উপরও আলাহ্র সন্তুষ্টি থাকা।

- শাফায়াতকারীর জন্য আলাহ্‌র পক্ষ থেকে শাফায়াত করার অনুমতি থাকা।

এই শর্তগুলি কোরআন মজীদে উলেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন,

"এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?"

আল-কোরআন, সুরা বাকারাহ-২৫৫

আকাশের ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে শাফায়াত সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

"আকাশে কত ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।"

আল-কোরআন, সুরা নাজম-২৬

কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

"যাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহ্‌র নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।"

আল-কোরআন, সুরা সাবা-২৩

পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে :

"তারা শুধু তারই জন্য সুপারিশ করতে পারে যার প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং তারা নিজেরাও তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।"

আল-কোরআন, সুরা আম্বিয়া-২৮

উল্লিখিত আয়াতগুলি থেকে বোঝা গেল যে, পরকালে শাফায়াতের বিষয়টি থাকবে সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রাধীন। সেখানে কেউ-ই নিজের মর্যাদা বা সম্মানের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ্‌র কাছে তার নিজের বা অন্যের জন্য সুপারিশ করা তো দূরের কথা, এদিনে কেউ তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন কথাই বলতে পারবে না। আকাশে রয়েছে আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভকারী অসংখ্য ফেরেশতা। এই ফেরেশতাদের মধ্যে কোন বড় ও মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতাও এই সাহস রাখেনা যে, আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন অপরাধীর জন্য সুপারিশ করে, এই ফেরেশতামণ্ডলী এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভকারী বান্দারা সবাই তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁপতে থাকবে। তবে দয়াময় আল্লাহ্ করুণার বশঃবর্তী হয়ে সে সময়ে মুমিনদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে শাফায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন। মহান আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দিবেন কেবল সে-ই সুপারিশ করতে পারবে এবং সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ সেদিন কারো উপকারে আসবে না। শাফায়াতকারীগণও আমভাবে সকলের জন্য শাফায়াত করার সুযোগ পাবেনা বরং আল্লাহ্ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন, কেবল তাদের জন্যই শাফায়াত করা যাবে। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, শাফায়াতের সকল বিষয় সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রাধীন।

কোরআন ও হাদিসের বর্ণনানুযায়ী যারা পরকালে শাফায়াতের অনুমতি পাবেন তারা হলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), অন্যন্য নবী ও রাসূলগণ, সিদ্দিকগণ, ফেরেশতাগণ, মুমিন নেক বান্দাগণ ও মুমিনের মৃত নাবালক শিশুগণ। তারা পাপী মুমিন বান্দদের জন্য আলাহ্‌র অনুমতি সাপেক্ষে জাহান্নামের আগুণ থেকে বের করে আনার সুপারিশ করবে।

রোজ কিয়ামতে শাফায়াতের মাধ্যমে অনেক তাওহীদবাদী মুমিন অথচ পাপী বান্দাগণ জাহান্নাম থেকে রেহাই পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করবে। তবে কাফির বা মুশরিক এবং যালিমদের জন্য শাফায়াত লাভের কোন সুযোগ থাকবে না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"যালিমদের জন্য কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে।"

আল-কোরআন, সুরা মোমেন-১৮

পরকালে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক শাফায়াতের বিষয়টি সর্বজনবিদিত। তবে এ শাফায়াতের মূল কথা হচ্ছে, রোজ কিয়ামতের দিন মানুষ যখন ঘোর বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকবে তখন মহান আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফায়াতের মাধ্যমে উম্মতের মধ্যে থেকে অনেকেই জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। এ প্রসংগে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"কিয়ামতের দিন মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা আদম (আঃ) এর কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। তিনি বলবেনঃ এ কাজের জন্য আমি নই। বরং তোমরা ইব্রাহিম (আঃ) এর কাছে যাও। কেননা তিনি হলেন আল্লাহ্‌র খলীল। তখন তারা ইব্রাহিম (আঃ) এর কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ আমি এ কাজের জন্য নই। তবে তোমরা মুসা (আঃ) এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করেছেন। তখন তারা মুসা (আঃ) এর কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ আমিতো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং ঈসা (আঃ) এর কাছে যাও। যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র রূহ এবং বাণী। তখন তারা ঈসা (আঃ) এর কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ আমিতো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ (সঃ) এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব আমিই এ কাজের জন্য। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমাকে প্রশংসা সম্বলিত বাক্য ইহ্‌লাম করা হবে যা দিয়ে আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করব, যেগুলি এখন আমার জানা নেই। আমি সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে ইয়া মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। চাও, তা দেয়া হবে। সুপারিশ কর গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত! আমার উম্মত! বলা হবে, যাও, যাদের হৃদয়ে যবের দানা পরিমান ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও। আমি যেয়ে এমনই করব। তারপর আমি ফিরে আসব এবং পুনরায় সে সব প্রশংসা বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে ইয়া মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। চাও, তা দেয়া হবে। সুপারিশ কর গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত! আমার উম্মত! অতঃপর বলা হবে, যাও, যাদের এক অনু কিংবা সরিষা পরিমান ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব।"

হাদিস, বোখারী শরীফ, নং-৭০০২

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক পরকালে উম্মতের জন্য শাফায়াতের বিষয়টি আরো অনেক সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, শাফায়াত কোন চাওয়ার বিষয় নয়; বরং নিজের যোগ্যতা এবং বিশুদ্ধ আমল দিয়ে তা অর্জন করতে হয়। তাই শাফায়াত প্রাপ্তির উপযুক্ত উপায় হচ্ছে, বিশুদ্ধ ঈমান নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করা অর্থাৎ সুন্নাত মোতাবেক আমলে সলেহ বা নেক আমল করা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করা, বিশেষতঃ মুয়াযযিনের আযান শেষে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর জন্য বেহেশতের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান ওসীলার জন্য দু'আ করা। কেননা হাদিসে এসেছে যে, কোন ব্যক্তি তাঁর জন্য

ওসীলার দু'আ করলে ঐ ব্যক্তির জন্য তাঁর শাফায়াত অবধারিত হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"যে আমার জন্য ওসীলা (জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান) প্রার্থণা করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

তাফসীর ইবনে কাসীর, ১৫ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৬০

শাফায়াতের শির্ক:

শাফায়াতের শির্ক বলতে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট পরকালের সার্বিক মুক্তির জন্য গ্রহণযোগ্য কোন সুপারিশ কামনা করাকে বুঝান হয়। শাফায়াতের বিষয়টি যখন সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইখতিয়ারে তখন আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য কারো কাছে এ জাতীয় সুপারিশ কামনা করা চরম মুর্খতা বৈ কিছু নয়। উপরন্তু তিনি ছাড়া অন্য কারো নিকট তা কামনা করা শির্ক। এতদসত্বেও মানুষ বিভিন্ন সময়ে গায়রুল্লাহর কাছে শাফায়াত কামনা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে এক শ্রেণীর আলেমদের মধ্যেও এর চর্চা পরিলক্ষিত হয়। তারা আবেগের বসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং পীর, অলি, আওলিয়া, দরবেশ প্রমুখের কাছে রোজ হাশরের কঠিন সময়ে তাদের শাফায়াত প্রাপ্তির কামনা করে থাকে। এজন্য তারা বিভিন্ন সময়ে অলি-আউলিয়ার মাজার জিয়ারত করে সরাসরি তাদের কাছেই প্রার্থণা করে থাকে। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা দরকার এ জাতীয় আচরণ সুস্পষ্ট শির্ক। তাই এহেন গর্হিত আচরণ থেকে সকলেরই বিরত থাকা উচিত।

শাফায়াত যদি চাইতেই হয় তবে তা একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই চাইতে হবে। রোজ কিয়ামতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফায়াতের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তবে তা নসীব হওয়ার জন্য চাই শির্ক মুক্ত আমল। বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে বলেছেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহ্র কাছে ওসীলার দোয়া করতে বলেছেন। সেখানে তিনি উম্মতের জন্য শাফায়াতের ওয়াদা করেছেন বটে, তবে তা নসীব হওয়ার জন্য তিনি তাঁর উম্মতদেরকে সরাসরি তাঁর কাছে শাফায়াত চাইতে বলেছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না; বরং শাফায়াত চাইতে হবে আল্লাহ্র কাছে–যেমনটি আমরা সাহাবীদের আমল দ্বারা জানতে পারি। হযরত তাউস হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন,

"হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর বড় শাফায়াত কবুল করুণ এবং তাঁর উচু দরজা উপরে উঠিয়ে দিন, তাঁর পারলৌকিক ও ইহলৌকিক চাহিদার জিনিস তাঁকে প্রদান করুণ।"

তফসীর ইবনে কাসীর, ১৫ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৬১

সাহাবাগণের আমলের মাধ্যমে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফায়াত নসীব হওয়া এবং তা কবুল করার বিষয়ে সরাসরি তাঁর কাছে দু'আ না চেয়ে দু'আ করেছেন আল্লাহ্র কাছে। এটাই শাফায়াতের দু'আর সুন্নাত পন্থা। শাফায়াত কবুল করার মালিক যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্, তাই অন্য কারো কাছে শাফায়াত যাঞ্চা না করে আল্লাহ্র কাছেই শাফায়াত চাইতে হবে। কিন্তু তা না করে বিদ'আতী পন্থায় আল্লাহ্ ছাড়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা

অন্য কারো কাছে শাফায়াত চাওয়া হলে সীমালঙ্ঘনের অপরাধ সংঘটিত হয়ে শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

জিকিরঃ

জিকির একটি আরবী শব্দ যার আভিধানিক অর্থ স্মরণ করা, মনে করা। শরিয়তের পরিভাষায় জিকির বলা হয়, মুখে বা অন্ড়রে আলাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা এবং প্রশংসা করা, পবিত্র কোরআন পাঠ করা, আলাহ্‌র নিকট প্রার্থণা করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করা এবং তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত ও সৃষ্টি নিয়ে চিন্ড়া-ভাবনা করা।

আমাদের সমাজে একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, আল্লাহ্‌র গুণ-গানের জন্য নির্ধারিত কিছু শব্দ যেমন 'সুবহান আল্লাহ্‌, আলহামদুলিল্লাহ্‌, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ ইত্যাদি কালেমাগুলি বার বার শুধু মুখে উচ্চারণ করাই হল জিকির। এগুলি নিঃসন্দেহে জিকিরের একটি উপায়, তবে এটাই জিকিরের শেষ কথা নয়। জিকির অত্যন্ড় ব্যপক অর্থবহ একটি বিষয়। তাসবিহ-তাহলীল থেকে শুরু করে জীবনের যাবতীয় মৌখিক এবং আত্মিক ইবাদত এবং আলাহ্‌কে খুশী করার জন্য তাঁর নির্দেশিত পন্থায় পরিচালিত সকল আচরণই জিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

এ সম্পর্কে ইমাম নববী (রহ) বলেন, "জিকির কেবল তাসবীহ, তাহলিল, তাহমীদ ও তাকবীর ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আলাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আনুগত্যের সাথে প্রত্যেক আমলই জিকির হিসেবে বিবেচিত।"

জিকিররের প্রকার, পদ্ধতি বা মাধ্যমঃ জিকির জিহ্বা দ্বারা হতে পারে, অন্ড়র দ্বারা হতে পারে বা একসংগে উভয়টা দ্বারাও হতে পারে। এর উপর ভিত্তি করে জিকিরকে তিনভাবে ভাগ করা যায়।

ক) জিকিরে লিসানি বা মৌখিক জিকির: জিকিরে লিসানি হচ্ছে সুবহান আলাহ্‌, আলহামদুলিল্লাহ্‌, আলাহু আকবার, লা-ইলাহা ইলালাহ্‌ প্রভৃতি তাসবিহ-তাহলিল মুখে মুখে উচ্চারণ করা। উচ্চারণের পাশাপাশি অবশ্য কলবেরও গভীর সংযোগ থাকতে হয়।

খ) জিকিরে কালবি বা আন্ড়রিক জিকির: জিকিরে কালবি হচ্ছে আন্ড়রিক স্মরণ তথা মনে মনে স্মরণ। মুমিন তার অন্ড়রে আলাহ্‌র স্মরণ সদা জাগ্রত রেখে এবং মনেপ্রানে আলাহকে অবিস্মৃত রেখে পার্থিব-অপার্থিব সব কাজ করতে পারে। যে কলবে আলাহ্‌র জিকির জারি থাকে সে কলব অনুক্ষণ প্রশান্ড়ময় থাকে।

গ) জিকিরে আমলি বা বাস্ড়ব কর্মের মধ্যে জিকির: জিকিরে আমলি হচ্ছে বাস্ড়ব কর্মের মধ্য দিয়ে আল-াহকে স্মরণ করা। এর মধ্যে অন্ড়র্ভুক্ত রয়েছে ফরয-নফলসহ সব ধরনের ইবাদত বন্দেগী। এ অর্থে নামাজ, রোজা, হজ্জ, ওমরা, দান-সাদকা, দোয়া-মোনাজাত প্রভৃতি সকল কিছুই আলাহ্‌র জিকিরের মধ্যে শামিল। আলাহ্‌র যাবতীয় আদেশ-নিষেধ বাস্ড়বায়ন করাও আলাহ্‌কে স্মরণ করার নামান্ড়র।

আমলের ধরণ বা কর্মপন্থা অনুযায়ী জিকির বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পন্থাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

- **কোরআন তিলাওয়াত**
- **সালাত সহ সকল ফরয ও নফল ইবাদতসমূহ**
- **তসবিহ-তাহলিল**
- **দৈনন্দিন সকল বৈধ কাজ-কর্ম**
- **অন্ড্র দিয়ে আলাহ্ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্ড্র করা।**

কোরআন তিলাওয়াতঃ কোরআন তিলাওয়াত জিকিরের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। কেননা তিলাওয়াতের মাধ্যমে যে তথ্য উৎঘাটিত হয় তা হল: ১. সকল কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্র– কোরআন এ সত্যের ঘোষণা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ২. একমাত্র এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্কে স্মরণ রাখার মূলমন্ত্র ও বার্তা বহন করে কোরআন। ৩. কোরআনের মূল সংশ্লিষ্টতা হলো আল্লাহ্কে স্মরণ রাখার জন্য আমাদেরকে সাহায্য করা। কোরআনই হল মানুষের মূল জীবন দর্শন। তাই কোরআন পাঠ করা মানেই আল্লাহ্কে জানা, আল্লাহ্র স্মরণ করা এবং আল্লাহ্র বন্দেগী করা।

সালাত হল সর্বোচ্চ মানের জিকির । আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর স্মরণের জন্য নিয়মিত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"আমিই আল্লাহ্, আমি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মা'বুদ নেই। অতএব শুধু আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর।"

আল-কোরআন, সুরা ত্বাহা, আয়াত- ১৪ ।

সালাতের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত থাকে। আর আল্লাহ্র মহত্ব, বড়ত্ব ও পবিত্রতার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্ভারে পরিপূর্ণ থাকে সালাত। সুতরাং আল্লাহ্র স্মরণে এর চেয়ে বড় ইবাদত আর কি হতে পারে? তাই নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের বাইরেও বেশী করে নফল সালাত আদায়ের প্রতি মনযোগী হওয়া আবশ্যক। সওম বা রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদতগুলিও আল্লাহ্র জিকিরের মধ্যে শামিল। এই ইবাদতগুলি আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশক জিকির। সুতরাং সকলেরই এই ফরয ইবাদতগুলি যথাযথভাবে পালন করার প্রতি যত্নশীল হওয়া একান্ড় আবশ্যক।

তাসবীহ্-তাহ্লিল আল্লাহ্র জিকিরের আর একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। তাসবিহ্-তাহলিলের মধ্যে সুবহান-আল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু-আকবর, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ইত্যাদি শব্দগুলি বার বার পঠিত হতে পারে। এই শব্দগুলি আল্লাহ্র পবিত্রতা, প্রশংসা, মহত্ব, বড়ত্ব এবং একত্বতা প্রকাশক শব্দ বলে তা আল্লাহ্র নিকট খুবই পছন্দনীয় ইবাদত। এই প্রক্রিয়ার জিকির একজন মানুষ নিয়মিত কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা সার্বক্ষণিকভাবেও করতে পারে। যেমন, একজন লোক অফিসে অবস্থানকালীন অবসর সময়ে, ব্যবসার অবসরে, হাঁটতে-হাঁটতে, গাড়ী চলাকালীন, শুয়ে-শুয়ে কিংবা কাজের মধ্যে থেকেও এ শব্দগুলি অনুচ্চস্বরে বা মনে মনে আওড়াতে পারে। এভাবে একজন মুমিনের সার্বক্ষণিক সংগী হয় আল্লাহ্র জিকির। কোন কাজের প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ্ বলা, কাজ শেষ করে বা কোন সুসংবাদ শুনে আলহামদুলিল্লাহ বলা, দুঃসংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন বলা, হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলা, শোয়ার পূর্বে দোয়া পড়া, ঘুম থেকে উঠে দোয়া পড়া, যাত্রার প্রাক্কালে আল্লাহ্র

উপর তাওয়াক্কুল করে যাত্রা শুরু করা ইত্যাদি আমল আল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক জিকিরের মধ্যে শামিল। কোরআন এবং সুন্নাহ্ মোতাবেক জিকিরের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ বা স্থান নির্ধারিত নেই বরং সার্বক্ষণিকভাবে সকল স্থানে এবং সকল অবস্থাতেই জিকির চালু রাখার বিধান রয়েছে। এর দলীল হিসেবে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বুসর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"তোমার জিহ্বাকে সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র যিক্‌রে সিক্ত রেখ।"

তফসীর ইবনে কাসীর, ১৫ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮১৫

জিকির যেমন একাকী করা যায়, আবার সংঘবদ্ধ হয়ে বা দলবদ্ধভাবেও করা যায়। কোরআনের আলোচনা, হাদিসের আলোচনা, আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের আলোচনা, কবীরা গুনাহ বা শির্‌কের আলোচনা সহ যে কোন ধরনের ইসলামী আলোচনা জিকির হিসেবে বিবেচিত এবং এটা দলগত জিকিরের মধ্যে শামিল। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেই এর ফায়দা পেয়ে থাকেন। আবার দলগতভাবে তাসবিহ-তাহলীল পাঠ করেও আল্লাহ্‌র জিকিরে রত থাকা যায়। তবে যে বিষয়টির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন ভাবেই জিকিরের আদব লঙ্ঘীত না হয়। আল্লাহ্ নিজেই মানুষকে জিকিরের আদব শিখিয়ে দিয়েছেন,

"তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি কখনো উদাসীন হবে না।"

আল-কোরআন, সুরা আরাফ, আয়াত- ২০৫।

এ আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, বিনয়ের সাথে আশা ও ভয়ের সংমিশ্রনে প্রতিপালককে স্মরণ করতে হবে। মনে মনে এবং মুখে উচ্চারণ করে আল্লাহ্‌কে ডাকা যায়। তবে মুখে আল্লাহ্‌কে ডাকতে হবে আদবের সাথে অনুচ্চস্বরে বা নিম্নস্বরে। উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে বা হৈ-হুল্লোড় করে ডাকা যাবে না। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু মুসা আশআারী (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, কোন এক সফরে জনগণ উচ্চ শব্দে দু'আ করতে শুরু করে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

"হে লোক সকল! নিজেদের উপর দয়া প্রদর্শণ কর। তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না, যাঁকে ডাকছো তিনি শুনতে রয়েছেন এবং তিনি নিকটে রয়েছেন।"

তফসীর ইবনে কাসীর, ৮ খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৯৩

আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন ও শোনেন এবং তাঁর জ্ঞান সবকিছু বেষ্টন করে আছে। তিনি মানুষের অন্তরের কথাও ভালভাবে ওয়াকিবহাল আছেন। তাই নিম্নস্বরে জিকির করাই সমীচীন এবং যুক্তিযুক্ত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিকটেই আছেন, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী, কোন আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, তখনই আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি।"

আল-কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত- ১৮৬।

কিন্তু আমাদের সমাজের বাস্তবতায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জিকিরের আদব নিয়ে বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। পাঁড়া-মহল্লায় মসজিদ ভিত্তিক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জিকির অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দলগতভাবে অতি উচ্চস্বরে এবং বিশেষ ভঙ্গিমায় জিকির করতে দেখা যায়। আবার মাইজভান্ডারীর

দল সহ অন্যান্য আনেক দল জলসা করে অতি উচ্চস্বরে চিৎকার করে বিভিন্ন কায়দায় জিকির করে থাকে। কিন্তু এধরনের আচরণ আল্লাহ্‌র নিকট কতটা গ্রহনযোগ্য তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কোরআনের আলোকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এজাতীয় আচরণ জিকিরের আদবের পরিপন্থী বলেই প্রতিয়মান হয়। তবে শেষ কথা, এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

দৈনান্দিন আমলের মধ্যেও আল্লাহ্‌র জিকির থাকতে হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জিকির শুধু মুখে উচ্চারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার বিষয় নয়, এর সম্পর্ক হতে হয় অন্তরের সাথে এবং এর বহিঃপ্রকাশ থাকতে হয় দৈনান্দিন কাজ-কর্মের মধ্যে। তাই শুধু মুখে জিকির করা হল কিন্তু বাস্তব আমলের মধ্যে এর প্রতিফলন থাকল না, তবে সে জিকির অর্থহীন হয়ে পড়বে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল ভাল কাজই জিকির হিসেবে গণ্য হতে পারে যদি তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর নির্দেশিত পন্থায় করা হয়ে থাকে। যখন একজন লোক সচেতন মনে কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় বা নিয়ত করে কারণ তা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল নির্দেশ করেছেন বা সে কাজের জন্য অনুমোদন দিয়েছেন; অথবা সে কাজটি পরিত্যাগ করে কারণ তা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন বা নিরুৎসাহিত করেছেন– তাহলে সে লোকটি সচেতন মনে আল্লাহ্‌র জিকির করছে। এভাবে একজন মানুষ আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করে এবং নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে নিজেকে সার্বক্ষণিক আল্লাহ্‌র জিকিরে নিয়োজিত রাখতে পারে। উদাহরণসরূপঃ একজন ঈমানদার ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র স্মরণে সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, কোরবানী সহ সকল প্রকার ইবাদত পালন করে থাকে এবং দু'আ-প্রার্থণা ও ইস্তিগ্ফার করে, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে। আবার ঠিক একই কারণে সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, মিথ্যা কথন সহ সকল প্রকার নিষিদ্ধ কাজগুলি থেকে নিজেকে বিরত রাখে। এগুলি সবই সার্বক্ষণিক আল্লাহ্‌র জিকিরের পরম দৃষ্টান্ত। আলাহ্‌র দ্বীনকে জানার জন্য জ্ঞানার্জন করা ও অপরকে শিক্ষাদান করাও জিকির হিসেবে গণ্য।

অন্তর দিয়ে আলাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা: এটা অন্যতম বড় জিকির। আলাহ্‌ তা'আলা বলেন,

"নিঃসন্দেহে আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টিতে এবং দিবস ও রাত্রির আবর্তনের মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য, যারা দাড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় আলাহ্‌ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এগুলি নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, অতএব তুমি আমাদের জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নিস্কৃতি দাও।"

আল-কোরআন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯০-১৯১।

জিকিরের গুরুত্ব ও ফজিলত:

আলাহ্‌র জিকির হল সর্বোত্তম ইবাদত। জিকিরের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কোরআনে জিকির শব্দটি বহুবার বিভিন্ন যায়গায় ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্‌র হেদায়েত প্রাপ্তি তথা হেদায়েতের উপর বহাল থাকার জন্য জিকির অত্যবশ্যকীয়। জিকির থেকে গাফেল হয়ে গেলে মানুষ বিপথগামী হয়ে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র স্মরণে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানই মানুষকে সৎ পথ থেকে বিরত রাখে, অথচ

মানুষ মনে করে তারা বুঝি সঠিক পথের ওপরই রয়েছে।"

আল-কোরআন, সুরা যুখরুখ, আয়াত-৩৬-৩৭।

ইরশাদ হচ্ছে, যে দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণে বিমুখ হয় ও অবহেলা প্রদর্শন করে, তার উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে এবং তার সার্বক্ষণিক সংগী হয়ে যায়। শয়তান তাকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে এবং তার অন্তরে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তার নীতি খুব ভাল এবং সে সম্পূর্ণ সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাই শয়তানের কু-মন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে জিকির এর বিকল্প নেই। মানুষ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলে আল্লাহ্‌ তার প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্‌ বলেন,

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করব। তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় কর এবং কখনো তোমরা আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"

আল-কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত- ১৫২।

এখানে মানুষদেরকে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য নির্দেশ দিয়ে প্রতিদানে তাদেরকে স্মরণ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এর ভাবার্থ হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র দেয়া নির্দেশাবলী পালন করে তাঁর দিকে ঝুকে থাকে, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং নি'য়ামতসমূহ দান করেন। আর অকৃতজ্ঞদের কাছ থেকে তিনি তাঁর ক্ষমা ও রহমত উঠিয়ে নেন। আল্লাহ্‌র জিকির কি পরিমান এবং কিরূপ হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে,

"(এই জ্ঞানবান লোক তারা) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের এই সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে (এবং বলে), হে আমাদের মালিক এর কোন কিছুই তুমি অযথা বানিয়ে রাখোনি, তোমার সত্তা অনেক পবিত্র, অতএব তুমি আমাদের জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে নিস্কৃতি দাও ।"

আল-কোরআন, সুরা আলে-ইমরান, আয়াত- ১৯১।

কোরআনের অন্যত্র বর্ণিত আছে,

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করবে।"

আল-কোরআন, সুরা আহযাব, আয়াত- ৪১-৪২।

এখানে আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে প্রথমে জ্ঞানবানদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যে, তারা উঠতে, বসতে এমনকি শায়িত অবস্থায়ও অর্থাৎ সকল সময়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে থাকে। এর মধ্যে সকল মানুষের জন্য যে দর্শন লুকিয়ে আছে তা হল, কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন না থেকে সর্বক্ষণ অন্তরে ও মুখে আল্লাহ্‌র স্মরণ আবশ্যক। আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করাও আল্লাহ্‌র জিকিরের মধ্যে শামিল। এর মধ্যে দিয়েই মূলত মহান আল্লাহর কুদতের নিদর্শন তথা তাঁর প্রজ্ঞা, বড়ত্ব ও মহত্বের পরিস্ফুটন হয়। একজন মোমেন যখন নিজেকে এ কাজে নিয়োজিত রাখে তখন তা হতে পারে উৎকৃষ্ট এবং সার্বক্ষণিক জিকির। আবার দ্বিতীয় আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলতে মূলত দিবস ও রাত্রির অধিকাংশ সময়কেই পরিবেষ্টিত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষের অধিকাংশ সময় যখন বিভিন্ন কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বানিজ্য, অফিস-আদালতে এবং ঘুমের মধ্যে কাটে, সেক্ষেত্রে সর্বক্ষণ কিভাবে আল্লাহ্‌র জিকির করা যায়? কিন্তু কাজটা যে খুবই সহজ তা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে। স্বাভাবিক জীবন যাত্রার মধ্যে দিয়েই সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র স্মরণ সম্ভব। মানুষের মনের দু'টি অবস্থা আছে; একটি সচেতন মন এবং অন্যটি অবচেতন মন। মানুষের প্রতিটি কর্ম তার সচেতন মনের মাধ্যমে হয়ে থাকে,

তখন অন্য অনুভুতি থাকে অবচেতন স্তরে। তাই প্রতিটি কাজই সচেতন মনে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় এবং আল্লাহ্‌র স্মরণের সাথে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করার মন-মানসিকতা নিয়ে কাজটি শুরু করা উচিত। এই নিয়তটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ- কেননা এ নিয়তই আল্লাহ্‌র জিকিরের উপায় হয়ে থাকে। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ ঘোষিত কাজ তাঁর স্মরণ নিয়ে করাও বৈধ নয়। আবার মানুষ যখন ঘুমোতে যায় তখন আল্লাহ্‌র জিকির করে এবং তাঁর ইচ্ছার উপর নিজেকে সপে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় তাহলে ঘুমের অবস্থায়ও সে আল্লাহ্‌র স্মরণে আছে বলে ধরে নেয়া হয়। এভাবে মানুষ যখন সচেতন মনে আল্লাহ্‌র জিকির করে তখন অন্যান্য কাজ-কর্মের সময়ও তার অবচেতন মনে এর প্রতিক্রিয়া থাকে। মোটকথা, মানুষের সচেতন মনে আল্লাহ্‌র স্মরণ তার অবচেতন মনের জিকিরের পরিপূরক হয়ে যায়। এভাবেই নিজেকে সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র জিকিরে নিয়োজিত রাখা সম্ভব। জিকিরের মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রভুত কল্যান ও ফজিলত। নিম্নে কয়েকেটি বিবরণ দেওয়া হল:

- আল্লাহ্‌র জিকির সবচেয়ে বড় ও সর্বোত্তম ইবাদত: কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে স্মরণ করা হচ্ছে আসল লক্ষ্য। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,

  "আর আল্লাহ্‌র স্মরণইতো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তা জানেন।"

  আল-কোরআন, সুরা আনকাবুত, আয়াত- ৪৫।

- জিকিরে অন্তরে প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,

  "জেনে রাখ আল্লাহ্‌র জিকিরই অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করে।"

  আল-কোরআন, সুরা রাদ, আয়াত- ২৮।

- আল্লাহ্‌র জিকির সুরক্ষিত দূর্গ। বান্দা এ দ্বারা শয়তান থেকে রক্ষা পায়।
- জিকির মানুষের ইহকাল ও পরকালের মর্যদা বৃদ্ধি করে।
- জিকিরের কারণে মানুষের জীবিকা বৃদ্ধি পায়।
- আল্লাহ্‌ তা'আলার জিকির এমন এক মজবুত রজ্জু যা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করে এবং তাঁর সান্নিদ্ধ লাভের পথ সুগম করে।
- আল্লাহ্‌র জিকির মানুষকে সরল ও সঠিক পথের উপর অবিচল রাখে।

জিকিরের মাধ্যমে কি ভাবে শির্‌ক সংঘটিত হয়?

জিকির আল্লাহ্‌ ও তাঁর বান্দার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন। জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু এক আল্লাহ্‌র স্মরণের পরিবর্তে যদি গায়রুল্লার স্মরণ করা হয়, তাহলে শির্‌ক সংঘটিত হয়। যারা নিয়মিত আল্লাহ্‌র জিকির করে না, শয়তান তাদের সংগী হয়ে নানা রকম অপকর্ম করার কুমন্ত্রণা দেয়। শয়তান তাকে গায়রুল্লাহর জিকির করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই মানুষ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যান্য সত্তা যেমন, পীর, অলি, গাউস, কুতুব, দরবেশ, দেব-দেবী, জ্বিন, ভূত-প্রেত ইত্যাদির জিকির করে শির্‌কে পতিত হয়। এদের সাথে বিভিন্ন উপায়ে মানুষ শির্‌ক করে থাকে। উদাহরণসরূপঃ বিপদে পড়ে বা স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ 'ইয়া গাইস!' 'ইয়া খাজা!' বাবা খান-জাহান! বাবা শাহ-জালাল! ইত্যাদি নাম যপে সংশ্লিষ্ট পীর-অলিদের স্মরণ করে থাকে সাহায্য পাবার আশায়। এমনকি অনেককে

পীর-আউলিয়ার মাজারে সিজদা পর্যন্ড় করতে দেখা যায়। অনেক সময় মানুষ নবী-রাসূলদের নাম স্মরণ করে থাকে বিভিন্ন প্রয়োজন কালে। আবার বিভিন্ন প্রকার রোগ-বালাই চিকিৎসার নামে ওঝা বা ফকিরের মাধ্যমে মন্ত্র-তন্ত্র বলে জ্বীন, ভূত-প্রেত বা অশুভ আত্মার জিকিরের মাধ্যমে তদবীর করা হয়। এছাড়াও প্রচলিত ধারণায় কলেরা ও বসন্ত রোগের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কলেরা ও শীতলা দেবীর হাত রয়েছে ভেবে এদের জিকিরের মাধ্যমে তদবীর করা হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় মানুষ খোয়াজ-খিযির বা গাজীকালুর নামের দোহাই পড়ে বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের প্রচেষ্টা করে থাকে। এধরনের সকল আচরণ দিয়ে গায়রুল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র শরীক স্থাপন করা হয়ে থাকে। আলাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো ধ্যান করা বা অন্য কারো নাম যপ করা অথবা আলাহ্‌র নামের সাথে একত্রিত করে অন্য কারো নাম যপ করা এ প্রকার শির্‌কের অন্ড়র্ভুক্ত।

খ) অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক ইবাদতঃ

মানুষের গোপন অঙ্গ অন্তরের মাধ্যমে কিছু ইবাদত সম্পাদিত হয়, সেগুলি আত্মিক বা অভ্যন্তরীণ ইবাদত হিসেবে বিবেচিত। এসকল ইবাদতের মাধ্যমেও শির্‌ক সংঘটিত হতে পারে। বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায় যে, বাহ্যিক ইবাদতে শির্‌ক করার তুলনায় আত্মিক ইবাদতের মাধ্যমে শির্‌ক সংঘটিত হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশী। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, বাহ্যিক ইবাদতের শির্‌ক সুস্পষ্ট এবং বোধগম্য কিন্তু আত্মিক ইবাদতের মাধ্যমে সংঘটিত শির্‌ক সহজে দৃষ্টিগোচর হয়না বা বোধগম্য হয় না এবং তা অনেকটা মনের অজান্তেই ঘটে থাকে। এ শির্‌ক থেকে রেহাই পেতে তাই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার এবং সেই সাথে এ শির্‌ক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। অন্তরের গোপন উপাসনাগুলির মধ্যে রয়েছে- ভালোবাসা, কামনা-বাসনা, আনুগত্য ও অনুসরণ, ভয়, ভরসা ইত্যাদি। এখানে প্রতিটি বিষয়ের উপর সংক্ষেপে আলোচনা করে এসকল ইবাদতের সাথে শির্‌কের সংশ্লিষ্টতা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হল।

ভালোবাসা

মহব্বত, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ইত্যাদি 'ভালোবাসা'র সমার্থবোধক শব্দ। তবে ভালোবাসার প্রধানতঃ দু'টি দিক রয়েছে।

এক) সাধারণ ভালোবাসা: যে ভালোবাসা স্বাভাবিক ভাবেই হতে পারে কোন ব্যাক্ত, বস্তু বা জিনিসের প্রতি। এ প্রকারের ভালোবাসা আবার বিভিন্ন প্রকার হতে পারেঃ

- প্রকৃতিগত ভালোবাসা: যেমনঃ আহারের জন্য ক্ষুধার্তের ভালোবাসা। এভাবে পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য এবং বিভিন্ন বস্তুর প্রতিও মানুষ স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করে থাকে।
- স্নেহ, মায়া-মমতা জাতীয় ভালোবাসা: যেমনঃ সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা। এভাবে মানুষ তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের বা অন্যকারো প্রতি মায়া-মমতার আকর্ষণ অনুভব করে থাকে।
- আসক্তিগত ভালোবাসা: যেমনঃ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা।

উল্লিখিত প্রকারের ভালোবাসা স্বাভাবিক পর্যায়ের সাধারণ ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত–যা ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়না। এ প্রকারের ভালোবাসার মাধ্যমে শির্‌ক সংঘটনের সম্ভাবনা নেই। তবে এ সকল ভালোবাসাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার ভালোবাসার উপর কোনভাবেই প্রাধান্য দেয়া যাবেনা।

- দুই: বিশেষ ধরনের ভালোবাসা: এটা এমন জাতীয় ভালোবাসা যেখানে অসাধারণ বিনয়, অভুতপূর্ব সম্মান, অধীনতা ও আনুগত্যের সংমিশ্রণ থাকে। তখন এ ভালোবাসা ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়। কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিকোণে এ জাতীয় ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আর জন্যই হতে হবে। অন্য কারো জন্য নয়।

আল্লাহ্কে ভালোবাসার অর্থ হল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অনীত সকল বিধি-বিধানসমূহ পরিপূর্ণরূপে এবং আন্ড়রিকতার সাথে পালন করা। যত ক্ষতিই হোক না কেন, আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করতে হয় নিজের জীবন দিয়ে বা প্রিয়জনের জীবনের বিনিময়ে হলেও। আল্লাহ্র ভালোবাসার উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখিয়ে গেছেন বিভিন্ন যুগে আল্লাহ্র নবী-রাসূলগণ। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্র আদেশ পালনের স্বার্থে তার প্রাণপ্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে কোবানী করার সকল প্রস্তুতি সমাপ্ত করে আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা নিবেদনের পরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার এ ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত প্রতিটি মুসলিম হৃদয় আজও কোরবানী করে ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে যাচ্ছে। হযরত আইয়ুব (আঃ) সুদীর্ঘ আঠার বছর কঠিন পচন রোগের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্র উপর তার নির্ভরশীলতার কমতি হয়নি বা কখনই বিরক্তি সূচক কোন বাক্য তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়নি। এভাবে আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের এক জ্বলন্ত নিদর্শন রেখে গেছেন তিনি উত্তরসুরিদের জন্য। কিন্তু জীবনের বাস্তবতায় দেখা যায় যে, মানুষ অতি অল্প শোকে বা দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হলেই হতাশ হয়ে পরে এবং ধৈর্যহারা হয়ে আল্লাহ্র প্রতি বিরক্তি প্রকাশক নানা প্রকার বাক্য উচ্চারণ করতে থাকে। এ ধরনের আচরণ আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত।

আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসার নিদর্শণ সমূহ:

আল্লাহ্র প্রতি যথাযথ ভালবাসা বিদ্যমান আছে কিনা তা বোঝার জন্য কতিপয় নিদর্শন বা উপায় রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

ক) আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাকে নিজ ইচ্ছার উপর প্রাধান্য দেয়া।

খ) সকল বিষয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনিত বিধান মেনে চলা। আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য কোরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরনের কোন বিকল্প নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

"তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তা'আলাও তোমাদেরকে ভলোবাসবেন এবং তোমাদের গুণাহখাতা মাফ করে দেবেন।"

আল-কোরআন, সুরা আলে-ইমরান, আয়াত- ৩১।

এ আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করার তাকীদ রয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণের মাধ্যমে তাকে ভালোবাসাই মূলতঃ আল্লাহর দাসত্ব প্রকাশের ভালোবাসা। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসার দাবীতে সত্যবাদী হয় তবে তাকে অবশ্যই রাসূলের সুন্নতের উপর আমল করে এর প্রমাণ দিতে হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নতের অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার দাবী ভিত্তিহীন এবং অগ্রহণযোগ্য। কেউ যদি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নতের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্কে ভালোবাসে, বিনিময়ে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন এবং তাদের অপরাধগুলি ক্ষমা করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি

মানুষের ভালোবাসার স্বরূপ হচ্ছে, সে ভালোবাসা নিজ সত্তা, নিজ সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা বা অন্য সকল মানুষ, সৃষ্টজীব ও সৃষ্ট বস্তুর প্রতি ভালোবাসার চেয়ে অধিক হবে। আল্লাহর প্রতি ভালবাসার দাবীতে মানুষ প্রয়োজনে নিজের সবকিছু বিসর্জন দিতেও দ্বিধা বোধ করবে না; কেননা এটাতো বিশেষ ধরনের আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশের ভালোবাসা। এ জাতীয় ভালোবাসা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকোন মানুষ বা কোন বস্তুর জন্য হতে পারে না।

গ) সকল ইমানদারের প্রতি দয়াবান ও অনুগ্রহশীল হওয়া।

ঘ) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করা। আল্লাহ্ তায়ালা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব বা হৃদ্যতা বজায় রাখতে নিষেধ করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"হে ইমানদারগণ! তোমরা মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না ।"

আল-কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত- ১৪৪ ।

নিজের পিতা-মাতা বা ভ্রাতৃগণও যদি কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলেও তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"হে ইমানদারগণ! যদি তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা কখনো ঈমানের মোকাবেলায় কুফরীকেই বেশী ভালোবাসে, তাহলে তোমরা এমন লোকদের কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমাদের মধ্য থেকে যারা ওদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তারা অবশ্যই যালিম।"

আল-কোরআন, সুরা তাওবা, আয়াত- ২৩ ।

ঙ) আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুখ, হাত, জান ও মালের মাধ্যমে তথা সার্বিকভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা।

ভালোবাসার শির্ক: ভালোবাসার শির্ক বলতে দুনিয়ার কাউকে এমনভাবে ভালোবাসাকে বুঝান হয় যাতে তার আদেশ-নিষেধকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধের উপর প্রাধান্য দেয়া হয় অথবা সমপর্যায়ের মনে করা হয়। তাতে অভূতপূর্ব সম্মান, অধীনতা ও আনুগত্যের সংমিশ্রণ থাকে। এ জাতীয় ভালোবাসা শুধু আল্লাহ্র জন্য প্রযোজ্য, সৃষ্টির অন্য কারো জন্য নয়। সৃষ্টির প্রতি এ ধরনের ভালোবাসা নিবেদন করা হলে তাই শির্ক সংঘটিত হয়।

ভালোবাসা ইবাদত হিসেবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব প্রকাশের ভালোবাসার ক্ষেত্রে যদি কেউ সৃষ্টসত্তা বা সৃষ্টবস্তুর প্রতি এ ধরনের ভালোবাসা নিবেদন করে তবে সে ঐ সত্তা বা বস্তুকে আল্লাহ্র সমকক্ষ করে নিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

"মানুষের মাঝে এমনও কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ্র একাধিক সমকক্ষ নির্ধারণ করে তারা তাদেরকে এমনি ভালোবাসে যেমনটি আল্লাহ্কে ভালবাসা উচিত। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনে তারাতো তাঁকেই সর্বাধিক পরিমানে ভালোবাসে। যারা বাড়াবাড়ি করছে তারা যদি আল্লাহ্র আযাব স্বচক্ষে দেখতে পেত তবে বুঝত যে, সমুদয় শক্তি আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।"

আল-কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত- ১৬৫ ।

এ আয়াতে আল্লাহ্ অংশীবাদীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, তারা অন্যদেরকে আল্লাহ্র সদৃশ্য স্থির করে থাকে এবং তাদের সাথে এমন আন্তরিক ভালোবাসা স্থাপন করে যেমন ভালোবাসা কেবলমাত্র আল্লাহ্র তা'আলার সাথে স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র প্রতি প্রকৃত মুমিনদের প্রেম দৃঢ়তর হয়ে থাকে অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সাথে তাদের এরূপ ভালোবাসাও নেই এবং তারা আর কারও কাছে প্রার্থণাও করে না। অতঃপর আল্লাহ্ ঐসব লোকদের শাস্তির সংবাদ দিচ্ছেন যারা গায়রুল্লাহ্কে আল্লাহ্র সমকক্ষ নির্ধারণ করে শির্কের মাধ্যমে নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করেছে। মানুষের ইচ্ছাশক্তি যদি স্বর্গীয় ভালোবাসায় পরিণত হয় তবে সেটা হয় ইবাদত, আর ইচ্ছাশক্তি যদি অন্যকিছুর বিশেষ আকর্ষণে পরিণত হয় তখন সেটা হয় অপশক্তির আরাধনা। কারো প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জন্য তার আনুগত্য বা অনুসরণের মাধ্যমে যদি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ লঙ্ঘীত হয় অথবা আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অমান্য করে যদি অন্য কারো নির্দেশ পালন করা হয়, তাহলে সেটা শির্ক হবে।

আনুগত্য ও অনুসরণ যখন ভালোবাসার সীমা নির্ধারণের মাপকাঠি তখন ভালোবাসার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে শির্ক করার প্রবনতা সহজেই পরিমাপ করা সম্ভব। কোন ব্যক্তি বা কোন মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা থাকাটাই স্বাভাবিক, তবে এ ভালবাসার একটা নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। সীমালঙ্ঘণ করা হলে অর্থাৎ এদের প্রতি সাধারণ ভালোবাসার পরিবর্তে অসাধারণ বা বিশেষ প্রকারের ভালোবাসা নিবেদন করা হলে শির্ক সংঘটিত হবে। একজন খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি শির্ক মুক্ত থাকার জন্য সর্বক্ষণই অতি সাবধানে পরিমাপ করে জীবনের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ঈমানের কমজোরী এবং অজ্ঞতার কারণে সাধারণ আর বিশেষ ভালোবাসার সীমা নির্ধারণ করতে সক্ষম নন। তাই তারা শির্কের মত চরম অপরাধসমূহ করে থাকেন নির্বিকারে। এভাবেই তারা আল্লাহ্র প্রতি যেমন আনুগত্যের ভালোবাসা নিবেদন করা হয়, তেমন ভালোবাসা অন্য কারো বা কোনো বস্তুর প্রতি নিবেদনের মাধ্যমে তাদেরকে অতি উচ্চ মর্যাদা প্রদান করে আল্লাহ্র সমকক্ষ নির্ধারণ করে ফেলে– যা এক ধরনের ভালোবাসায় ইবাদতের শির্ক। উদাহরণসরূপঃ এক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা না করে কোন ধর্মীয় গুরু, বুজুর্গ ব্যক্তি, সমাজপতি বা রাজনৈতিক নেতার নির্দেশ পালন করতে এমন ব্যতিব্যস্ত থাকেন যেন প্রয়োজনে তাদের জন্য নিজের সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নন। এ ধরনের আচরণের মাধ্যমে তাদের প্রতি ভালোবাসাকে আল্লাহ্র বিশেষ ভালোবাসার সমকক্ষ বানিয়ে নেয়ার ফলে শির্ক সংঘটিত হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিদের প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘিত হলে শির্ক সহ অন্যান্য বড় ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সন্তান-সন্ততি মানুষের জন্য পরীক্ষা সরূপ। আল্লাহ্ বলেন,

"তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার । অতএব তোমরা সাধ্য মোতাবেক আল্লাহ্কে ভয় কর।"

আল-কোরআন, সুরা তাগাবুন, আয়াত-১৫-১৬।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন – এগুলি পেয়ে কে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁর আনুগত্য করে আর কে এগুলির মহব্বতে পড়ে আল্লাহ্র স্মরণে উদাসীন হয়ে পড়ে বা তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। যে কেহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার সামনে পরাজয় বরণ না করবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রয়েছে মহান প্রতিদান। আর যারা আল্লাহ্র ভালবাসার সামনে এগুলির প্রতি

ভালবাসাকে প্রধান্য দিবে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে কোরআনের আর একটি আয়াত এখানে প্রণিধানযোগ্য:

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন না করে– যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।"

আল-কোরআন, সুরা মুনাফিকুন, আয়াত-৯।

এখানে বলা হয়েছে যে, মানুষ যেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রেমে পড়ে আল্লাহ্‌কে ভুলে না যায়। স্ত্রী ও সন্তানদের প্রয়োজন ও আবদার পূর্ণ করতে গিয়ে তারা যেন কোন ভাবেই দ্বীন-ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি উদাসীন না থাকে। তবে অনেকেই স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে এবং সম্পদের প্রেমে অন্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ খুব কমই করে, এমনকি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে বসে। এভাবে তাদের প্রেমে পড়ে আহকামে ইলাহীকে হীনমূল্যায়িত করে পৃষ্ঠের পিছনে ফেলে দেয়। তখন সেই আল্লাহ্‌ বিমুখতাই পরিনামে আখিরাতে তার শাস্তির কারণ হয়ে থাকে।

সমাজের যারা সন্তান-সন্ততির প্রতি ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে তাদের কৃত অপরাধগুলি উপেক্ষা করে থাকেন বা স্বজনপ্রীতির কারনে তাদের অন্যায় ও উশৃংঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করতে দ্বিধা বোধ করেন না, তারা প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসার ইবাদতে আল্লাহ্‌র শরীক স্থাপন করার অপরাধে লিপ্ত রয়েছেন।

ধন-সম্পদ (Money) এর মোহ বা সম্পদের প্রতি অত্যাধিক ভালবাসা মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে বিপথগামী করে ফেলতে পারে। দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ যতক্ষণ মানুষের অন্তরে প্রাধান্য বিস্তার না করে, ততক্ষণ তা মানুষের ইহকাল ও পরকালের জন্য উপকারী ও সহায়ক। পক্ষান্তরে অর্থ-সম্পদ যদি মানুষের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবেই তার অন্তরের মৃত্যু ঘটে এবং তখন মানুষ এগুলির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে স্রষ্টাকে ভুলে যায়। তখন শয়তান তার দোসর হয়ে যায় এবং ধন-সম্পদকে তার দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেয়। সে মনে করে একমাত্র অর্থ-সম্পদই তাকে সুখ দিতে পারে এবং সকল আরাম-আয়েসের ব্যবস্থা করতে পারে। টাকা-কড়ির জন্য অত্যধিক ভালবাসা বা আসক্তি প্রকারান্তে ধন-সম্পদের উপাসনা বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই মানুষ অর্থ-সম্পদের পূজারী হয়ে যায়। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদকেই সে তখন তার ইলাহ্‌ বানিয়ে নেয়। কেননা বান্দা ও আল্লাহর মাঝে যদি অন্যকিছুর ভালবাসা স্থান পায় তাহলে সে বস্তুর ইবাদতই করা হয়। এভাবে অর্থ-সম্পদ (Money) একজন ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারে। সম্পদের ভালবাসায় মত্ত হয়ে মানুষ যখন অর্থ উপার্জন এবং তা ব্যায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধকে অমান্য করে হলে তখন সেটা বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং ভালবাসার ইবাদতে সম্পদ তখন আল্লাহ্‌র একজন প্রতিদ্বন্দী দাঁড় হয়ে শির্‌কের মত কঠিন অপরাধ সংঘটিত করে। সম্পদের নেশায় মানুষ যখন বিভোর থাকে, সম্পদ অর্জনই তখন তার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে যায়। সম্পদ অর্জনের জন্য তাই সে দিশেহারা হয়ে যায় এবং হারাম-হালাল তথা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন অবৈধ পন্থা বা আল্লাহ্‌ ঘোষিত নিষিদ্ধ পন্থার আশ্রয় নেয়। যেমন সুদ, ঘুষ, প্রতারনা, যুলুম, সন্ত্রাস ইত্যাদি সহ অন্যান্য অপরাধ মূলক কাজকে অর্থোপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে নেয়। এভাবে মানুষ ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আরোপিত সীমা অতিক্রম করে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে পাপে লিপ্ত হচ্ছে। কম-বেশী সমাজের অধিকাংশ পেশার মানুষের মাঝে এর সংশ্লিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরনস্বরূপ, একজন শিক্ষক, আইনজীবি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিচারক, চাকুরিজীবি, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, ঠিকাদার, শ্রমজীবি প্রভৃতি সহ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ কম-

বেশী কোন না কোন ভাবে এ পাপের সাথে জড়িত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, নাহক পন্থায় অর্জিত অর্থ কোন ভাবেই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, উপরন্তু তা শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে একটি হাদিস প্রনিধানযোগ্য। আলী ইবনে হুজর (রাঃ) বর্ননা করেছেন, নবী ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি সম্পদ নিষিদ্ধ পন্থায় উপার্জন করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ভক্ষণ করে কিন্তু তৃপ্তি লাভ করে না; বরং রোজ কিয়ামতে এই সম্পদ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।"

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ-২২৯২।

সুতরাং সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে ন্যায়, সততা ও আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত নির্ধারিত সীমা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। সেই সাথে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ হক ও অধিকারের সীমা অতিক্রম না করার প্রতি যত্নশীল থাকা আবশ্যক। প্রত্যেককেই গভীরভাবে চিন্তা করা নেয়া উচিত যে তার উপার্জনের সকল উৎস যুলুম অথবা অপবিত্রতা বর্জিত কিনা। যদি কোন প্রকার না-হক পন্থার সাথে কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা থাকে, তবে সেটা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।

মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই। তবে একজন প্রকৃত ঈমানদার বা আল্লাহ ভীরু ব্যক্তি অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। কেননা অতিরিক্ত সম্পদের বোঝা যে কতটা ভারী এবং এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ তা তিনি প্রতিটি মূহুর্তেই স্মরণে রাখেন। এ সম্পর্কে একটি সহীহ্‌ হাদিস আছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- কে বলতে শুনেছি,

"আদম সন্তানের কারও দু'টি ময়দান ভরা ধন-সম্পদ মজুদ থাকলেও সে তৃতীয় ময়দান ভরার অভিলাষী হবে। একমাত্র মাটিই আদম সন্তানের পেট ভরাতে পারে। অবশ্য তওবাকারীর তওবা আল্লাহ্‌ কবুল করে থাকেন।"

হাদিস, সহীহ্‌ বোখারী শরিফ- নং ২৪৩০; মোসলেম শরীফ- নং ২২৮৭

আবার মানুষ একদিকে যেমন অর্থ উপার্জনের পিছনে ছুটতে থাকে হন্যে হয়ে তেমনি টাকা-পয়সা খরচের বেলায়ও কার্পণ্য করে। তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে টাকা খরচ করে না। যাকাতের মত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকনকেও তারা অস্বীকার করে অথবা আদায় করতে দ্বিধা বোধ করে। এ ছাড়াও পালনকর্তার নির্দেশিত এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিধান গুলিও তারা মান্য করে না; যেমন দান-খয়রাত করা, আত্মীয়ের হক তথা ইয়াতীম-মিসকিনের হক পালন করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজে এরূপ একটি চিত্র পরিলক্ষিত হয় যে, কিছু বিত্তশালী লোক অর্থ পুঞ্জীভূত করে আর যাকাত আদায়ের দায় থেকে রেহাই পাবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা বা ইমারত তৈরী করতে থাকেন কিন্তু নিঃস্ব, গরীব তথা আত্মীয়- স্বজনের হকের কথা বেমালুম ভুলে যান। মানুষ ভাবে একমাত্র সঞ্চিত অর্থই তার সকল সাফল্যের কারণ হবে। অর্থই সকল সুখের মূল ভেবে সে টাকা-কড়িকেই ইলাহ রূপে গণ্য করে। এভাবে মানুষ মূল্যবোধের চরম নিম্নস্তরে পৌঁছে যায় যা তার নিজের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এ সম্পর্কে সহীহ্‌ তিরমিযী শরীফে আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"দিনার ও দিরহামের (মুদ্রার) দাসরা (উপাসনাকারী) লানতপ্রাপ্ত"।

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ২৩১৬

আনুগত্য ও অনুসরণঃ

আনুগত্য হল পরম বিশ্বস্ততায় শ্রদ্ধাভরে কার প্রতি কর্তব্য পালন করা বা তাঁর আজ্ঞা পালন করা। আনুগত্য ইবাদতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই আনুগত্য ছাড়া ইবাদত অর্থহীন। মানুষের প্রতি অনুগ্রহের দাবীতে ইবাদত পাবার হকদার একমাত্র আল্লাহ্। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আনুগত্য করা জরুরী। আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য তাঁর নাযিলকৃত কোরআনকে মেনে নিতে হবে এবং কোরআনের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে সাথে তাঁর প্রিয় রাসূলের আনুগত্য করাও জরুরী। এ ছাড়াও যারা কোরআনের নির্দেশনা মোতাবেক পথ চলে এবং সে অনুযায়ী মানুষকে উপদেশ দেয় তাদের অনুসরণ করাও অপরিহার্য। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া শর্ত সাপেক্ষে আরও কিছু সচেতন নেতাদের আনুগত্য করার বৈধতার কথা বর্ণিত রয়েছে পবিত্র কোরআনে। এ সম্পর্কে বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্পাক বলেন,

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সে সব সচেতন নেতাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয় মত বিরোধ হয়, তবে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হও– যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।"

আল-কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত-৫৯

উল্লিখত আয়াতে আনুগত্য ও অনুসরণের মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, **'আল্লাহ্র আনুগত্য কর'**– অর্থাৎ কোরআনের অনুসারী হও; **'রাসূলের আনুগত্য কর'**– অর্থাৎ সুন্নতের উপর আমল কর এবং **'সচেতন নেতাদের আনুগত্য কর'**- বলতে ধর্মীয় ইমাম বা ইসলামী শাসকের অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোরআনের অন্য আয়াতে উল্লেখ আছে যে, বিধান একমাত্র আল্লাহ্র। তাই হুকুমের মালিক যখন একমাত্র আল্লাহ তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও অন্যান্যদের আনুগত্য কিভাবে হতে পারে? এর জবাবে মা'আরেফুল কোরআনে আলোচ্য আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদিও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত, তবুও তাঁর হুকুম পালন ও আনুগত্যের বাস্তবায়ন পদ্ধতি কয়েক ভাবে বিভক্ত।

- **এক. কোরআন অনুসরণ**
- **দুই. রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ এবং**
- **তিন. উলিল-আমর বা সচেতন নেতার অনুসরণ।**

আল-কোরআনের অনুসরণঃ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধান যা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন সরাসরি কোরআনে বিবৃত করেছেন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে এবং যাতে কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ নেই, সে সকল নির্দেশাবলী সম্পাদন করা সরাসরি আল্লাহরই আনুগত্য। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে কোরআনের যথাযথ অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কোরআন ছাড়া অন্য কোন কর্তপক্ষের নির্দেশ মান্য করা বা তা অনুসরণ করার কোন বৈধতা নেই। বিষয়টি আরও পরিস্কার করা হয়েছে অন্য একটি আয়াত দিয়ে। আল্লাহ্পাক বলেন,

"(হে বনী আদম!) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে যা অবতারিত হয়েছে (আল কোরআন) তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তা বাদ দিয়ে তোমরা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের অনুসরণ করো না।"

আল-কোরআন, সুরা আরাফ, আয়াত-৩

অতএব, কোরআনের অনুসরণই চুরান্ত কথা। তবে কোরআনের কথা যারা বলে তাদেরকেও অনুসরণ করার তাকীদ রয়েছে এই কোরআনেই। সে হিসেবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং অন্যান্য সৎ মানুষের অনুসরণ করা জরুরী।

রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণঃ কতগুলি হুকুম-আহ্কাম ও বিধান কোরআনের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত কিংবা আংশিক ভাবে বর্ণিত হয়েছে যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দায়িত্ব আল্লাহ্পাক তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অর্পণ করেছেন। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক এগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে ওহির মাধ্যমে আল্লাহ্ সংশোধন করে দিয়েছেন। যেহেতু এসকল হুকুম-আহ্কাম সরাসরি কোরআন থেকে নয়, মহানবীর সুন্নাতের মাধ্যমে উম্মতের কাছে এসে পৌঁছেছে, সেহেতু সেগুলির আনুগত্যকে বাহ্যত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য বলেই অভিহিত করা হয়েছে। আবার ঐশী বাণীর সর্বশেষ সংস্করণ বিশ্বমানবতার জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল-কোরআন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়ে নতুন রিসালাত কায়েম হয়েছে। আল-কোরআনের বাহক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিধান সহ সকল জীবন বিধান বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আল্লাহ বিশ্ব মানবতার জন্য একটি মডেল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং সকল বিধি-বিধানের বাস্তব প্রয়োগ এবং প্রতিফলন ঘটেছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন পরিচালনার মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র সকল বিধি-বিধানই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর কথা এবং আচার আচরণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই বাহ্যত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করা হলেও তা মূলত আল্লাহরই আনুগত্য। এজন্য পবিত্র কোরআনে আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দানের সাথে সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্যের কথাটিও পৃথক করে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাঁর প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করাার নির্দেশ এসেছে পবিত্র কোরআনের বহু যায়গায়। সে হিসেবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"হে নবী! তুমি বলো, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করো, আনুগত্য করো আল্লাহ্র রাসূলের।"

আল-কোরআন, সুরা নূর, আয়াত-৫৪

" যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করে।"

আল-কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত-৮০

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিঃশর্ত অনুসরণ করার তাকীদ দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্যই আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণের মধ্যে দিয়েই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য পরিহার করে তারা চরম বোকা এবং তারা রয়েছে বিভ্রান্তির মধ্যে।

উলিল-আমর এর আনুগত্য বা অনুসরণঃ উলিল-আমরের অর্থ হল ওলামা ও শাসন কর্তৃপক্ষ বা সচেতন নেতা। শর্তসাপেক্ষে এদেরকে অনুসরনের বৈধতা দেয়া হয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংর্ঘর্ষিক তাদের কোন মতবাদকে মেনে নেয়ার কোন সুযোগ রাখা হয়নি। যে সকল হুকুম-আহকাম পরিষ্কারভাবে

কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়নি, সে ক্ষেত্রে ইমাম ও ধর্মীয় শাসন কর্তৃপক্ষের হুকুম মেনে নিতে হয়। এ বিষয়ের উপর মুজতাহিদ আলিমগণ কোরআন ও হাদিসের প্রকৃষ্ট বক্তব্যের আলোকে গবেষণা করে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শর'ই বা প্রশাসনিক বিধান প্রনয়ণ করে থাকেন। অতএব আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে ফিকহ্ সংক্রান্ত শর'ই মাসালার ক্ষেত্রে ফিকহ্বিদ ইমামগণের এবং শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত হুকুম-আহ্কামের ক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করা অপরিহার্য হয়ে গেছে। আর এটাই হল উলিল-আমরের আনুগত্যের মর্ম। এ আনুগত্যও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহ্কামের আনুগত্য। কেননা এ সকল বিধান কোরআন ও হাদিসের নির্যাস থেকে উদ্গত হয়েছে। কিন্তু কোন ইমাম বা শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্যের বৈধতা রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তাদের নির্দেশ কোরআন ও হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এভাবে একজন সচেতন সাধারণ মানুষ যদি কোরআন ও সুন্নার কথা বলে, তখন তাকে অনুসরণে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়; বরং সেক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করাই বাঞ্ছণীয়। আবার যদি কোনো স্বনামধন্য ইমাম, আলেম বা পীর-মোর্শেদও কোরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কথা বলে, সেক্ষেত্রে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং এ বিষয়ে তাকে অনুসরণ করা যাবে না। বিষয়টি সহীহ হাদিস দ্বারা সমর্থিত। ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"পাপ কাজের আদেশ না করা পর্যন্ড় ইমামের কথা শোনা ও তার আদেশ মান্য করা অপরিহার্য। তবে পাপ কাজের আদেশ করা হলে তা শোনা ও আনুগত্য করা যাবে না।"

হাদিস, বুখারী শরীফ, নং ২৭৫০

সুতরাং কারো পক্ষে এমন কোন আদেশ পালন করা বা আনুগত্য করার কোন অবকাশ নেই যেখানে আল-াহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করা হয়। কোরআন ও সহীহ হাদিস বিরোধী কোন মাসালা গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে যখন ন্যায় ও সুবিচার পরিহার করে শাসন কর্তৃপক্ষ শরীয়ত বিরোধী কোনো হুকুম জারি করে, তখন সেক্ষেত্রে শাসকের আনুগত্য করা জায়েয নয়। এ সম্পর্কে একটি হাদিস প্রনিধানযোগ্য। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

"এমন কোন বিষয়ে কারো আনুগত্য জায়েয নয়, যাতে স্রষ্টার নাফরমানীর কারণ হয়।"

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৩৪

এ হাদিসের মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, যেখানে আল্লাহ্র নাফরমানী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা যে নির্দেশ পালনে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করা হয়, সে ধরনের কারো কোন নির্দেশ পালন করা যাবে না। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন, **'যদি তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও।'** আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কোন বিষয় মত পার্থক্য হলে বা কোন বিষয় পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা হলে, সেখানে বিনা দলীলে কারো কথা মেনে নেয়া যাবে না বা অনুসরণ করা যাবে না; বরং সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ও নেতা নির্বিশেষে সকলকেই কোরআন ও সহীহ হাদিসের দিকে ফিরে আসতে হবে এবং এর মাধ্যমেই বিষয়টির ফয়সালা করতে হবে। সেটাই হবে কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠ পরিসমাপ্তি। তবে আল্লাহ্র বিধানের কোন ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। নিজ থেকে মনগড়া নিয়ম-কানুন বা বিধান তৈরি করে নেয়া এবং সে মতে চলার কোন অবকাশ নেই; তাহলে সেটা হবে বড় ধরনের অপরাধ। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, শরিয়তের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ জনগণের পক্ষে মোজতাহিদ ইমামদের মতামত বা ফতোয়ার উপর আমল করার বৈধতা রয়েছে এবং এর সাথে অত্র আয়াত সাংঘর্ষিক নয়। কারণ মোজতাহিদ আলিমগণের পায়রবী করা হয় কোরআনের নির্দেশ ক্রমেই, কাজেই তা মূলত আল্লাহ্রই

পায়রবী। তারপরেও কথা থেকে যায়, কোরআন ও হাদিসের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীতে ইজতেহাদ করার অধিকার বা ক্ষমতা কারো নেই। যদি কেউ এধরনের সাহস করে থাকে তবে সেটা হবে নিতান্তই গর্হিত কাজ এবং তা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য এবং এর অনুসরণের কোন বৈধতাও নেই। উদাহরণসরূপ, কেউ যদি বলে যে, অমুক পীর সাহেব বা অমুক বুজুর্গ বা ইমাম সাহেব এরূপ আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন বা এরূপ ফতোয়া দিয়েছেন সুতরাং সে অনুযায়ী আমল করে যাচ্ছি, তবে তার এ আমল বা অনুসরণ বৈধ হবে না যদি কোরআন ও হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিষয় সেখানে থাকে; উপরন্তু সে আমল পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত। এভাবে কোরআন ও হাদিস পরিপন্থী কোন বিধান তৈরী করা এবং এর অনুসরণ করা চরম অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। যখন আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় কোন সামাজিক নেতা, ধর্মীয় গুরু, রাজনৈতিক নেতা বা অন্যকারো অনুগত্য স্বেচ্ছায় করা হয়, তাহলে শির্‌কের মত জঘণ্য অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। মোটকথা, অনুসরণ ও আনুগত্যের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যে কারো অনুসরণের বৈধতা রয়েছে। এ ভাবে আলেম তথা নেতার অনুসরণ এমনকি একজন সাধারণ মানুষের অনুসরণ করাও আপত্তিকর নয়। তবে কোরআনে বর্ণিত মূলনীতির বাইরে কোনো পীর-মাশায়েখ, অলি, ঈমাম বা স্বনামধন্য কোন আলেমের অনুসরণ ও আনুগত্য করা বৈধ হতে পারে না। যেখানে আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কারণ থাকে সেখানে অনুগত্য ও অনুসরণ জায়েয নহে।

আনুগত্যের শিরকঃ আনুগত্যের শির্‌ক বলতে বিনা ভাবনায় তথা শরিয়তের গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ ছাড়াই হালাল, হারাম, জায়েয, নাজায়েযের ব্যপারে আলেম, বুজুর্গ বা উপরোস্থ কারোর সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়াকে বুঝানো হয়। এ জাতীয় আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত যা আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘণ্যতম শির্‌ক।

সাধারণ মানুষ যদি আল্লাহ্‌র বিধানের পরিবর্তে ধর্মীয় গুরু বা রাজনৈতিক নেতার বিধান বিনা প্রতিবাদে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় তাহলে সেটা হবে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ন্যায় তাদের আলিম ও ধর্মযাজকদেরকে রব বানিয়ে নেয়ার শামিল। অর্থাৎ সেটা হবে সুস্পষ্ট শির্‌ক। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক বলেন,

"তারা (ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ) আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্মযাজকদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়াম পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদের এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারোই ইবাদত করতে আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; তারা যাদের আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, তিনি এসব থেকে অনেক পূতঃপবিত্র ।"

আল-কোরআন, সুরা তাওবা, আয়াত-৩১

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের আনুগত্য করার কারণে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের সাথে শির্‌কের মত জঘণ্য অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তারা 'আলেম ও ধর্মযাজকদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে'– এরা অর্থ এই নয় যে, তারা এদেরকে পরিষ্কার ভাষায় মা'বুদ বলে বা এদের পূজা করে; বরং পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র রয়েছে, তা তারা যাজক শ্রেনীর জন্য উৎসর্গ রাখে; অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও রাসূলের যতই বরখেলাপ হোক না কেন, তারা সর্বাবস্থায় পুরোহিতগণের আনুগত্য করে চলে। আলেম ও পুরোহিতগণ যে হালাল হারামের বিধানকে পরিবর্তন করে হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল বানিয়ে নিয়েছে, সাধারণ ইহুদী খ্রীষ্টানগণ তা বিনাদ্বিধায় মাথা পেতে নেয়। আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের নির্দেশকে উপেক্ষা করে তারা তাদের আলিম ও যাজকদের অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলে । এমনকি সে নেতাদের শাসন ক্ষমতা সহ শর'ই

বিধি-বিধান তৈরী করার ক্ষমতায় নিরংকুশ মালিক বলেও তারা প্রথমে মেনে নিতে শুরু করেছিল। এভাবে তারা ধর্মযাজকদের আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় অংশীদার মনে করতে থাকে। এখান থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, পীর-মাশায়েখ বা আলেম-ওলামাদের রচিত আল্লাহ্‌ ও রাসূলের বিধান বহির্ভুত নিয়ম-কানুনের উপর আমল করা বা অন্ধ অনুসরণ করা তাদেরকে মা'বুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর। আল্লাহ্‌র হুকুম মান্য করা হলে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হয় আর নেতার হুকুম মত চললে সেটা হয় নেতার উপাসনা। আলাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতায় কোন নেতার আনুগত্যের কোন প্রকার সুযোগ নেই এবং এর কোন শর'ই বৈধতাও নেই। উপরন্তু এ ধরনের আচরণ শির্‌ক হিসেবে বিবেচিত।

আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা একজন মুমিনের জন্য সর্বাবস্থায় জরুরী। তাই কাফের, মুশরিক ও বিধর্মীদের আনুগত্য করা বা তাদের রীতি-নীতির অনুসরণ করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নহে। আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কোরআনে তাঁর নবীকে সম্বোধন করে সকলের জন্যে এ নির্দেশনাটি প্রদান করেছেন,

"হে নবী! আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করো, কাফের ও মুশরিকদের আনুগত্য করো না; অবশ্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ কুশলী।"

আল-কোরআন, সুরা আহযাব, আয়াত- ১।

আল্লাহ্‌র বিধান শুধু ধর্মীয় আচার-আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধান সহ জীবনের সকল অঙ্গনের সমাধান ও বিধান রয়েছে দ্বীনের মধ্যে। সুতরাং রাজনীতি এবং শাসন-প্রশাসনের দিক নির্দেশনায়ও দ্বীনের অনুসরণ অতীব জরুরী। যারা আল্লাহ্‌দ্রোহীদের কাছে বিচার-ফয়সালার জন্য যাবে অর্থাৎ যারা শরীয়তের আইন ছাড়া মানব নির্মিত আইনের অনুসরণে বিচার কার্জ পরিচালনা করবে এবং যারা এদের কাছে ফয়সালার জন্য যাবে, তারা প্রকৃত ঈমানদার নয়। কারণ তারা গায়রুল্লাহর কাছে তাদের বিচারের ভার দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করছে। এ সম্পর্কিত কোরআনের একটি আয়াত এখানে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্‌পাক বলেন,

"হে নবী! তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি–যারা ধারণা করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি তারা বিশ্বাস করে, কিন্তু এরা শয়তানের নিকট থেকে ফয়সালা পেতে চায়, অথচ এদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যেন তারা এসব মিথ্যা মা'বুদদের অস্বীকার করে; আসলে শয়তান এদেরকে সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিতে চায়।"

আল-কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত-৬০

এখানে যারা কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তারা শুধু মুখে কোরআন ও পূর্বের সমস্ত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কথা স্বীকার করে কিন্তু বাস্তবে তা করে না। বিচার-ফয়সালার প্রয়োজন দেখা দিলে কোরআন ও হাদিসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না বরং বিদ্রোহী শয়তানের পানে ধাবিত হয়। এটা সুস্পষ্ট মুনাফিকীর লক্ষণ। কারণ একজন মুমিন মুখে যেমন ঈমানের স্বীকারোক্তি করে তেমনি কাজে- কর্মেও কোরআন ও হাদীসের যথাযথ অনুসরণ করে। মুনাফিকের চরিত্রে বিশ্বাস এবং আচরণের মধ্যে কোন মিল থাকে না। তারা এদিকে যেমন মুনাফিকীর অপরাধে অপরাধী তেমনি অন্য দিকে বিদ্রোহী শক্তির আনুগত্যের কারণে শির্‌কের অপরাধে অভিযুক্ত।

ইসলাম বিরোধী কালা কানুনের আলোকে রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রশাসকদের বিচার-মীমাংসা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া এ শির্কের অন্তর্ভুক্ত। যেমন সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার বা মদ জাতীয় হারাম বস্তুকে হালাল করার নীতি। পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে ওয়ারিসী সম্পত্তির সমবন্টন বা পর্দাহীনতার নীতি। বহুবিবাহের মত হালাল বিষয়কে হারাম করার নীতি। এ সকল ব্যপারে প্রশাসকদের অকুণ্ঠ আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে হারাম ও একান্ত শির্ক। কারণ মানব জীবনের প্রতিটি শাখায় তথা যে কোন সমস্যায় কোরআন ও হাদীসের সঠিক সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়াই সকল মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। আর এটিই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার গোলামী ও একাত্ববাদের একান্ত দাবী। যেহেতু আইন ও বিধান প্রনয়নের সার্বিক অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন.

"জেনে রাখ, সকল সৃষ্টি তারই এবং হুকুমের অধিকারীও একমাত্র তিনি।"

আল-কোরআন, সুরা আরাফ, আয়াত- ৫৪ ।

তিনি আরো বলেন,

"তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে উহার মিমাংসার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। যদি তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।"

আল-কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত- ৫৯ ।

উক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করা শুধু ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যই নয় বরং তা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত এবং তা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার বাস্তবায়ন ও নিজ আক্বিদা-বিশ্বাস সুরক্ষণের শামিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধি-বিধানের আলোকে সকল বিচার-ফয়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিচ্ছে, পরোক্ষভাবে সে যেন এ বিধান রচয়িতাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করছে।

মানুষের মধ্যে দল-উপদলের সৃষ্টি এবং নিজেদের মধ্যে বিভক্তি এবং যার যার ভ্রান্ত আক্বিদা ও মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাও একপ্রকারের আনুগত্যের শির্ক। আল্লাহ্ নিজ ফিতরাত বা প্রকৃতি অর্থাৎ তাওহীদের উপর সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকেই তাঁর সত্য দ্বীনের অনুসারী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে হিসেবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশুকে মুসলমান হওয়ার কথা এবং ভবিষ্যতেও এ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা। তাই যারা দ্বীন ইসলামের অনুসারী তারাই প্রতিপালকের শান্তিপূর্ণ প্রকৃতি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু পিতামাতা এবং পরিবেশের প্রভাবে অধিকাংশরাই ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। তারা শয়তানের প্ররোচনায়র পবিত্র দ্বীন হতে দূরে সরে যায় এবং কাফির বা মুশরিক হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের সরল দ্বীন ইসলামের উপর কায়েম থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং মুশরিকদের অনুসারী হতে বারণ করেছেন। পবিত্র কোরআনে নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্পাক বলেন,

"(হে নবী!) তুমি একনিষ্ট হয়ে নিজেকে দ্বীনের ওপর কায়েম রাখ, অল্লাহ্র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই, এ হচ্ছে সহজ সরল জীবন বিধান; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানেনা। বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হও এবং তাঁকেই ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং কখনও মুশরিকদের দলভুক্ত হয়োনা। যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং নানা ফের্কায়ও পরিণত হয়ে গেছে; প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।"

আল-কোরআন, সুরা রূম, আয়াত-৩০-৩২

"নিশ্চয়ই যারা স্বীয় দ্বীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে (হে নবী!) তোমার কোন সম্পর্ক নেই, তাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাওলায় রয়েছে।"

আল-কোরআন, সুরা আনআম, আয়াত-১৫৯

উল্লিখিত আয়াতেসমূহে নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা সাড়া মুসলিম উম্মার প্রতি তাওহীদের অনুসারী হতে এবং দ্বীন ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, মানুষের মধ্যে ধর্মের নামে বহু বিভক্তি এসে গেছে। কেউ ইহুদী হয়েছে, কেউ খ্রিস্টান, কেউ বৌদ্ধ আবার কেউ বা হিন্দু এবং অন্যন্য ধর্মাবলম্বী। উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বে মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বাতিল দ্বীনকে ধারণ করে নিয়েছিল এবং প্রত্যেক দলই দাবী করতো যে তারা সঠিক দ্বীনের উপর রয়েছে এবং বাকি সব দলই বিপথে আছে। বস্তুতঃ হক বা সত্য তাদের সব দল হতেই লোপ পেয়েছিল। রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের মধ্যেও বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্ট দ্বীনে কোন পরিবর্তন নেই। সেখানে যদি কোন তথাকথিত খ্যাতিমান আলেম ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য বা গোঁড়ামীর কারণে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন এবং সাধারণ মানুয়ের উপর তা চাপিয়ে দেন, তবে তা হবে বিভ্রান্তিকর এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার চরম দৃষ্টান্ত।

আলাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদের বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত না হয়ে একতাবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য আল-াহ্‌র রশিকে মজবুত করে আঁকরে ধরার নির্দেশ দান করেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"তোমরা সবাই মিলে আলাহ্‌র রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর কখনো বিচ্ছিন্ন হয়োনা।"

আল-কোরআন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৩

পবিত্র কোরআন মজীদ হচ্ছে আলাহ্‌র শক্ত রজ্জু। এটা প্রকাশ্য দিপ্তী এবং মুমিনের জন্য এটা রক্ষা কবচ। কোরআনের অনুসারীদের জন্য এটা মুক্তির উপায়। কোরঅনের অনুসারী মুমিনগণ কখনও বিপথগামী হতে পারে না বা তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নও হতে পারে না। যারা কোরআনের যথাযথ অনুসরণ করেনা তাদের মধ্যে মতাদর্শের বিভিন্নতা আসাটাই স্বাভাবিক। আর এভাবেই সৃষ্টি হতে পারে ভিন্ন মতের যা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দেয় এবং এর মধ্য দিয়েই বিভিন্নদল ও উপদলের জন্ম নেয়। তবে এই বিভক্তির ফলে অধিকাংশরাই ছিটকে পরে সরল পথ থেকে। এই দলাদলি আর বিচ্ছিন্নতার পরিণতিও কখনো সুখকর হতে পারে না। মতানৈক্যের ফলে যারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায় তাদের সম্পর্কে আলাহ্‌পাক কঠোর শাস্ড়ির হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। পবিত্র কোরআনে আলাহ্‌ বলেন,

"তোমরা তাদের মত হয়ে যেয়োনা, যাদের কাছে আলাহ্‌র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শণ আসার পরেও তারা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে, এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ যাদের জন্য কঠোর শাস্ড়ি রয়েছে।"

আল-কোরআন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৫

মানুষের মধ্যে আলাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সুস্পষ্ট পথ নির্দেশিকা পবিত্র আল-কোরআন আসার পরে আর কারো পক্ষে সমীচীন নয় যে, সে এর অনুসরণ না করে। এতদসত্তেও যারা এর অনুসরণ থেকে মুখ

ফিরিয়ে নেয় এবং বিপথগামী হয়ে নানা দল উপদলে বিভক্ত হয়ে যায় তারা বস্তুতঃ আলাহ্‌র অবাধ্যতার কাজ করে। আর আলাহ্ সে সব অবাধ্যদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠোর আযাব।

তাওহীদের দাবীতে ইসলামের অনুসারীদের একজাতি, একদল হবার কথা ছিল। তাদের থাকার কথা ছিল এক ও অভিন্ন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহলের অপচেষ্টায় ইসলামের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়েছে এবং দ্বীনের মধ্যে বিভক্তি এসে গেছে। গোঁড়াতেই খোলাফায়ে রাশেদীনের অব্যবহিত পরেই ইসলামের মধ্যে শিয়া ও সুন্নী নামে দু'টি প্রধান দলের সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীতে এদের মধ্যেও বহু দল-উপদলের আবির্ভাব হয়েছে। এভাবে কাদেরীয়া, আহমাদিয়া, নক্‌সাবন্দী, মোজাদ্দেদীয়া, সুরেশ্বরী, আটরশি, মাইজভান্ডারী সহ পীর-মুর্শেদীর মত ও পথ বিশিষ্ট অসংখ্য বিভ্রান্ত দলের উপস্থিতি বর্তমান সমাজের বাস্তবতা। দ্বীনের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে তারা প্রকৃতপক্ষে স্বীয় দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে। সত্য উম্মোচিত হবার পরেও যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সত্য বা হককে পরিত্যাগ করে, তারা নিতান্তই গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে এবং এদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাওলায় রয়েছে। তবে বিভ্রান্ত দলগুলোর সাথে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর কোন সম্পর্ক নেই। দুভাগ্যবশতঃ মুসলিমদের মধ্যেও যে অসংখ্য দল ও মতের অস্তিত্ব রয়েছে তার মধ্যে একটি দলই সত্যের উপর রয়েছে- বাকী সব দলই বিভ্রান্ত। এই সত্য দলটি হল আল্লাহ্‌র হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের অনুসারী দল এবং তারাই নাযাতপ্রাপ্ত। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন,

নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

> **"বনু ইসরাঈলের যে অবস্থা হয়েছিল আমার উম্মতরাও ঠিক তাদেরই অবস্থার মুখোমুখি হবে। বনু ইসরাঈলরাতো বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মতরা বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে। এদের একটি দল ছাড়া সব দলই হবে দোযখী।"**

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন,

> **"ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কোন দল?"**

তিনি বললেন,

> **"আমি এবং আমার সাহাবীরা যার উপর প্রতিষ্ঠিত।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ২৬৪২

দ্বীনের নামে প্রচলিত সকল দলের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত দল একটি যারা ওরই অনুসরণ করে যার উপর নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীরা ছিলেন। বাকী সব বিভ্রান্ত দল । এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নাত অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার কোন বিকল্প নেই এবং এটাকে নাযাতের ওসীলা মেনে নিতে হবে। সেই সাথে দল ও মত নির্বিশেষে সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার প্রচেষ্টায় সদা নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে।

যে কোন মুফতী সাহেবের ফতোয়া কোরআন ও হাদিসের বিপরীত জেনেও নিজের মন মতো হওয়ার দরুন অন্ধভাবে তা মেনে নেওয়া এ শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত। সঠিক কথা হল কোন ইমাম বা গবেষকের কথা কোরআন ও হাদিসের সঠিক প্রমাণভিত্তিক হলে তা মেনে নেয়া, নতুবা নয়। ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত সবার কথাই গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হতে পারে। এজন্য তারা

সবাইকে কোরআন ও হাদিসের সঠিক প্রমাণ ছাড়া কারো কথা অন্ধভাবে মেনে নিতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু বিপত্তির কারণ হয়েছে কিছু অন্ধ অনুসারী আলেমদের নিয়ে। যার জন্য এক আল্লাহ্‌ বিশ্বাস এবং সুন্নাতের অনুসারী হওয়া সত্বেও চিন্তাধারা ও অভিমতে বিভিন্নতার কারণে সুন্নী মুসলিমদের মধ্যেও কতিপয় উপদল ও মাযহাবের অস্তিত্ব বর্তমান সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। এ মাযহাবগুলোর মধ্যে আকিদা এবং আদর্শগত কোনো মতপার্থক্য নেই এবং এরা সকলেই রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের অনুসারী। তবে এদের মধ্যে শরিয়াতের খুঁটি-নাটি বিষয় এবং ইবাদত বন্দেগীর পদ্ধতিগত কিছু মতপার্থক্য দেখা যায়। এ নিয়ে দ্বীনের মধ্যে একটি আন্তঃমাযহাব ঠাণ্ডা লড়াই চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। কিন্তু দ্বীনের জন্য এ অবস্থা কোনোভাবেই কল্যাণকর হতে পারে না। এই শ্রেণী বিভক্তি যেমন নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ কলহের সৃষ্টি করে তেমনি বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরায় এবং দ্বীন ইসলামেরও ক্ষতি সাধন করে। প্রত্যেক মাযহাবের ইমামগণ সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সময় ও শ্রম ব্যয় করে তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান রেখে গেছেন সাধারণ মানুষের জন্য। তারা কোরআন ও হাদিস অনুসরণ করে এর নির্যাস থেকে তাদের মতামত ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তবে তাদের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। হাদিসের ভান্ডার তখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি এবং সঠিক সময়ে সহীহ্‌ হাদিস প্রাপ্যতার সীমাবদ্ধতার কারণে কিছুটা ঘাটতি রয়ে গেছে। তাই সকল মাযহাবের মতামত একেবারে নির্ভেজাল বা খাদহীন একথা জোর করে বলার উপায় নেই। কোন কোন মাযহাবের মধ্যে ছোট-খাঁট ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে এবং এ কারণেই সম্ভবতঃ সমাজে আন্তঃমাযহাব বিতর্ক চলে আসছে বহুদিন থেকে। যদিও মাযহাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই, তবুও মানুষের মাঝে মাযহাব সম্পর্কিত ভুল ধারণা ও বিতর্কের কিছুটা অবসান করার লক্ষ্যে আমাদের এ আলোচনার অবতারণা। মাযহাবের অস্তিতের কারণেই সাধারণ জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যেখানে আন্তঃমাযহাব বিতর্ক বিদ্যমান রয়েছে সেখানে সাধারণ জনগণ কোন মাযহাব অনুসরণ করবে? এর যথার্থ উত্তরও প্রত্যেক মাযহাবের ইমামগণ খুব সুন্দরভাবে আগেভাগেই দিয়ে রেখেছেন। তারা বলে দিয়েছেন যে, যদি তাদের কোন মতামতের বিপরীতে সহীহ্‌ হাদিসের সন্ধান মিলে তাহলে সে হাদিস অনুযায়ী আমল করাই তার মাযহাব। কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে মাযহাব পন্থী কিছু অন্ধ অনুসারীদের নিয়ে। এরা নিজ নিজ মাযহাব নিয়ে উৎফুল্ল এবং এর সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য অপরের মাযহাবকে ভ্রান্ত আখ্যা দিচ্ছে। একশ্রেণীর অতি উৎসাহী অন্ধ মাযহাব ভক্ত আছে যারা মাযহাবকেই জীবনের সবকিছুর উর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন এবং মাযহাবকেই জীবনের চুড়ান্ত সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বস্তুতঃ তারা কোরআন ও হাদিসকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করে এবং তারা মাযহাবের গণ্ডী পেড়িয়ে বাইরে আসতে রাজী নন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে, কোন মাযহাবই বিতর্কের উর্দ্ধে নয় এবং তাই সমাজে আন্তঃমাযহাব কলহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এভাবে দ্বীনের মধ্যে মতপার্থক্য এবং তা নিয়ে দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া প্রকারান্তে দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করার শামিল। তাই বলে এখানে মাযহাব অনুসরণের অবৈধতার কথা বলা হচ্ছে না; কিন্তু মাযহাবের অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে আপত্তি করা হচ্ছে। কেননা মাযহাবের মধ্যে অবিতর্কিত বিষয়গুলির অনুসরণ মূলত কোরআন ও হাদিসেরই অনুসরণ। আর বিতর্কিত বিষয়গুলিকে শুদ্ধতার মাপকাঠীতে যাচাই করে না নিয়ে অনুসরণ করা হলে তা হবে সংশ্লিষ্ট ইমামের অনুসরণ। সেক্ষেত্রে অশুদ্ধ মতবাদকে আঁকড়ে ধরা এবং এর অন্ধ অনুসরণ করা চরম নির্বুদ্ধিতা এবং গোমরাহীও বটে! আর এর পরিণতিও কল্যাণকর নয়। সেক্ষেত্রে আমাদের যা করণীয় তা হল এই যে, কোন মাছালার উপর সহীহ হাদীসের অনুসন্ধান করে সে হাদিস অনুযায়ী আমল করা। বিশুদ্ধ মতটি যে মাযহাবেই থাকুক না কেন সেটা গ্রহণ করার জন্য নিজেকে সদা প্রস্তুত রাখার মনমানসিকতা গড়ে তুলিতে হবে। রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর সুন্নাতেকে আঁকড়ে ধরাই বড় কথা। কোন মাযহাবে দৈনন্দিন ইবাদত পদ্ধতি, হালাল-হারামের বিধান, মিলাদ বা অন্য কোন আচার-আচরণের নিয়ম-কানুনের

মধ্যে যদি সুন্নাহ বিরোধী এবং শির্ক ও বিদ'আত এর কোন উপকরণ থেকে থাকে তাহলে তা পরিত্যাগ করে নিজেদের আমল সহীহ হাদিসের আলোকে সংশোধন করে নেওয়াটা জরুরী। কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী মতপার্থক্যের বিষয়গুলি সরাসরি কোরআন ও হাদিসের আলোকে ফয়সালা হবার কথা। কিন্তু সেটা না করে যারা সহীহ হাদিসের সন্ধান পেয়েও তার উপর আমল না করে নিজ নিজ ইমামদের অনুসরণে অনঢ় রয়েছেন, তারা কি আসলে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় নিমজ্জিত হয়ে দ্বীনের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি করছেন না? যারা কোন মাযহাবের নিঃশর্ত আনুগত্য করে অর্থাৎ তাদের মতামতের ভুল-শুদ্ধ বিচার না করে অন্ধ অনুসরণ করে এবং এর বিপরীতে কোরআন বা সহীহ হাদিসের সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়া সত্বেও চোখ বন্ধ করে মাযহাব অনুসরণেই অটল তাকে তারা মূলত দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে চলছে এবং তাদের অবস্থাও ঐ ইহুদি-খ্রিস্টানদের মত হবে যারা আল্লাহ্‌র বদলে পরস্পরকে বহু রব বানিয়ে নিয়েছে। এভাবে দ্বীনের মধ্যে যারা বিভক্তি সৃষ্টি করে তাদের সাথে সুন্নাতের কোন সম্পর্ক নেই।

যারা মাযহাবের অন্ধ অনুসারী তাদের উদ্দেশ্যে হানাফী মাযহাবের ইমাম হযরত ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ)-এর কিছু বক্তব্য পেশ করা হল:

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনার ফতোয়া যদি কোরআনের বিপরীত সাব্যস্ত হয় তখন অমাদের কি করতে হবে? তিনি বললেনঃ আমার ফতোয়া ছিড়ে দিয়ে তখন কোরআনকে মানবে। বলা হলোঃ আপনার ফতোয়া যদি হাদিসের বিপরীত সাব্যস্ত হয়? তিনি বললেনঃ আমার ফতোয়া ছিড়ে দিয়ে তখন হাদিসকে মানবে। বলা হলোঃ আপনার ফতোয়া যদি সাহাবাদের বাণীর বিপরীত সাব্যস্ত হয়? তিনি বললেনঃ আমার ফতোয়া ছিড়ে দিয়ে তখন সাহাবাদের বাণী অনুসরণ করবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা আরো বলেনঃ তুমি আমি আবু হানীফা এবং মালিক এমনকি অন্য যে কারোর অন্ধ অনুসরণ করো না। বরং তারা যেভাবে হুকুম-আহকাম সরাসরি কোরআন ও হাদিস থেকে সংগ্রহ করেছে তোমরাও সেভাবে সংগ্রহ করো (সূত্র: বড় শির্ক - মোস্তাফিজুর রহমান বিন আবদুল আজিজ।) প্রকৃতপক্ষে সকল ইমামগণ এ ব্যপারে একমত যে, রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিস যখন কারো কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় তখন অন্য কারোর মতামতের কারণে তা প্রত্যাখ্যান করা অধিকার সে ব্যক্তির আর থাকে না। লক্ষ্য করুন প্রিয় মাযহাব ভক্ত অনুসারীগণ! মাযহাব সম্পর্কে প্রখ্যাত ইমামের কি পরিস্কার বক্তব্য। তাই যারা অন্ধভাবে মাযহাব নিয়ে পড়ে আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, অনুগ্রহ করে কোরআন ও হাদিস নিয়ে গবেষণা করুন এবং মাযহাবের গণ্ডীর মধ্যে যত অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলিকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে ফেলুন এবং অন্ধ তাকলীদ পরিত্যাগ করুন। এর মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত কল্যাল এবং মুক্তি।

আমরা মুসলমান, তাই কোন দল বা মত বড় কথা নয়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করাই শেষ কথা এবং মুক্তির একমাত্র পথ। আমাদের সমাজে এমনটি প্রচলিত আছে **'আমিতো অমুক দল বা মাযহাব আনুসরণ করি, কাজেই এর মধ্যে যা আছে তাই মানি এবং যা নেই তা আমল করার সুযোগ নেই'**। এ সকল লোকের কাছে সহীহ হাদিসের উদ্ধৃতি দিলেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু এ ধরনের আচরণ গোমরাহী বৈ কিছু নয়। বস্তুতঃ মাযহাব বা দলের অন্ধ অনুসরণ আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা আমরা নিজেরাও জানি না। কেননা প্রত্যেক দলই নিজেদেরকে সহীহ বলে দাবী করে। তবে দলগুলোর মধ্যে কোন দলটি সঠিক সুন্নাতের অনুসারী সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে চোখকান খোলা রেখে গোঁড়ামী পরিহার করে সুন্নাতকে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী পথ চলা। তাই আসুন তাওহীদের আকিদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে একমত, একপথ রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নতের পথ অনুসরণ করে নাযাতপ্রাপ্ত হই। তবে আন্তঃদলীয় বিতর্ক নিরসনের জন্য প্রত্যেককেই সহনশীল হতে হবে । সমাজের আলিম শ্রেণীকে এগিয়ে আসতে হবে সর্বপ্রথমে। তাদেরকে

গোঁড়ামী পরিহার করে কোরআন অধ্যায়ন ও হাদিস চর্চার মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে হবে এবং সেই সাথে সমাজের সাধারণ মানুষের মাঝে সে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিতে হবে। প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য আপ্রান চেষ্টা করে যেতে হবে। তাহলেই সরল পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

প্রবৃত্তির অনুসরণঃ মানুষের ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে প্রবৃত্তির একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে গোমরাহ করে দিতে পারে। দ্বীনের হুকুম আহকামগুলি সঠিক পন্থায় আদায় না করে মনের খেয়াল-খুশী মত চলার নাম প্রবুত্তির অনুসরণ। অনেকসময় প্রবৃত্তি মানুষের ইলাহে (উপাস্য) পরিণত হতে পারে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে মানুষ দ্বীন থেকে বহু দূরে ছিটকে পরতে পারে। প্রবৃত্তির অনুসরণ প্রকারান্তে নিজ প্রবৃত্তিরই উপাসনা করার শামিল। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে,

"তুমি কি দেখনা তাকে যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে?"

আল-কোরআন, সুরা ফুরকান, আয়াত-৪৩; সুরা জাসিয়াহ, আয়াত-২৩।

এ আয়াতে আল্লাহ্ এসব লোকদের সম্পর্কে বলেছেন যারা প্রবৃত্তি অর্থাৎ লোভ-লালসা বা কামনা-বাসনা এবং স্বীয় মনকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সে মতে জীবন পরিচালনা করে। তাদের সকলকেই প্রবৃত্তির দাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তারা মন চাইলে সেটা করে আবার মন না চাইলে সেটা প্রত্যখ্যান করে। এ ধরনের কাজ যারা করে তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে নিজেদের প্রবৃত্তিকেই নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়ে থাকবেন। যারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, সে প্রবৃত্তির উপাসনার কথা মুখে না বললেও বা প্রবৃত্তির উপাসনার কথা অস্বীকার করলেও তার কার্য-কলাপে প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তিই তার উপাস্য হয়ে যায়। মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে মূর্তি পূজা, সূর্য পূজা, পাথর পূজা, গাছ পূজা সহ নানাবিধ সৃষ্ট বস্তুর পূজায় রত রয়েছে নির্বিকারে। মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই সালাত, সিয়াম, হজ্জ এবং যাকাত সহ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলি থেকে উদাসীন রয়েছে প্রবৃত্তিরই প্রভাবে। আবার প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ হালাল-হারামের বিধান তথা ন্যায়-অন্যায় ভুলে গিয়ে অবৈধ ভাবে সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা হাসিলের প্রচেষ্টার নিজেকে রত রেখেছে সারাক্ষণ। সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে মানুষ জাঁক-জমক আর ঐশ্বর্যের নেশায় বিভোর রয়েছে সারাক্ষণ। তারা বেমালুম ভুলে গেছে মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা। এগুলি সব প্রবৃত্তির উপাসনা বৈ কিছু নয়।

মানুষের মধ্যে দু'টি বিপরীত ধর্মী প্রবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। একটি আল্লাহ্-মুখী ভাল প্রবৃত্তি, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি না; আর অন্যটি হচ্ছে কু-প্রবৃত্তি বা শয়তানী প্রবৃত্তি, যেটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছি। কু-প্রবৃত্তির অনুপ্রেরণা যোগায় শয়তান। লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, মোহ ইত্যাদির জন্ম দেয় কু-প্রবৃত্তি। এগুলি মানুষকে আল্লাহর কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেয়। মানুষ যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থাকে, শয়তান তখন তার দোসর হয় এবং এবং তার হৃদয়-মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে কুমন্ত্রণা দেয়। তার কাছে তখন সকল অবৈধ বা অপরাধমূলক কাজ বৈধ মনে হয় এবং সকল ভাল কাজ থেকে সে বিমুখ হয়ে পড়ে এবং সীমালঙ্ঘন করে পাপের পঙ্কিল সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। প্রবৃত্তির অনুসরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ্ মানুষকে সাবধান করেছেন এভাবে,

> **"যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, জাহান্নাম হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হবার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাত হবে তার আবাস।"**

আল-কোরআন, সুরা নাযিয়াত, আয়াত-৩৭-৪১।

মানুষের ইচ্ছাশক্তি যখন আসক্তিতে পরিণত হয় তখন সেটা হয় অপশক্তির আরাধনা। তখন মানুষ আল্লাহর আদেশ নিষেধের তোয়াক্কা করে না এবং মন যা চায় তাই করে। অর্থাৎ কামনা-বাসনাই তখন তার ইলাহ রূপে ধরা দেয়। এ ভাবেই মানুষ সৎ পথ ছেড়ে অসৎ পথে পা বাড়ায় এবং বহুবিধ অন্যায় বা অপকর্মের সাথে জড়িয়ে যায়। কিন্তু নাহক তথা শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর সমর্থনে নিম্নোক্ত কোরআনের আয়াতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। আল্লাহ্ বলেন,

"আল্লাহর ইবাদত করার জন্য ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দিতে আমিতো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি"

আল-কোরআন, সুরা নাহল, আয়াত-৩৬।

তাগুত হচ্ছে এমন অপশক্তি (শয়তান, প্রবৃত্তি বা অন্যান্য বিভ্রান্তিকর উপায়-উপকরণ) যাকে আল্লাহর সাথে বা আল্লাহর পরিবর্তে উপাসনা করা হয়। যে আনুগত্য কেবলমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য, সেখানে সৃষ্টসত্তা বা সৃষ্টবস্তুর আনুগত্য করা বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হলে তা বস্তুতঃ তাগুতের উপাসনা করার শামিল। কু-প্রবৃত্তি একটি শয়তানী শক্তি যার প্রভাবেই মানুষ মূলতঃ অপরাধের জগতে পা বাড়ায়। এধরনের অপরাধ অধিকাংশ সময়ে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সংঘটিত হয়ে থাকে। এমনকি যিনি অপরাধ করে যাচ্ছেন তিনিও হয়ত অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছেন না। তাই এর বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেমন অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি মানুষের আকাঙ্খার সৃষ্টি হয় প্রবৃত্তির মাধ্যমে। এগুলি যতক্ষণ সরল পথে বা বৈধভাবে অর্জিত হয় ততক্ষণ তা অপরাধ নয়। কিন্তু এগুলির প্রতি অত্যাধিক আকর্ষণ বা মোহ তৈরি হলে তা বাস্তবায়নের জন্য যখন প্রতারণা, জালিয়াতি, যুলুম, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি সহ বিভিন্ন প্রকার অবৈধ পন্থায় আশ্রয় নেয়া হয় তখন তা প্রকারান্তে প্রবৃত্তিরই উপাসনা। এ ধরনের আচরণ কোন মানুষের জন্য মোটেই কল্যাণকর হতে পারে না বরং এটা পাপের কাজ। প্রবৃত্তির অনুসরণ যে একজন মানুষের জন্য কতটা ভয়াবহ তা মহানবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ হাদিস দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়। হযরত কাব ইবনে মালেক আল আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু ক্ষতি না করে, কার সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চাইতে অনেক বেশী ক্ষতি সাধন করে তার ধর্মের।"

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ২৩১৭

ফরজ ও ওয়াজিব ইবাদতগুলি সর্বাবস্থায় সঠিকভাবে পালন করার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এ ইবাদতগুলি থেকে ইচ্ছাকৃত বা অলসতার কারণে গাফেল থাকলে বা অহংকার করা হলে তা শয়তানের অনুসরণ বই কিছু নয়। এভাবে কু-প্রবৃত্তির মোহে অন্ধ হয়ে সে অন্যান্য অপরাধের সাথে জড়িয়ে যায় এবং ন্যায় তথা হক তার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। এক কথায় সে প্রবৃত্তির দাস হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন একটি অন্যায় করে, সেটি তখন তাকে আর একটি অন্যায় করতে উদ্বুদ্ধ করে। পর্যায়ক্রমে মানুষ অন্যায়ের জালে জড়িয়ে যায় এবং সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডই তার কাছে তখন বৈধ মনে হয়। এভাবে শয়তানের দেখানো পথ চলতে চলতে সে সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী কে পছন্দ করেন না এবং তার জন্য তিনি

প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। এর সত্যতা বর্ণিত হয়েছে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিরমিযী শরীফের একটি সহীহ হাদিসে। তিনি বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"দোযখ (জাহান্নাম) কু-প্রবৃত্তি ও লালসা দ্বারা পরিবেষ্টিত"

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ২৪৯৮

অর্থাৎ কু-প্রবৃত্তি ও লালসার অনুসরণকারীরা জাহান্নামের অধিবাসী হবে। অতএব জাহান্নামের অগ্নি থেকে বেঁচে থাকতে, খাঁটি ঈমানে এক আল্লাহ্‌র উপাসনায় রত থাকা চাই। এবং সেই সাথে অর্থ লিপ্সা আর ক্ষমতার লালসা চরিতার্থ করার শয়তানের দেখানো সকল অবৈধ পন্থা পরিহার করে সীমালঙ্ঘণের অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সকলকেই সচেষ্ট থাকা চাই।

ভয়

ভয় হলো একপ্রকারের অন্তরের অনুভুতি। কোন কিছু থেকে অমঙ্গল, অকল্যাণ, ক্ষয়-ক্ষতি, বিপদাপদ বা শাস্তির আশংকা থেকে সৃষ্ট অনুভুতিই হল ভয়। মানুষের অন্তরে প্রকৃতিগত কিছু ভয় থাকে যা ইবাদতের মধ্যে শামিল নয়। যেমন বাঘ, সিংহ, সাপ, শত্রু প্রভৃতি থেকে সৃষ্ট ভয়। এ ভীতি দোষণীয় নয়। বিশেষ প্রকারের গোপন ভয় যার মধ্যে সম্মান ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত থাকে, সেটাই ইবাদত হিসেবে গণ্য। এ ধরণের গোপন ভয় কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতিই পোষণ করতে হয়। আল্লাহ্‌র ভয় করার অর্থ এই যে, তাঁর রহমতের আশায় ইবাদত ও আনুগত্যে লেগে থাকা এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করা। অর্থাৎ তাঁর আদিষ্ট কাজগুলি আগ্রহ সহকারে যত্নের সাথে সম্পাদন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। আল্লাহ্‌কে ভয় করা ঈমানের অংশ। একজন মুমিনের অন্তর সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থাকে। আল্লাহ্‌ভীতি ছাড়া যেমন ঈমানের দাবী পূর্ণ হয়না তেমনি কোন ইবাদতই আল্লাহ্‌ভীতি ছাড়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ভীতি হচ্ছে ঈমানের সারাংশ। আল্লাহ্‌পাক অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যাকে যেভাবে চান রাখেন। তাঁর জ্ঞান সমস্ত জিনিসকে প্রতিমুহূর্ত বেষ্টন করে থাকে। আসমান ও জমিনের সব কিছুই তাঁর দৃষ্টি সীমায় রয়েছে এবং সবকিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তিনিই কিয়ামত দিবসের মালিক। সুতরাং বিশাল ক্ষমতাবান মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ থেকে প্রত্যেকেরই সদাসর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা উচিত। আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দার উদ্দেশ্যে বলেন,

" তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো। "

আল-কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত-৪০

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদেরকে কেলমাত্র তাঁকে ভয় করার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তাঁর পাঁকড়াও, তাঁর শাস্তি, তাঁর ক্রোধ, তাঁর প্রতিশোধ ও হিসাব গ্রহণকে ভয় করার জন্য বলেছেন। অতঃপর কোরআনের অন্যত্র তিনি আল্লাহ্‌ভীরুদের সুসংবাদ দিয়ে বলেন,

"যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়– তাদেরকে বলা হবে শান্তির সাথে তোমরা তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ কর, এটা অনন্ত জীবনের দিন।"

আল-কোরআন, সুরা কা'ফ, আয়াত-৩৩-৩৪

প্রকৃত ধর্মভীরু লোকেরা আল্লাহ্‌কে না দেখেই তাঁর শাস্তির ভয় করে এবং সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্যে লিপ্ত থাকে। এধরনের মুত্তাকীদের আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য আল্লাহ্ আরো বলেন,

"যারা দৃষ্টির আঁড়ালে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"

আল-কোরআন, সুরা মুলক, আয়াত-১২

এখানে আল্লাহ্ ঐ সব লোকদের সুসংবাদ দিচ্ছেন যারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া সম্পর্কে ভয় রাখে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালেও তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত হতে বিমুখ হয়না এবং সর্বাবস্থায় তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করে তাঁর নিষিদ্ধকৃত কাজগুলি থেকে বিরত থাকে। তারা নীরবে-নিভৃতে আল্লাহ্‌র ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা এধরনের লোকদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিবেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এ পুরস্কার পাওয়া মানুষ মাত্রেরই কাঙ্খিত হওয়া উচিত। একজন মোত্তাকীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করেই আমরা এ পথে এগুতে পারি। একজন আল্লাহ্‌ভীরু পরহেজগার বা মোত্তাকী আল্লাহ্‌র ভয়ে সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ইবাদত এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফরয-ওয়াজেব সহ সকল প্রকার হুকুম-আহকাম সঠিকভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকে। আনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ ঘোষিত কাজ থেকেও সে অতি সন্তর্পণে নিজেকে বিরত রাখে। শয়তানের দেখানো রঙিন দুনিয়ার অবৈধ পথের সকল সুখানুভূতি, ভোগ, মোহ ইত্যাদি সে বিসর্জন দিতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়ে। একটি হাদিসে উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে বিষয়টি আরো পরিস্কার করার চেষ্টা করা হল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

"সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ্ তাঁর আরশের ছায়ায় এমন দিনে স্থান দিবেন, যেইদিনে আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকনে না– তাদের মধ্যে এক প্রকার হলো ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী মহিলা ব্যভিচারের জন্য আহ্বান করে, কিন্তু সে উত্তরে বলে,'আমি আল্লাহকে ভয় করি, সুতরাং আমি তোমার সাথে এ কাজে লিপ্ত হতে পারিনা।"

তাফসীর ইবনে কাসীর, ১৭ খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৯০

আল্লাহ্ যেমন দয়ালু ও করুণাময় তেমনি শাস্তি দানেও কঠোর। আল্লাহর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিতে পারেনা, আবার আল্লাহর শাস্তির মতও কেউ শাস্তি দিতে পারে না। আল্লাহ্‌র পাঁকড়াও থেকে কেহই রেহাই পেতে পারে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"তারা কি আল্লাহ্‌র পাঁকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? সর্বনাশগ্রস্থ সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহ্‌র পাঁকড়াও থেকে কেউ নিঃশঙ্ক হতে পারে না"।

আল-কোরআন, সুরা আরাফ, আয়াত-৯৯

আল্লাহ্ শাস্তি দিতে চাইলে তা রোধ করার কেউ নেই। আবার আল্লাহ্ মঙ্গল চাইলে কারো সাধ্য নেই তা প্রতিহত করে। আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে কেউ নিরাপদ হতে পারে না। যে কোন সময় আল্লাহ্ অবাধ্যদেরকে পাঁকড়াও করতে পারেন। তাই হতভাগ্য সম্প্রদায় ছাড়া কেহই আল্লাহ্-র শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

ভয়ের শির্‌ক: ভয়ের শির্‌ক বলতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীরেকে কেউ কারো পক্ষে অপ্রকাশ্যভাবে দুনিয়া বা আখিরাত সংক্রান্ত যে কোন ক্ষতি সংঘটন করতে পারে বলে অন্ধ বিশ্বাস করে তাকে ভয় পাওয়াকে বুঝানো হয়। এ ধরণের ভয় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য হতে হবে। অন্য কারোর জন্য নয়। ভয়ের শির্‌ক বিভিন্নভাবে সংঘটিত হতে পারে। যেমন অদৃশ্যের ভয়, কোন মানুষের ভয় ইত্যাদি।

অদৃশ্যের ভয় বলতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কোন মূর্তি, দেবতা, জ্বিন বা মৃত পীর-অলীর অনিষ্টতা থেকে ভয় পাওয়াকে বুঝান হয়। এ জাতীয় ভয় গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শির্‌ক। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন মানব বা দৈত্য-দানব নেই যারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত স্রেফ নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী কারো কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারে। কারো দ্বারা অন্যের কোন কল্যাণ বা ক্ষতি সাধিত হবার বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে রয়েছে। একজন মোমেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার চেষ্টা করে। শয়তান তাকে ধোঁকা দেয়ার প্রচেষ্টা করে এবং নানাবিধ ভয় প্রদর্শন করে নেক আমল থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ঈমানদারীর শর্ত অনুযায়ী শয়তানী শক্তিকে ভয় করা চলবে না, বরং ভয় করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে। কেননা কোন শয়তানী শক্তির গোপণ ভয় পোষণ করা শির্‌ক। আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে শয়তানী শক্তিকে ভয় না করে কেবল তাঁকেই ভয় করার নির্দেশ দান করেছেন কোরআনে,

"নিশ্চয়ই এ শয়তান, যে নিয়ত তোমাদেরকে নিজ বন্ধুদের ভয় দেখিয়ে থাকে। তোমরা ওদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকেই ভয় করো যদি তোমরা ঈমানদার হও।"

আল-কোরআন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত-১৭৫

আল্লাহ্ তা'আলা যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং কর্মবিধায়ক হিসাবে তাঁর কোন সমকক্ষ নেই- সে বিষয়ে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

"আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়"।

আল-কোরআন, সুরা যুমার, আয়াত-৩৬

মক্কার কাফিরগণ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ওদের দেবতার দ্বারা দৈবক্রমে যে কোন অনিষ্টের শিকার হওয়ার ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করত– এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তার জবাব দিয়েছেন। এখানে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে সমগ্র মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে কর্মবিধায়ক হিসাবে তিনিই তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা যেন তাঁর ওপর নির্ভর করে, এবং অন্য কাউকে শরীক সাব্যস্ত না করে কেবল মাত্র তাঁকেই ভয় করে। যেহেতু মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেউ দৈবক্রমে কারো কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট করতে পারে না সেহেতু কোন জ্বিন, পরী, দৈত্য, দানব, দেবতা, জীবিত অথবা মৃত পীর অলি বা দরবেশ অথবা মাজারস্থ কোন প্রাণী, বৃক্ষ বা অন্য কিছুর দ্বারা কোন কারণবশতঃ দৈবক্রমে কারো কোন অনিষ্ট হতে পারে, এমন ধারণা পোষণ করা এক ধরনের গোপন ভয়ের উপাসনায় শির্‌ক করার শামিল।

মানুষের ভয় বলতে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি, প্রশাসক কিংবা নেতার ভয়ে কোন ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয়াকে বুঝান হয়। যেমনঃ কাউকে সৎ কাজের আদেশ দান অথবা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে গিয়ে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করতে গিয়ে মানুষকে ভয় পাওয়া। এ জাতীয় ভয় শরীয়তের

দৃষ্টিতে হারাম ও ছোট শির্ক। একজন মোমেন নিন্দুকের ভয়ে অথবা মানুষের অনিষ্টের ভয়ে সৎকাজ থেকে পিছিয়ে থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অনিষ্টের ভয় করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"সুতরাং তোমরা মানুষের কোন অনিষ্টের ভয় কোরো না, ভয় কেবল আমাকেই করো"।

আল-কোরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত-৪৪

ভরসা

ভরসা একপ্রকারের আত্মিক উপাসনা। কোন বিষয়ে অন্যের উপর নির্ভরশীলতার নাম ভরসা। জীবনের বাস্তবতায় সমাজবদ্ধ মানুষ একে অন্যের উপর দায়বদ্ধ এবং নির্ভরশীল থাকতে হয়– সেটা প্রকৃতিগত নির্ভরশীলতা এবং এর সাথে উপাসনার কোন সম্পর্ক নেই। বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত ভরসা উপাসনা হয়– যখন তা কাউকে কর্তৃত্ববান মনে করে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তার ইচ্ছার উপর নিজেকে সোপর্দ করা হয়। এধরনের ভরসার স্থল কেবলমাত্র একটাই– আর তা হল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা। ঈমানের দাবীতে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখা একান্ত জরুরী। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

"তোমরা যদি মুমিন হও তাহলে আল্লাহ্র ওপরই নির্ভর কর।"

আল-কোরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত-২৩

প্রত্যেক মানুষেরই এ আয়াতের উপর আমল করা জরুরী। একজন মুমিন তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখবে, এটাই ঈমানের দাবী। দৈনন্দিন কাজ-কর্মে একজন মানুষ অপর কোন মানুষের সাহায্য সহযোগিতা নিতে পারে, তবে কারো কাছ থেকে এর ফলাফলের আশা করা বা তার উপর পূর্ণ ভরসা করা ঠিক নয়; কেননা ফলাফল প্রদান করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। মানুষের সকল প্রচেষ্টার ফলাফল আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত, সেখানে কোন মানুষ বা অন্যকারো কোন হাত নেই। তাই মানুষের যেটা করণীয় তা হল– নিজের সাধ্যের মধ্যে থাকলে তা নিজে সম্পাদন করা এবং সাধ্যের বাইরে হলে প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য সহযোগিতা নেওয়া এবং সাফল্যের জন্য চুড়ান্ত ভরসার স্থল আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা। তবে কর্ম না করে ফলাফল আশা করা বা দোয়া চাওয়া বোকামী। যে কোন কর্ম শুরু করে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখতে হবে এ কারণে যে, কর্ম করার জন্য যে শক্তি ও সামর্থ প্রয়োজন সে সবের মালিক আল্লাহ্। তিনি তওফিক দিলেই কেবলমাত্র তা করা যায়। অন্যথায় হাজারো চেষ্টা করেও তা করা সম্ভব হয়না। সকলের অন্তরে এ চুড়ান্ত সত্যের উপলব্ধি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ভরসার শির্কঃ ভরসার শির্ক বলতে মানুষের অসাধ্য বিষয়সমূহ সমাধানে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর উপর ভরসা করাকে বুঝানো হয়। যেমনঃ রিযিক দান, রোগ-ব্যাধি উপশম করা, সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা মারাত্মক শির্ক।

মানুষকে সাধারণভাবে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে অন্যের দারস্থ হতে হয়, সেটা কোন অপরাধ নয়। তবে চুরান্ত ফলাফলের জন্য যখন আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে অন্যের উপর ভরসা করা হয় সেটা শির্ক বৈ কি! এভাবে নেতা কিংবা প্রভাবশালীর উপর নিজেকে সোপর্দ করে তাদের উপর পূর্ণ ভরসা

কারী সিঃসন্দেহে শির্‌কে আক্রান্ত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং কোন কাজের সংকল্প করা হলে বাহ্যিক সাহায্য সহযোগীতা নেয়ার পরে আল্লাহ্ তা'আলার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে হবে। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

"অনন্তর যখন তুমি সংকল্প করেছ তখন আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা কর এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে কেউই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হবে না, এবং যদি তিনি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, তবে তারপরে কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করে? ।"

আল-কোরআন, সুরা আলে-ইমরান, আয়াত-১৫৯-১৬০

উল্লিখিত আয়াতে নিজের কাজ-কর্ম শুরু করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখার কথা বলা হয়েছে। তাঁর উপর যে ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হন। কারণ তিনি সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্বশীল। যারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন। এরপর তিনি শিরক্‌কে খণ্ডন করেছেন এই বলে যে, তিনি বিমুখ হলে আর কে আছে যে কারো সাহায্য করতে পারে? এজন্যই প্রকৃত মুমিন হতে হলে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপরেই ভরসা রাখতে হয়। তা না করে যারা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি নিজের বা অন্যের কর্মের উপর ভরসা করবে; তারা শির্‌কে আসগরে পতিত হবে। আর যা কারো সাধ্যের মধ্যে নেই এমন প্রাপ্তির জন্য কোন পীর, অলি, দরবেশ বা মাযারবাসীর উপর ভরসা করবে তারা ইবাদতের মাধ্যমে শির্‌কে আকবরে পতিত হবে।

অহংকারঃ

অহংকার হল অন্তরের একপ্রকার অনুভুতি– যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণের মাধ্যমে। অহংকার কোন ইবাদতের মাধ্যম হতে পারে না, তবে এটা ইবাদত বিমুখতার বহিঃপ্রকাশ এবং শির্‌ক সংঘটিত হওয়ার একটি উপাদান। তাই প্রসংগত বিষয়টিকে এখানে আলোচনায় নিয়ে আসা হল। সর্বপ্রথমে আমাদের জানা দরকার, অহংকার কি? একটি হাদিসের মাধ্যমে এর সংজ্ঞা নিরূপন করা যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে,

নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

"যার অন্তরে সরিষা পরিমান অহংকার আছে সে জান্নাতে যাবে না।"

তখন একব্যক্তি বলল,

"আমার কাছে তো এটা খুবই পছন্দনীয় যে, আমার পোষাক-পরিচ্ছদ সুন্দর হোক, আমার জুতা জোড়াও সুন্দর হোক (এটাও কি অহংকার?)"

তিনি বললেন,

"মহান আল্লাহ্ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যই পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে, সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদের তুচ্ছ জ্ঞান করা।"

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ১৪৪৯

এ হাদিস অনুসারে চিরসত্য আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা অর্থাৎ তাঁর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা, প্রতিপালক হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়া এবং তাঁর অনুগ্রহকে তুচ্ছ জ্ঞান করা– এ সবই অহংকার প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট নমুনা। এভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য পরিহার করা এবং ইবাদত বিমুখ থাকা অহংকারের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করা হলে এবং নিজেকে অতিমূল্যায়ন করা হলে নিজের যশ, খ্যাতি, প্রভাব,

প্রতিপত্তি, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদির বিষয়ে আল্লাহ্‌র হাত ছাড়া নিজের ক্ষমতাবলে প্রাপ্ত বলে দাবি করলে প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করা হয়। এভাবে আল্লাহ্‌কে হীন মূল্যায়িত করে নিজেকে অতিমূল্যায়িত করা অহংকারের অন্তর্ভূক্ত। অহংকার করার অধিকার কেবলমাত্র তারই আছে, যে কারো মূখাপেক্ষী নয়। একমাত্র আল্লাহ্‌ই অমূখাপেক্ষী, এছাড়া সবকিছুই তাঁর মূখাপেক্ষী। তাই অহংকার করার দাবিদার একমাত্র আল্লাহ্‌। আর আল্লাহ্‌ কোন অহংকারী দাম্ভিককে পছন্দ করেন না। তাই তিনি মানুষকে অহংকার করতে নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

" আল্লাহ্‌ বলেনঃ মান সম্মান আমার ভূষণ এবং গর্ব-অহংকার আমার চাদর। যে ব্যক্তি আমার সাথে এই ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে, তাকে আমি শাস্তি প্রদান করব।"

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ৬৪৪৩

অহংকার মানুষকে সীমালঙ্ঘনকারী বানিয়ে ফেলে, যার ফলে সে ইবাদাত বিমুখ হয়ে শির্‌কের মত চরম অপরাধ সংঘটিত করে। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক দাম্ভিক সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না। তার জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি। পবিত্র কোরআনে বহু ঘটনা বর্ণিত আছে যেখানে অহংকারীদের শাস্তি বিধানের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম অহংকার প্রদর্শনের ঘটনাটি ঘটেছিল মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নে। ইবলিস শয়তান আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে মাটির সৃষ্ট আদম (আঃ) কে সিজদা করতে অস্বীকার করে অহংকার করেছিল। তার এই অহংকারের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্‌ ইবলিসকে চির অভিশপ্ত করে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তাকে সহ তার অনুসারীদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে চির জাহান্নামী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে,

"এবং যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলে সিজদা করল; সে অগ্রাহ্য করল ও অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।"

আল-কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত-৩৪

এর পরে পৃথিবীতে অহংকার প্রদর্শন করে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হয়েছিল যারা তাদের মধ্যে ফেরআ'উন, হামান ও কারূন প্রমূখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারূন সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন,

"কারূন ছিল মূসা (আঃ) এর সম্প্রদায়ভূক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, "দম্ভ কোরো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অহংকারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ্‌ তোমাকে যা দিয়েছেন তদ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর আর দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলো না; এবং পরোপকার কর যেমন আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বিপর্যয় সৃষ্টিটকারীকে ভালবাসেন না।" সে বলল, "এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।" সে কি জানত না যে, আল্লাহ্‌ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠীকে যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? কারূন তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, "আহা! কারূনকে যেরূপ দেওয়া হয়েছে আমাদের যদি তা দেওয়া হত! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান।" আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, "ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পাবে না।" অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করেছিলাম। তার স্বপক্ষে

এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত। এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে সক্ষম ছিল না।"

আল-কোরআন, সূরা কাসাস, আয়াত-৭৬-৮১

আলোচ্য আয়াতগুলিতে কারূনের ঘটনা বিবৃতির মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষের কাছে তাঁর সার্বভৌমত্ব এবং সর্বময় কর্তৃত্বের বৈশিষ্টের পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং একই সাথে তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত উদ্ধত-অহংকারীদের পরিণতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা থেকে পরিত্রাণের রাস্তা বাতলে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এখানে ধন-সম্পদের সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয়ের সাথে তা ব্যবহারের সঠিক দিক-নির্দেশনা রয়েছে। রিয্‌ক তথা ধন-সম্পদ দান করা ও তা কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র; তিনি ছাড়া আর কারো সে ক্ষমতা নেই। ধন-সম্পদের বৈধ অধিকারী হওয়া এবং তা থেকে নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন পুরা করা যেমন, ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, ভাল পরিধান করা এবং এ নিয়ামত থেকে উপকৃত হওয়া, এ সকল কিছুর বৈধতা রয়েছে। তবে ধন-সম্পদের অপব্যবহার বা কৃপণতা করার কোন বৈধতা নেই। নিজের বৈধ দাবী পূরণ করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র হক যেমন যাকাত, নফল সদকা ইত্যাদি আদায় করা ও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করাও জরুরী। অভাবী, মিসকিন, যাঞ্চাকারী, গরীব আত্মীয়-স্বজন এদের প্রত্যেকের জন্য এ সম্পদের মধ্যে আল্লাহ্ হক নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করা জরুরী। এ সকল হক আদায় করে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সমীচীন। আর যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌র মাখলুককে কষ্ট দেয় এবং তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে, তাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না। ধন-সম্পদের আধিক্যে অহংকার প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র হক আদায় না করা হলে তার পরিণতি নিশ্চিত কারূনের অনুরূপই হবে। এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত অহংকার থেকে সৃষ্ট শির্‌কের আর একটি নমুনা উপস্থাপন করা হল। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

"তুমি তাদের কাছে পেশ কর একটি উপমা। দুই ব্যক্তির উপমাঃ তাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি দ্রাক্ষা উদ্যান এবং এই দু'টিতে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও দু'এর মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র। উভয় উদ্যানই ফল দান করতো এবং এতে কোন ত্রুটি করতো না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর। এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, 'অমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী'। এভাবে নিজের প্রতি যুলুম করে (অহংকার) সে তার উদ্দানে প্রবেশ করলো। সে বললো, "আমি মনে করিনা যে এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে; আমি মনে করিনা যে কিয়ামত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাবো।" তদুত্তরে তাকে তার বন্ধু বললো, "তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তারপর পূণাঙ্গ করেছেন মানুষ আকৃতিতে? কিন্তু আমি বলিঃ আল্লাহ্-ই আমাদের প্রতিপালক এবং আমি কাউকেই আমার প্রতিপালকের শরীক করি না। তুমি যখন উদ্যানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, আল্লাহ্ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে-আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই? তুমি যদি ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে কর, তবে সম্ভবতঃ প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যান আকাশ হতে অগ্নি বর্ষণ করবেন যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে। অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনো ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।" তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা সে ব্যয় করেছিল তার জন্য হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগলো, "হায়!

আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম।" আর আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না। এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার আল্লাহ্র, যিনি সত্য; পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।"

আল-কোরআন, সূরা কাহফ, আয়াত- ৩২-৪৪

উল্লিখিত আয়াতগুলিতে ঘটনার বিষয়টি এত পরিস্কারভাবে বিবৃত হয়েছে যে, এ সম্পর্কে আর অতিরিক্ত কোন বর্ণনা পেশ করার প্রয়োজন পড়ে না। তবে দু'ব্যক্তির সংলাপের মাধ্যমে যে অন্তর্নিহিত সত্য ফুটে উঠেছে সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। মুমিন লোকটি দরিদ্র হওয়া সত্বেও সদা-সর্বদা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করত এবং কেবল আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতার কারণে তার চিন্তা-চেতনা ছিল আখিরাতকে ঘিরে। তাই সে পরকালের কল্যাণ লাভের আশায় দুনিয়ার কষ্ট ভুলে থাকতে পেরেছিল। অপরপক্ষে, সম্পদশালী লোকটি নিজের যোগ্যতাবলে সম্পদ হাসিল হয়েছে ভেবে আল্লাহ্র অনুগ্রহকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অহংকারী হয়ে গেল। উপরন্তু সে কিয়ামতকে অস্বীকার করে বসল এবং ধারণা করে নিল যে তার সম্পদ কোনদিনও ধ্বংস হবার নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তার নির্বুদ্ধিতা, বেঈমানী, অহংকার আর দুনিয়ার প্রতি কঠিন আকর্ষণের বহিঃপ্রকাশ। এভাবে লোকটি প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করে নিজেকে আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করিয়ে নিয়ে কুফরীতে লিপ্ত হয়ে গেল। অনন্তর আল্লাহ্র ইচ্ছায় তার ধন-সম্পদ সব ধ্বংস হয়ে গেল; না কেউ তার সাহায্যার্থে এগিয়ে এল, না সে নিজে প্রতিকারে সমর্থ হল। তার গর্ব-অহংকার মাটির সাথে মিশে গেল। তখন তার বোধোদয় হলো এবং প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পেরে আল্লাহ্র সাথে শরীক করার জন্য অনুতাপ ও আক্ষেপ করতে থাকল। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ঘটনা বা ইতিহাস বর্ণনা করার পশ্চাতে কি উদ্দেশ্য নিহিত থাকতে পারে? এর উত্তরে বলা যায় যে, মানুষকে হিদায়েতের রাস্তা বাতলে দেয়ার উদ্দেশ্যে অনেকটা ব্যবহারিক শিক্ষার মত শিক্ষা দান করার জন্য আল্লাহ্ এ পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে বিষয়ের গভীরে যতটা প্রবেশ করা যায় এবং যতটা গুরুত্ব আরোপ করা যায়, মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতাও ততটা বেড়ে যায়। তবে মানুষের উচিত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক অতীতের বহু সম্প্রদায় ও ব্যক্তির সাফল্য ও ব্যর্থতার কাহিনী তুলে ধরে এর মাধ্যমে মানুষের জন্য অনেক তথ্য বহুল দিক-নির্দেশনা দান করেছেন। আমাদের উচিত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া। বর্তমান দুনিয়ায় যারা সম্পদশালী রয়েছেন, তাদের জন্য উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে যে জীবন দর্শন রয়েছে তা হল– ধন-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী আর নেক আমল চিরস্থায়ী। রিযিক দান করা ও তা কেড়ে নেয়া একমাত্র আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্ মানুষের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন- কে তাদের মধ্যে কর্মে উত্তম! ধন-সম্পদের আধিক্যের চেয়ে অল্পে তুষ্ট থাকা শ্রেয়। ধন-সম্পদের প্রত্যাশী না হয়ে আখিরাতের কল্যাণ কামনাই উত্তম এবং বাঞ্ছনীয়। সম্পদ অর্জিত হলে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা চাই এবং আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে বিরত থাকা চাই। সম্পদের ভারে নিজ জ্ঞানবলে বা যোগ্যতা বলে তা অর্জিত হয়েছে ভেবে অহংকার করে নিজেকে আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করিয়ে শির্ক করা চাই না। কোরআনে বর্ণিত এ ঘটনাগুলি সমাজের সম্পদশালী লোকদের জন্য অশনি সংকেত। বিত্তশালীদের উচিত ঘটনার আলোকে মনের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নেয়া এবং কোন প্রকার আবর্জনা ও অসঙ্গতি থাকলে তা দূর করে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে নিতে সচেষ্ট হওয়া। যে সকল লোক 'আমার বাড়ী, আমার ধন, আমার সম্পদ' বলে গর্ব-অহংকার করে, তাদের জেনে নেয়া উচিত যে, সম্পত্তির প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্; মানুষকে শুধু সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এটা একটা আল্লাহ্র পরীক্ষা এবং এর মধ্যে দিয়েই আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের বাছাই করে থাকেন। সম্পদ যখন আল্লাহ্র তখন তা আল্লাহ্র নির্দেশিত

পন্থায়-ই উপার্যণ ও খরচ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই আসুন আমরা সবাই সম্পদের প্রকৃত হক আদায় করে এবং গর্ব-অহংকার পরিত্যাগ করে শির্ক মুক্ত আমলের মাধ্যমে পরকালের নাজাত প্রাপ্তির পথ সুগম করতে ব্রত হই।

ছোট শির্ক (Minor Shirk)

শির্কে আকবর নয় এমন যে সব কর্মকে শরীয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা শির্ক বলা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শির্কে আসগর বা ছোট শির্ক। একজন মানুষ তাওহীদবাদী হওয়া সত্ত্বেও তার আমলের মাধ্যমে যখন এর ব্যতিক্রম কিছু পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও কাজে-কর্মের মাধ্যমে যখন কোন কিছুকে আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তখন সেটা ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হবে। 'শির্ক কি ও কেন?' গ্রন্থের প্রণেতা ড. মুহাম্মদ মুয্‌যাম্মিল আলীর মতে ছোট শির্কের সংজ্ঞা হলোঃ

"এমন সব কথা বা কাজ যদ্বারা বাহ্যিকভাবে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সমান করে নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও এই সমান করাটি প্রকৃতপক্ষে কর্তা ব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়।"

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ছোট শির্ক অনেকটা মানুষের শির্কী উদ্দেশ্য বহির্ভূত কর্ম, যা প্রকারান্তে শির্ক সংঘটিত করে। তবে শির্কে আসগর কখনও কর্তা ব্যাক্তির মানসিক অবস্থা, উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাসের স্তরের উপর ভিত্তি করে শির্কে আকবরেও রূপান্তরিত হতে পারে। আল্লাহ্‌র সমকক্ষ নির্ধারণ করা হয় এমন কোন কথা ও কাজ যখন কর্তা ব্যক্তির বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে করা না হয়, তখন সেটা শিরকে আসগর বা ছোট শির্ক হিসেবে বিবেচিত হবে; কিন্তু ঐ একই কর্মটির সাথে যখন কর্তা ব্যক্তির বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য এ দু'য়ের সমন্নয় সাধিত হয় তখন সেটা শির্কে আকবর বা বড় শির্ক হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, তা'বীজের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে ছোট শিরকের অন্তর্গত কিন্তু তা প্রদানকারী ও ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বড় শির্কেও রূপান্তরিত হতে পারে। যদি কেউ মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীতই তা'বীজ মানুষের উপর নিজ থেকেই প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তখন সেটা হবে বড় শির্ক। আর যদি সে মনে করে যে, আল্লাহ্‌র

ইচ্ছাতেই তা'বীজ কাজ করে থাকে তখন সেটা হবে ছোট শির্ক। এভাবে জ্যোতিষী বা গণকের কাছে আনাগোনা করা এবং এদের কথায় বিশ্বাস করা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু কখনও কখনও তা বড় শির্ক হিসেবেও গণ্য হতে পারে যখন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে এদের উপর নির্ভশীল থাকে এবং তাদেরকে নিজে থেকেই ইলমে গায়েবের হকদার বলে মনে করে। এ ছাড়াও অন্যন্য প্রকারর ছোট শির্কও কর্তার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বড় শির্কে রূপান্তরিত হতে পারে।

ছোট শির্কের ভয়াবহতা এবং শির্ককারীর পরিণতিঃ

ছোট শির্ক হচ্ছে বড় শির্কের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক। ছোট শির্ক সাধারণ কবিরা গুণাহের অন্তর্গত। শরিয়তের দৃষ্টিতে ছোট শির্ক এমন পর্যায়ের অপরাধ যে, কার্যত একজন মানুষ এ গুণাহে লিপ্ত থাকলে–

- **সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না।**
- **তার অপরাধ সাধারণ কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত**
- **তার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার এখতিয়ারে; এ অপরাধের জন্য আল্লাহ্ চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করে দিতে পারেন।**
- **তার সংশিষ্ট নেক আমলটি বরবাদ হয়ে যায়।**

আপাতঃদৃষ্টিতে ছোট শির্ককে লঘু অপরাধ বলে মনে হলেও এর বাস্তবতাকে খাটো করে দেখার কোন উপায় নেই। কেননা এটি একটি কবিরা গুণাহ এবং তা একজন মানুষের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা না করলে এর জন্য তাকে আখিরাতে কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। আবার যখন কোন ব্যক্তি অব্যাহত ভাবে ছোট শির্কে লিপ্ত থাকে তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এভাবে তার নেক আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যেতে পারে এবং তা তার জন্য বয়ে আনতে পারে প্রভুত অকল্যান এবং আখিরাতের জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। তাই ছোট শির্কের অপরাধকে লঘু মনে করে নির্বিকারে এবং অব্যহতভাবে এ গুণাহের সাথে লিপ্ত থাকার অবকাশ রয়েছে বলে ভাববার কোন সুযোগ নেই। পাপ করলেও শাস্তি ভোগ করতে হবেনা– এমনটি নিশ্চিত হয়ে পাপের কাজ চালিয়ে যাওয়া কোনো সুস্থ মানসিকতার পরিচয় নয়। বস্তুতঃ এ ভাবনায় বিভোর হয়ে যারা পাপের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা নিতান্তই ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে। পরকালীন কল্যাণের জন্য ছোট শির্ক সহ অন্যান্য সকল গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাকা তাই সকলেরই ব্রত হওয়া বাঞ্ছণীয়।

ছোট শির্কের শাখা সমূহঃ

ছোট শির্কের অনেকগুলি শাখা রয়েছে। প্রধানতঃ ছোট শিরক্কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ অপ্রকাশ্য বা গোপণ শির্ক এবং প্রকাশ্য শির্ক।

ক. অপ্রকাশ্য শির্কঃ

অপ্রকাশ্য শির্ক বলতে এমন সব বিষয়কে বুঝান হচ্ছে যা চোখে দেখা যায় না অথবা কানে শোনা যায় না এমনকি তা অনুভব করাও দুস্কর। কর্তা ব্যক্তির অগোচরেই সংঘটিত হয় এ শির্ক। এ শির্কের প্রধান শাখা হচ্ছে রিয়া। এ ছাড়াও শির্কে খফীও এ শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

০ রিয়াঃ ভাষাগতভাবে রিয়া এসেছে মূল শব্দ 'র'য়া' হতে- যার অর্থ দেখানো, অবলোকন করানো, দৃশ্যমান করা। পরিবর্তিত শব্দ যার অর্থ ভণ্ডামি, কপটতা। শরিয়তের দৃষ্টিতে **"রিয়া বলতে বুঝায় এমন কোন ইবাদত বা নেক আমল যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়ছে বলে মনে হয় অথচ তা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে দেখানো বা অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জন করার নিয়্যতে করা হয়।"** সংজ্ঞাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, রিয়া সৃষ্টি হয় অন্তরে নিয়্যাতের মাধ্যমে। অন্ড্রের কাজটি হল ঈমানের ভিত্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা দেহের কাজ হল এর অনুসরণ এবং বাস্ড্রায়ন। অন্ড্রের ইবাদাত দৈহিক ইবাদতের চেয়ে মহৎ। অন্ড্র রের নিয়্যত ছাড়া দেহের ইবাদত অর্থহীন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিয়্যত বা অন্ড্রের অকাঙ্খাই হচ্ছে যে কোন কাজের মৌলিক বিষয় ও দ্বীনের ভিত্তি আর তাই এটাই রিয়া সংঘটনের উপাদান। রিয়া মূলত দ্বীনের কোন কাজ অর্থাৎ ইবাদত ও সওয়াবের লক্ষ্যে সম্পাদিত নেক আমলের সাথে সম্পৃক্ত; কিন্তু মুয়ামালাত অর্থাৎ স্রেফ দুনিয়াবী কাজের সাথে এটা সম্পর্কিত নয়। বিভিন্ন প্রকারের ইবাদতের যে কোনটির চর্চা লোকদেখানো বা লোকের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং কোন প্রকার যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং আর্থিক সহ পার্থিব যে কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে সম্পাদন করাই হচ্ছে রিয়া। মানুষ স্বভাবতঃই সঙ্গী-সাথী বা অন্য লোকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে আশা করে এবং পেলে আনন্দিত হয়। কেউ যদি অপ্রত্যাশিতভাবে কারো প্রশংসা পেয়ে যায় সেটা কোন দোষের কিছু নয়। কিন্তু কোনো ইবাদত ও নেক আমলের ক্ষেত্রে অন্য মানুষের প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করা দোষণীয়। কেননা ইবাদতের মূল শর্ত হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌র সমীপে নিজেকে সমর্পন করা এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ তায়ালার রাজী-খুশীর জন্য নিজেকে নিবেদন করা। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোনো মানুষকে দেখানো বা তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করার প্রচেষ্টা করা রিয়ার অপরাধ সংঘটিত করে থাকে। মোটকথা, যাতে মানুষকে খুশী করা যায় এবং মানুষের প্রশংসা কুঁড়ান যায় এমন নিয়্যতে সম্পাদিত লোকপ্রদর্শণীমূলক সকল ইবাদত বা নেক আমলই রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

কোনো নেক আমল লুক্কায়িতভাবে করার পর মানুষের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তা কাউকে জানান বা বলে বেড়ানও এ শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

রিয়া একটি মুনাফিকী বৈশিষ্ট্য যেখানে ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের সাথে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা নিয়তের কোনো মিল থাকে না। কেউ জানেনা কর্তা ব্যক্তির অন্তরের অবস্থা একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া। রিয়া যেহেতু নিয়্যাত এবং অন্তরের আকাঙ্খার উপর নির্ভর করে সংঘটিত হয়ে থাকে তাই এর কোনো বাহ্যিক রূপ নেই; এ কারণেই এটি গোপণ শির্ক নামেও অভিহিত। এখানে নিয়্যাতের বিভিন্নতা থাকতে পারে– হতে পারে ইবাদত বা নেক আমলের নিয়্যাতটি সম্পূর্ণ মিথ্যা নিয়্যত যেখানে আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের কোন চেতনা নেই, শুধু মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনই মূখ্য অথবা হতে পারে নিয়্যাতটি আংশিকভাবে সত্য যেখানে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্‌ আছেন এবং সেই সাথে অন্য মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন এবং প্রশংসা পাওয়ারও ইচ্ছা থাকে, এ উভয় অবস্থায়ই রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে।

রিয়া ছোট শির্কের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। রিয়া থেকে বেঁচে থাকতে মানুষকে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কেননা রিয়া মিশ্রিত আমল আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ নেক আমল শুধু মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করলে অথবা সওয়াবের জন্য করলেও তার মধ্যে মানুষকে দেখানোর মনোভাব লুকায়িত থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এর কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না। এ শির্কের বিষয়ে নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার উম্মতদের জন্য খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"তোমাদের উপর আমার যে জন্য ভয় হয়, তা হচ্ছে ছোট শির্ক"

সাহাবাগণ জিজ্ঞাস করলেন,

"হে আল্লাহর রাসুল, ছোট শির্ক কি?"

তিনি উত্তরে বললেন,

'রিয়া'। প্রতিফল দিবসে আল্লাহ্ যখন তাঁর বান্দাদেরকে প্রতিদান দেবেন, সেদিন তিনি তাদেরকে বলবেন, পৃথিবীতে যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা নেক আমল করতে, তাদের কাছে যাও। দেখ প্রতিদান পাও কিনা।"

হাদিস, মুসনাদে আহম্মদ, নং ২৭৭৪২

সকল ইবাদত নিবেদিত হতে হয় আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে। সেখানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে কাউকে শরীক করা যাবে না। কিন্তু রিয়া মিশ্রিত ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষকেও শরীক করে নেয়া হয়। তাই রিয়ার আমল আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়। এ সম্পর্কে আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, আল্লাহ্ বলেনঃ

"আমি শরীকদের শির্ক থেকে মুক্ত। যে কেউ আমার জন্য আমলের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরীক করলো আমি সে আমল ও শরীককে প্রত্যাখ্যান করি। আর সে আমল তার জন্য যার সে শরীক করেছে।"

হাদিস, সুনানে ইবনে মাজাহ, নং ৪২০২

অন্য একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু সাঈদ ইবনে ফাযালা আনসারী (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে কিয়ামতের দিনে একত্রিত করবেন, যে দিনের ব্যপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি কোন সন্তুষ্টিমূলক আমলে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক করেছে, সে যেন তার আমলের সওয়াব আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে চেয়ে নেয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা শরীকের অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।"

হাদিস, হাদিস, সুনানে ইবনে মাজাহ, নং৪২০৩

রিয়া সংঘটিত হতে পারে বিভিন্ন উপায়। সময়ের সাথে কাজের সম্পর্ক নির্ণয়ের করে রিয়া যেভাবে সংঘটিত হতে পারে তার একটি বিবরণ দেয়া যেতে পারে:

০ কাজটি করার পূর্বে: কোন নির্দিষ্ট ইবাদত বা নেক আমলের শুরুতেই লোক দেখানো এবং লোকের প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছা বা নিয়্যাত থাকতে পারে। এরূপ ব্যক্তি হয় মোনাফিক নয়তো সে এ কর্মের মাধ্যমে মুনাফিকের সন্নিকটে পৌঁছে যায়। এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য কোন কাজ করার চিন্তা করে না, সে চায় শুধু পরিচিতি। যেমন: কোন ব্যক্তি যখন সালাতে দাঁড়ায় তার অন্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছা মোটেই থাকেনা বরং মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই সে সালাত পড়ে। এরূপ ব্যক্তিকে কোরআনের ভাষায় পরিস্কার মুনাফিক বলা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক বলেন,

"অবশ্যই মুনাফিকরা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেয়, এরা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন একান্ত অলসভাবেই দাঁড়ায়, আর তারা কেবল লোকদের দেখায় এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে আসলে কমই স্মরণ করে।"

আল কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত -১৪২।

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যারা নামাযে আলসেমী করে এবং লোক দেখানোর জন্য নামায আদায় করে তারা প্রকারান্তে ঐ মুনাফিকতের দলভুক্ত। এটা জঘণ্যতম রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

০ কাজটি করার সময়: ইবাদত বা নেক আমল সম্পাদনের সময়ও রিয়া সংঘটিত হতে পারে। এখানে একজন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই কাজটি শুরু করে। কিন্তু যখন সে লক্ষ্য করে যে লোকেরা তাকে দেখছে তখন সে বাস্তবে যতটা ধার্মিক তার চেয়েও অধিক ধার্মিক সাজার জন্য তার কাজটি আরো সুন্দর করে পরিচালনা করার প্রচেষ্টা করে। যেমন: কেউ হয়ত মসজিদে একাকী সালাত আদায় করছে, কিন্তু যখন দেখল লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে আছে, তখন সে তার সালাতকে আরো সুন্দর ও অলংকৃত করল অর্থাৎ দীর্ঘ কিরাত পাঠ করল, ধীরস্থিরভাবে এবং দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী রুকু ও সিজদা করল ইত্যাদি। তার এ আচরণ রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকারের শির্‌ক অত্যন্ত গোপণীয় এবং সন্দেহাতীতভাবে এই শির্‌কের প্রকৃতি অনুভক করা যায়না। এমনকি কর্তা ব্যক্তিও তা অনুভব করতে পারে না যে এ জাতীয় আচরণের মধ্যে শির্‌ক লুক্কায়িত থাকতে পারে। এ শির্‌কের কোন বাহ্যিক রূপ নেই। তাই এটা গোপণ শির্‌ক নামে অভিহিত। নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ প্রকারের গোপন শির্‌ক থেকে সকলকে সাবধান থাকতে বলেছেন। মুহাম্মদ ইবনে লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে,

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাহির হয়ে বললেন,
"হে লোক সকল! গোপন শিরক থেকে সাবধান থাকো"
সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন,
"হে আল্লাহ্‌ও রাসূল! গোপণ শির্‌ক কি?"
তিনি বললেন,
"যখন একজন মানুষ সালাতে দাঁড়ায় এবং খুব আগ্রহ সহকারে সুন্দরভাবে সালাত আদায় করে, কারণ মানুষ তার সালাতকে দেখছে, সেটা গোপণ শিরক।"

হাদিস, মুসনাদে আহম্মদ

এক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ দিয়ে তার অন্তরের অবস্থা জানার কোন উপায় নেই। এ শির্‌ক খুব হাল্কা ও গোপণীয় হয়। স্বয়ং শিরক্‌কারী ব্যক্তিও অনুভব করতে পারে না যে, তার আচরণের মধ্যে শির্‌ক লুক্কায়িত থাকতে পারে। এমন সব আচরণ ছোট শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা স্থূল দৃষ্টিতে শির্‌ক বলে প্রতীয়মান

হয় না; কিন্তু সুক্ষ্ম বিচারে তার আচার আচরণে শির্ক সংঘটিত হয়। এ শির্কের গোপণীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করে তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু মুসা আশয়ারি (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, একদা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাষণে বলেন,

"হে লোক সকল! তোমরা গোপন শিরক থেকে বেঁচে থাকো! কেননা এটাতো অন্ধকার রাত্রে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়ার চলাচলের চেয়েও গোপনীয় ও সুক্ষ্ম।"

তফসীর ইবনে কাসীর, ১২ খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা

আল্লাহ্ তা'আলার হীনমূল্যায়ন থেকে এ শির্কের উৎপত্তি হয়। অজ্ঞতার কারণে মানুষ এমন সব আচরণ ও কর্ম-কাণ্ড করে যা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্তকে খর্ব করে ফেলে। বুদ্ধিমত্তার ত্রুটির কারনে মানুষ অহংকারী, উদ্ধত এবং আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়। তখন তাদের আচার-আচরণে আল্লাহ্ হীনমূল্যায়িত হন–যা প্রকৃতপক্ষে শির্ক। এজন্য কোন কোন মনীষী এ জাতীয় গোপন শির্ককে আলাদাভাবে শির্কে খফী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত এ শির্ক অন্তরের ইচ্ছা বা নিয়তের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়ে থাকে। নিয়ত প্রকৃতিজাত এবং এর অনুপ্রেরণা যোগায় অন্তরাত্মা। মনের গভীরে অত্যন্ত সংগোপন থাকে এর চলাচল। তাই সাধারণ মানুষের মত একজন মুমিন ব্যক্তিরও গোপন শিরকে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। বস্তুতঃ একজন প্রকৃত ঈমানদার এবং আলেম ব্যক্তির ইবাদতও রিয়া বা শির্কে খফীতে পরিণত হতে পারে যখন তার মধ্যে লোক দেখানোর মনোভাব লুকায়িত থাকে। এ ধরনের লোক দেখানো এবং বড়াইপূর্ণ সালাত আদায়কারীর উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসুল গোপন শিরকের ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং এ প্রকারের গোপন শির্ক থেকে বেঁচে থাকার জন্য সচেষ্ট হবার তাকীদ দিয়েছেন। এ শির্কের প্রকৃতি এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় অন্য একটি হাদিসের মাধ্যমে। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন,

"একদিন রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **আমাদের নিকটে আসলেন তখন আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম।"**

তখন তিনি বলেন,

> **"আমি কি তোমাদের এমন বিষয় অবহিত করব না যা আমার নিকট তোমাদের জন্য দাজ্জালের ফিতনা থেকেও ভয়াবহ?"**

রাবী বলেন,

> **"আমরা বললাম, হ্যাঁ! অবশ্যই বলুন।"**

অতঃপর তিনি বললেন,

> **"শির্কে খফী! এর ধরণ হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি নামায পড়ার জন্য দাঁড়ায়, অতঃপর কেহ তাকে দেখছে বলে নামাযকে খুব সুন্দর করে আদায় করল।**

হাদিস, সুনান ইবনে মাজাহ নং ৪২০৪

০ কাজটি সংঘটিত হবার পর: যখন কোন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ইবাদত করে এবং পরে এর জন্য সে লোকের প্রশংসা পেতে শুরু করে, তখন সে তার কর্মের জন্য গর্ব বোধ করতে থাকে এবং লোকদের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসায় খুশী হয়। প্রকৃতপক্ষে সে তখন চায় যে, লোকে তাকে আরও প্রশংসা করুক। অবশেষে তার মনে এই সামান্য কর্মের জন্য অহংকার বোধ জাগ্রত করতে শয়তান সফল হয়। যেমন: কেউ যখন আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করে ফিরে আসে , তখন তার প্রতি অবিরত প্রশংসার

কারণে সে পরিশেষে জেহাদের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যায় আর বর্ষিত প্রশংসা উপভোগ করতে থাকে। তখন সে চায় তার খ্যাতি চারদিকে লোকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক। এভাবে শয়তান একজন ঈমানদারকে ধোঁকায় ফেলে দেয়। ফলে তার নেক আমলটি পরিশেষে বরবাদ হয়ে যায় এবং এ ব্যক্তি তার কর্মের পুরো ফল না পাওয়াই সম্ভাব্য, আর আল্লাহ্‌র সবথেকে ভাল জানেন।

এ বিষয়টি মনে রাখা উচিত যে, একজন সত্যিকারের ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রশংসায় অস্বস্তিবোধ করা। কারণ তিনি উপলব্ধি করেণ এটি তার অভিপ্রায়ের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক।

বিভিন্ন প্রকার ইবাদতে যেভাবে রিয়া সংঘটিত হয়ঃ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন প্রকারের ইবাদত-বন্দেগী করে থাকি, তন্মধ্যে সালাত, রোজা, যাকাত, হজ্জ, কোরবানী, দান-খয়রাত ইত্যাদি বিশেষ উল্ল্যেখযোগ্য। এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলিতে সাধারণতঃ যে সকল উপায়ে রিয়া সংঘটিত হতে পারে তার কিছু বাস্তব নমুনা আলোচনা করা প্রয়োজন:

সালাতঃ মানুষ যখন আল্লাহ্‌কে রাজি-খুশী করার পরিবর্তে লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে, লোকের প্রশংসা পাওয়ার জন্য সালাত আদায় করে, তখন এটা রিয়ায় পরিণত হয়। এখানে শুধুমাত্র নিয়তের ত্রুটির কারনেই আল্লাহ্‌র মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়ে থাকে এবং মানুষ অগ্রাধিকার পায়। মানুষ কখনও কখনও ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিলের জন্য বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য অথবা লোকের ভয়ে বা লজ্জায় ঈমানদার সাজার চেষ্টা করে এবং এই ধরনের প্রদর্শনীর সালাত আদায় করে থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র ভয় বা তাঁর সন্তুষ্ট অর্জনের লক্ষ্য মোটেই থাকেনা। এটা হচ্ছে মুনাফিকের সালাত। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত আল্লাহ্‌র কাছে এই ধরনের সালাতের কোন মূল্য নেই এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা দুর্ভোগ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন,

"সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাতে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে।"

আল কোরআন, সুরা মাউন, আয়াত-৪,৫,৬।

আবার একজন নিয়মিত সালাত আদাযকারী প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির সালাতও রিয়ায় পর্যবশিত হতে পারে। এটা অতি সুক্ষ্ণ প্রকারের গোপন শির্‌ক যেটাকে কেউ কেউ শির্‌কে খফী নামে অভিহিত করেছেন। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রোজাঃ রোজা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে রোজাদারদের পুরস্কৃত করবেন। কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া অন্য কার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রোজা পালন করে বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বা লোকের ভয়ে রোজা রাখে তখন সেটা রিয়ায় পরিণত হয়। শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) হতে বর্নিত একটি হাদিসে আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি,

"যে ব্যক্তি অপরকে দেখানোর জন্য সিয়াম বা রোজা রাখল সে শির্‌ক করল।"

হাদিস, মুসনাদে আহম্মদ

হজ্জঃ হজ্জ একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত। হজ্জের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আলাহ্ তা'আলার আদেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কিন্তু এক শ্রেনীর মানুষ আলহাজ্জ্ব খেতাব নিয়ে লোকদের নিকট সম্মানিত হবার জন্য বা ন্যায়পরায়ণ সাজার জন্য হজ্জ্ব পালন করে থাকে। তাদের মূল উদ্দেশ্য সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল। কিন্তু যেই হজ্জ্ব আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের পরিবর্তে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয় সেটা প্রকারান্তে মানুষের উপাসনা এবং রিয়া বই কিছুই নয়। শাদ্দাত বিন আউস (রাঃ) হতে বর্নিত একটি হাদিসে আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

"যে ব্যক্তি লোকের নিকট ন্যায়পরায়ন সাজার জন্য বা স্বনামধন্য হবার জন্য হজ্জ পালন করল সে শিরক করল।"

হাদিস, মুসনাদে আহম্মাদ

যাকাত ও অন্যান্য দান সাদকাঃ যাকাত একটি ফরয ইবাদত। এ কাজটি যথার্থই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা উচিত। যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে যদি কোন প্রকার প্রদর্শনীর ইচ্ছা বা 'দানবীর' খেতাব হাসিলের ইচ্ছা পোষণ করা হয় তাহলে সেটা হবে রিয়া। সমাজে একশ্রেণীর মানুষ এভাবে আল্লাহ্র পরিবর্তে লোকদের খুশী করার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেষ্ট। কারণ এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্র তৈরি করে থাকে। যাকাতের সাথে সাথে অন্যন্য দান সাদকা করতেও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়াও জন কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজ যেমন-মসজিদ, মাদ্রাসা সহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কার, রাস্তা-ঘাট, পুল ইত্যাদি নির্মাণ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। কিন্তু এ কাজগুলি শুধু 'ফি-সবিলিল্লাহ' না হয়ে যদি লোক দেখানোর জন্য এবং অন্যকে খুশী করা বা দুনিয়াবী ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে করা হয় তাহলে সেটা রিয়া হিসেবে গণ্য হবে। এ প্রকারের দান-খয়রাত আলাহ্র কাছে অগ্রাহ্য হবে এবং দানের কোন বিণিময় পাওয়া যাবে না। এদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্পাক বলেন,

"হে মুমিনগন! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করোনা যে নিজের ধন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই দান করে।"

আল কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত-২৬৪।

সমাজে একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্র পরিবর্তে লোকদের খুশী করতেই বেশী ব্যস্ড়। তারা এর মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা সহ ক্ষমতালাভ এবং অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্র তৈরী করার আকাঙ্খা করে থাকে। কেউবা দানবীর খেতাব হাসিল করে স্বনামধন্য হওয়ার জন্য দান-খয়রাত করে, আবার কেউবা নিছক যশ-খ্যাতি লাভ করে আত্মতৃপ্ত হওয়ার জন্য দান করে; সেখানে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশা মোটেই থাকে না বা থাকলেও সেটা মূখ্য নয়, অথবা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সাথে সাথে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জণেরও প্রচেষ্টা করে– এ জাতীয় সকল আমল রিয়া বৈ কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ: যখন কোন ব্যক্তি স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদিতে দান করে লোকের স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকার জন্য বা কোনো পার্থিব লাভের আশায় ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নামকরণে নিজের বা বাপ-দাদার নাম ফলক খোদাই করে দেয়, তখন সেটা রিয়া পর্যায়ের একটা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

রিয়াকারগণকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না এবং এদের আমলও আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হয় না। একজন রিয়াকার প্রকৃত ঈমানদার নয়, বস্তুত সে শয়তানের সাথী। এজন্যই এদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"(আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পছন্দ করেন না) যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এবং পরকালের প্রতি

বিশ্বাস স্থাপন করে না, আর শয়তান যদি কোনো ব্যক্তির সাথী হয় তাহলে সে নিকৃষ্ট সাথীই বটে। ”

আল কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত-৩৮।

জেহাদঃ মুসলিমদের জন্য জেহাদ একটি ফরয ইবাদত। জেহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে সমুন্নতরাখার উদ্দেশ্যে ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়ান। জেহাদ অত্যান্ত পূণ্যের কাজ যদি তা শুধু ‘ফি সবিলিল্লাহ’-র নিয়তে করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে খুশী করা বা দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে জেহাদ করা হলে তার কোনো বিণিময় আল্লাহ্র কাছে পাওয়া যাবে না। যদি শুধু সুনামের উদ্দেশ্যে অথবা সওয়াব ও সুনাম উভয় উদ্দেশ্যে জেহাদ করা হয় এমতবস্থায় কোনো পূণ্য আশা করা যায় না। এ বিষয়ের উপর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) হতে। তিনি বলেন,

এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এসে বললেন,

“ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি সওয়াব ও সুনামের জন্য জেহাদ করে, তার জন্য কি রয়েছে? ”

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

“তার জন্য কিছুই নেই।”

সে ব্যক্তি তা তিনবার পূণরাবৃত্তি করল। রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনবারই একই উত্তর দিলেন। তারপর তিনি বললেন,

“আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর জন্য কৃত খাঁটি আমল ব্যতীত– যা দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই উদ্দেশ্য না হয়, আর কিছুউ কবুল করেন না।”

হাদিস, সুনান নাসা্য়ী, নং ৩১৪২।

এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জেহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুকিপূর্ণ কাজেও আল্লাহ্র শরীক করা হলে অর্থাৎ রিয়া মিশ্রিত হলে তা প্রত্যখ্যাত হবে এবং আল্লাহ্র কাছে এর কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে না। এখন দেখার বিষয় যে, জেহাদের মধ্যেও কিভাবে রিয়ার সংমিশ্রণ হতে পারে। নিয়ত এবং উদ্দেশ্যের কারণে জেহাদ রিয়ার আমলে পর্যবশিত হতে পারে বিভিন্নভাবে:

- মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্য থাকলে
- বীর বা বাহাদুর খেতাবে ভূষিত হওয়ার সাধ থাকলে
- গনিমতের মাল হাসিলের উদ্দেশ্যে থাকলে এবং
- যে কোন প্রকার পার্থিব সুবিধা আদায়ের জন্য জেহাদ করা হলে।

এ বিষয়গুলি পরিহার করে কেবলমাত্র আল্লাহ্র আদেশ পালনের স্বার্থে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে রিয়া মুক্ত জেহাদ পরিচালনা করা হলেই আল্লাহ্র কাছে তার বিণিময় আশা করা যায়।

কোরবানীঃ কোরবানীর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র কাছে নিজেকে সমার্পন করা। যদিও বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে কোরবানী অনুষ্ঠিত হয় তবুও মূল বিষয়টি সম্পূর্ণ আত্মিক। আল্লাহ্ বলেছেন,

"আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছেনা ওগুলির গোশ্‌ত এবং রক্ত বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাক্‌ওয়া।"

সুরা হাজ্জ, আয়াত-৩৭।

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ কোরবানীর মূল উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে লোকপ্রদর্শনীর মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভ করার প্রচেষ্টা করে থাকে। কোরবানীর হাটে তাই প্রতিযোগিতা চলে, কে কত বড় এবং বেশী মূল্যের পশুটি ক্রয় করতে সক্ষম। এবং এই পশুটি কোরবানী করে লোকের প্রশংসা কুড়ায় এবং নিজেকে ধন্য মনে করে থাকে। আল্লাহ্‌র সমীপে নিজেকে নিবেদন করার অনুভূতিটুকুও সেখানে অনুপস্থিত। সুতরাং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের পরিবর্তে মানুষের প্রশংসা লাভের আকাঙ্খা মূখ্য হওয়াতে এটি রিয়ায় পরিণত হয়।

সকল ইবাদতে রিয়ামুক্ত থাকা সকলের জন্য সমীচীন। লোকদেখানো এবং মানুষের সন্তুষ্টি নয় বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সকল ইবাদত করা আবশ্যক। রিয়া থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুমিনের জন্যই জরুরী। কেননা রিয়া মিশ্রিত ইবাদত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এর কোন প্রতিদানও আল্লাহ্‌ দিবেন না। হতে পারে একজন মানুষ ভাল আমল করে গত হয়েছেন; কিন্তু তার আমলগুলি রিয়া মিশ্রিত থাকার কারনে রোজ কিয়ামতের মাঠে তাকে সব হারিয়ে পরওয়ারদেগারের সম্মুখে দাড়াতে হবে রিক্ত হস্তে। এর স্বপক্ষে একটি হাদিস উপস্থাপন করা যায়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হুযুরে পাক (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- কে বলতে শুনেছেন,

"রোজ কিয়ামতে সর্বপ্রথম একজন শহীদ ব্যক্তির বিচার করা হবে। তাকে হাজির করা হলে আল্লাহ্‌ পাক তাকে প্রদত্ত নিয়ামতের কথা উল্লেখ করবেন। লোকটিও তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ্‌ পাক তাকে জিজ্ঞেস করবেন,

"তুমি কি আমল করে এসেছ?"

সে বলবে,

"আমি তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি।"

আল্লাহ্‌ বলবেন,

"তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি যুদ্ধ করেছিলে এই উদ্দেশ্যে যে, লোকগণ তোমাকে বাহাদুর বলবে, তা বলা হয়েছে।"

এরপর আল্লাহ্‌র আদেশে তাকে উপুর করে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর আর এক ব্যক্তির বিচার করা হবে। সে ব্যক্তি নিজে এলেম শিক্ষা করেছে এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়েছে। কোরআনমজীদ তেলাওয়াত করেছে। তাকে হাজির করে আল্লাহ্‌ পাক তাকে প্রদত্ত নিয়ামতের কথা জিজ্ঞেস করবেন। সে সেই নিয়ামতসমূহ চিনতে পারবে এবং তা স্বীকারও করবে। তখন আল্লাহ্‌পাক বলবেন,

"এই নিয়ামত লাভের বিনিময়ে তুমি কি করে এসেছ?"

লোকটি বলবে,

"আমি এলেম শিক্ষা লাভ করেছি এবং অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছি। আর তোমারই সন্তুষ্টির জন্য কোরআন পাঠ করেছি।"

তখন আল্লাহ্‌ পাক বলবেন,

"তুমি মিথ্যা বলছ। তুমিতো এলেম শিক্ষা করেছিলে এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষ তোমাকে আলেম বলবে

এবং ক্বারী উপাধিতে ভুষিত করবে। তোমার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।"

তখন আল্লাহ্‌র আদেশে তাকে উপুর করে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর আর এক ব্যক্তির বিচার করা হবে যাকে আল্লাহ্ পাক বহু ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে হাজির করত আল্লাহ্ পাক তাকে প্রদত্ত নিয়ামতের কথা বলবেন। সে তা স্বীকার করে নেবে। তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন,

"এই সকল নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি কাজ করে এসেছ?"

জবাবে লোকটি বলবে,

"তুমি যে সকল স্থান ও যে সকল পাত্রে দান করায় সন্তুষ্ট হও, আমি তার কিছুই বাকি রাখি নাই; বরং সর্বস্থানেই তোমার খুশীর জন্য মুক্ত হস্তে দান করেছি এবং অকৃপণভাবে ধন-সম্পদ খরচ করেছি।"

তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন,

"তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি দান-খয়রাত এবং সম্পদ ব্যয় এজন্য করেছ যাতে লোকগণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ দাতা বলে অভিহিত করে, তা করা হয়েছে। তুমি দানবীর খেতাবে আখ্যায়িত হয়েছ।"

এরপর তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ দেয়া হবে এবং সে অনুযায়ী তাকে উপুর করে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ৪৭৭১

এভাবে রিয়া মিশ্রিত আমল নিয়ে যারা পরকালে আলাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হবে,

তাদের সে নেক আমল গৃহীত হবে না এবং তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

রিয়ার আরো কিছু পদ্ধতিঃ

উপরে বর্ণিত ইবাদতগুলি ছাড়াও বিভিন্ন আমলের মধ্যে রিয়ার আরো কিছু সুক্ষ্ম দিক রয়েছে যেগুলি উদাহরণ সহ নিম্নে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হল:

ক) খোত্‌বা বা বক্তব্য প্রদানে রিয়াঃ যারা খোতবা অথবা ইসলামের তারবিয়া নিয়ে থাকেন তাদের মধ্যে এই প্রকারের রিয়া সচরাচর দেখা যায়। শ্রোতাদের জন্য সত্যিকারের উদ্বিগ্ন হওয়া এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর পরিবর্তে কিছু বক্তা শুধু অন্যদেরকে তার বাকচাতুর্য দিয়ে মুগ্ধ করতে চায় এবং সমাজে তাদের খ্যাতি ও বিশিষ্টতা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা করে– এটা রিয়া।

খ) ধর্ম প্রচারে রিয়াঃ ধর্ম প্রচার নিয়ে যারা থাকেন এবং বিভিন্ন যায়গায় ওয়াজ-মাহফিল করে বেড়ান তাদের মধ্যেও একধরনের রিয়ার মনোভাব লুক্কায়িত থাকতে পারে। সত্যিকারের ইসলাম প্রচারের দাওয়া না হয়ে যখন এমন সুকৌশলে বক্তব্য স্থাপন করা হয় যাতে লোকে তাকে একজন বড় ধার্মিক এবং বিখ্যাত বক্তৃত্বা বা বাগ্মী বলে মনে করে– তখন সেটা রিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ) যিকরের রিয়াঃ যিকরের একটা সাবলীল পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু তা না করে একদল বা কোন লোক যখন যিকরের মজলিসে অতি উচ্চস্বরে, আবেগ তাড়িত কান্না জড়িত কণ্ঠে চেঁচামেচি করে এবং নানা অঙ্গ ভঙ্গি করে নিজেকে বা নিজেদেরকে অতিমাত্রায় আল্লাহ্ ভক্ত প্রমাণ করতে চায় এবং লোকের প্রশংসা কুঁড়াতে চায়– তাহলে সেটা এক প্রকারের রিয়া।

ঘ) শ্রোতার রিয়াঃ একজন শ্রোতা কোন ধর্মীয় মজলিসে বসে যখন কোন হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য শ্রবণ করে আবেগ তাড়িত হয়ে সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন অথবা কান্না শুরু করে দেয় তখন এ কান্না যদি হয়ে থাকে আল্লাহ্‌র জন্য তবে সে নিজেকে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করলো, আর তা যদি হয়ে থাকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যকারো জন্য তাহলে সে নিজেকে ধ্বংস করলো– (আবু আমেনা ফিলিপ বেলালী)।

ঙ) নিজের সমালোচনার রিয়াঃ নিজের সমালোচনাও রিয়া হতে পারে যখন কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে এমনভাবে নিজের সমালোচনা করে যাতে মানুষ মনে করে যে, সে অতি বিনয়ী এবং নিরহংকার, অতঃপর লোকে তার প্রশংসা করে। "সমালোচনার মাধ্যমে নিজের সত্তাকে সম্মান নিবেদনের উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে নিজের সমালোচনা করে একজন প্রশংসা পেতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটি একটি স্পষ্ট নিবৃদ্ধিতা"– (মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ)।

চ) নিজেকে ধার্মিক প্রমাণ করানোর রিয়াঃ নিজেকে লোকদের কাছে ধার্মিক প্রমাণ করানোর জন্য তসবীর মালা নিয়ে হাঁটা-চলা করা এবং যপ ও যিকর করা ইত্যাদি হতে পারে রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

ছ) পোষাকের রিয়াঃ রিয়া সম্পৃক্ত থাকতে পারে আগোছালো উপস্থাপন এবং হীন পোষাকের সাথে– এটি হচ্ছে সেই অবস্থা যখন কোনো ব্যক্তি এ ধারণা দিতে চায় যে, সে এতই সুফী যে পরকাল নিয়েই চিন্তিত এবং সে দুনিয়ার পরোয়া করে না। অথবা এর উল্টোটাও হতে পারে যে, একজন ব্যক্তি নিজের দিকে মনোযোগ টানতে খুব আকর্ষণীয় কেতাদুরস্ত পোষাক পরে অথবা শাইখদের মতো পোষাক পরিধান করে যাতে লোকেরা তাকে শাইখ মনে করে–এটা রিয়া।

জ) বন্ধু নির্বাচনে রিয়াঃ সর্বদা ধার্মিক আল্লাহ্‌ ওয়ালা লোকদেরই বন্ধু নির্বাচন করা সকলের জন্য সমীচীন। কিন্তু সেক্ষেত্রে কেউ যদি লোকের মাঝে নিজেকে ধার্মিক প্রমাণ করতে এ জাতীয় লোকদের সাথে মেলামেশা করে এবং যাতে মানুষ বুঝে নেয় যে, সেও খুব আল্লাহ্‌ ওয়ালা– এটাও রিয়ার মধ্যে পড়ে। বস্তুতঃ ধার্মিক বন্ধু নির্বাচন করা উচিত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য।

ঝ) অনুদানের রিয়াঃ মসজিদ বা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য বা অনুদানের জন্য ভরা মজলিসে দানের ঘোষণা করা যাতে মানুষ তাকে ধার্মিক এবং দানশীল হিসেবে চিহ্নিত করে– এটাও রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

ঞ. তাহাজ্জুদ সালাত সহ নিজের অন্যান্য লুক্কায়িত নেক আমলের রিয়াঃ নফল সালাতের মধ্যে তাহাজ্জুদ নামায সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক সওয়াবের আমল। এ সওয়াব তখনই হাসিল হতে পারে যখন তা স্রেফ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা হয় এবং রিয়ামুক্ত হয়। যদি নিজের সালাতের জন্য গর্ববোধ করা হয় এবং নিজেকে খুব ধার্মিক প্রমাণ করার জন্য মানুষের কাছে তা বলে বেড়ান হয় অথবা লোকদেখানের উদ্দেশ্যে তাহাজ্জুদ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়– তাহলে সেটা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। এভাবে নিজের লুক্কায়িত যে কোন নেক আমল মানুষের কাছে বলে বেড়ানোও রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

ট) পরিবার পরিচালনার রিয়াঃ প্রত্যেক পিতামাতাই চান যে তাদের সন্তানেরা নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোক এবং ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করে যথাযথ মুসলিম হিসেবে বড় হোক। এমন অপরিহার্য অভিপ্রায়ের

জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টাই পিতামাতার থাকতে হয়। সেই সাথে এ বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই এ প্রচেষ্টা হওয়া উচিত এবং এদের সন্তানরা যে ইসলামী আদব কায়দা মেনে চলছে এবং নিয়মিত ফরয, ওয়াজেব ইবাদতগুলি পালন করছে, এর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু তা না করে যদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে গর্ব করা হয় এবং অন্যদের কাছে বলা হয়ঃ আমার সন্তান কোরআনের এতগুলো সুরা মুখস্ত করেছে অথবা অমুক প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হয়েছে এবং এধরনের আরো অনেক মন্তব্য। যদি পিতা মাতা তাদের ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন এই জন্য যে, তারা এসকল মন্তব্যের সময় তাদের নিয়ে গর্ব করতে পারেন এবং মানুষের বাহবা পেতে পারেন, তাহলে সেটা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঠ) সম্পদ, প্রতিপত্তি ও মর্যদা কামানোর রিয়াঃ এগুলি প্রদান করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌। কিন্তু কেউ যদি অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে না বরং নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করার প্রচেষ্টা করে এবং নিজ বাহুবল বা প্রজ্ঞা ও পরিশ্রম দ্বারা সম্পদ অর্জন করেছে বলে বড়াই করে– তাহলে সেটা সুক্ষ্ম ধরনের রিয়া। এভাবে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি বা মর্যাদার অধিকারী হওযার বেলায়ও এই একই কথা প্রযোজ্য।

ড) হিযাব পরিধানে রিয়াঃ নারীদের জন্য হিযাব পরিধান করা ফরয। কিন্তু এ আমলটিও রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। একজন মহিলা যখন নিজ মহল্লায় বা নিজ শহরে হিযাব পরিধান করে এবং এজন্য নিজেকে গর্বিত মনে করে; অথচ এই মহিলাই যখন অপরিচিত শহরে বা বিদেশে গমন করে তখন আর হিযাব ব্যবহার করে না। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠতে পারে, সে কি সত্যি সত্যি আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য হিযাব পড়ছে না কি কাছের মানুষদের নিকট বড় ধার্মিক ও পর্দানশীল বলে পরিচয় দেওয়ার জন্য হিযাব করছে? স্বভাবতই উত্তর হবে দ্বিতীয়টি– আর সেটাই রিয়া।

ঢ) সম্প্রসারিতভাবে, খ্যাতি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ এবং ইসলামী বই লেখা অথবা মানুষকে মুগ্ধ করার জন্য সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করা ও বক্তব্য প্রদান করা রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার রিয়া সুমা বলে পরিচিত।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোন ইবাদত বা নেক আমল লোক দেখানো এবং দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে করা হলে এর জন্য আখিরাতে কোনো কল্যাণ থাকবে না। আবার দুনিয়া কামানোর জন্য নেক আমল করা হলেও দুনিয়া যে নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যাবে– তাও কিন্তু সঠিক নয়। আল্লাহ্‌ যাকে যতটুকু দেওয়ার সে ততটুকুই দুনিয়াতে পেতে পারে কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন,

“কোন ব্যক্তি দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ পেতে চাইলে আমি তাকে এখানে তার জন্য যতটুকু দিতে চাই তা সত্তর দিয়ে দেই, পরিশেষে তার জন্য জাহান্নামই নির্ধারণ করে রাখি, যেখানে সে প্রবেশ করবে একান্ত নিন্দিত, অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায়।”

আল কোরআন, সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত -১৮।

অতএব এটা বোঝা যাচ্ছে যে, দুনিয়াকামী ব্যক্তিরা কত নিন্দিত! বস্তুত দুনিয়াকামী ব্যক্তিরা হচ্ছে দুনিয়ার গোলাম। তারা কখনও আল্লাহ্‌ তা'আলার গোলাম হতে পারে না। তাই আখিরাতে তারা সকল প্রকার কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে হেফাযত করুণ!

খ. প্রকাশ্য ছোট শির্‌কঃ

প্রকাশ্য ছোট শির্‌ক বলতে ছোট শিরক সংঘটিত হয় এমন কথা ও কাজকে বোঝানো হয় যা সবাই চোখে দেখতে পায় অথবা কানে শুনতে পায় অথবা অনুভব করতে পারে। এ শির্‌কের অনেকগুলি প্রশাখা রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শির্‌কের আলোচনা এখানে উপাস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হল:

১। কসমের শির্‌ক

কসমের শির্‌ক বলতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিসত্তা বা বস্তুর নামে কসম খাওয়াকে বুঝান হয়। যেমনঃ বাপ-দাদা, পীর-অলী কিংবা চন্দ্র, সূর্য, মাটি ইত্যাদির নামে কসম করা।

কসম শব্দের আভিধানিক অর্থ শপথ। এর আরো অনেক প্রতিশব্দ রয়েছে, যেমনঃ হলফ, দিব্যি, কিরা, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে কারো সংকল্প বা প্রদত্ত সাক্ষ্য অথবা স্বীকারোক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অথবা কোন সত্তা বা বস্তুর নামে শ্রদ্ধার সাথে নিবেদিত এর সমর্থন জ্ঞাপক সীকৃতি বা অনুমোদনের ঘোষণা দেওয়ার নাম শপথ বা কসম। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র সত্তা বা তাঁর গুণাবলীর নামে কসম করার বৈধতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কসমের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তায়ালাকে কোন বিষয়ের বা নিজের কোন কর্মের সাক্ষী বানিয়ে নেয়।

কসমের মাধ্যমে যার নামে কসম করা হয় তার তা'যীম অথবা প্রেম উদ্দেশ্য থাকে– যে তা'যীম ও প্রেম কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। বস্তুতঃ কসমের সাথে কয়েকটি বিষয় সংশ্লিষ্ট রয়েছে, যেমনঃ

- মানুষ সাধারণতঃ নিজের কথা, দাবী ও মতামতকে অন্যের সামনে খাঁটি ও অকাট্য প্রমাণ করার জন্য বলিষ্ট কণ্ঠে কারো নামে শপথ করে থাকে।
- এ কথা সত্য যে, যার নামে কসম করা হয় তার সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়।
- আর প্রকৃতপক্ষে সর্বাধিক সম্মান ও সর্বোচ্চ মর্যদা পাওয়ার হকদার হিসেবে একমাত্র মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই।

তাই যদি কসম করতেই হয় তাহলে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নামেই কসম করার বৈধতা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো সত্তা, ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর নামে কসম খাওয়া প্রকাশ্য ছোট শির্‌ক। এ বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সাঈদ ইবনে আবী ওবায়দা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন,

> **"একবার ইবনে উমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে কাবার নামে শপথ করতে শুনে তাকে বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা অবৈধ। কেননা আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে কসম খেল সে শির্‌ক করল।"**
>
> হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ১৪৭৭

অন্য একটি হাদিসে গায়রুল্লাহর নামে শপথ করার নিষিদ্ধতা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নামে শপথ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে উমর (রাঃ) থেকে। কিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান,

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামে শপথ করতে বারণ করেছেন। শপথকারী হয় আল্লাহ্‌র নামে শপথ করবে অথবা চুপ থাকবে।"

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ১৪৭৬

গায়রুল্লাহর নামে শপথ করার অবৈধতার উপর আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে, তোমাদের মায়ের নামে এবং মূর্তির নামে কসম করবে না। আর তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ খাবে না।"

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং ৩২৩৪

উপর্যুপরি হাদিসদৃষ্টে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে গায়রুল্লাহর নামে কসম করা অবৈধ এবং শির্‌ক। তাই কোন নবী, রাসূল, ফিরিশতা, জ্বিন, পীর, বুজুর্গ, অলি, পিতা-মাতা বা ছেলে-সন্তান ইত্যাদি এবং অন্যকোন ব্যক্তি বা সৃষ্ট বস্তুর কসম খাওয়া না জায়েয এবং ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অথচ মানুষ বিভিন্নভাবে কথায় কথায় বা সামান্য ব্যাপারে অভ্যাসগতভাবে গায়রুল্লাহর নামে কসম করে থাকে। আমাদের সমাজে একটি সাধারণ চর্চা এই যে, মানুষ অনেক সময় বাপ-দাদা বা পূর্ব পুরুষদের নামে, নবী-রাসুলদের নামে, ফিরিশতাদের নামে, কাবার নামে, পীর-আওলিয়ার নামে, চন্দ্র-সূর্য, পাথর, মাটি বা অন্যকোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম (কিরা) করে থাকে। তারা দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে কসমের শির্‌ক করে যাচ্ছে তার কিছু বাস্তব পরিচিতি প্রদানের প্রচেষ্টা করা হল:

- নবী রাসূলের কিরা আমি সত্য বলছি।
- পীরের দোহাই আমি কাজটি করিনি।
- বাবা-মায়ের দিব্যি আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম / ছিলাম না।
- আলীর দোহাই আমি তাকে মারিনি ।
- বিদ্যার দোহাই আমি বইটি চুরি করিনি।
- চাঁদ-সূরুযের কসম লাগে আমি তোমাকে সত্যি ভালবাসি ইত্যাদি।

কোন কিছু স্পর্শ করে বা ছুঁয়ে বলাও কসমের পর্যায়ভুক্ত। যেমন, মসজিদ, মিম্বর, মাজার, পীরের আস্তানা, ছেলের মাথা, কারো গা, চোখ ইত্যাদি এবং কিতাব, বিদ্যা, মাটি ইত্যাদি স্পর্শ করে কথা বলাও কসমের অন্তভুক্ত। অনুরূপভাবে পশ্চিম দিকে মুখ করে বলা বা মাটিতে দাঁড়িয়ে বলা অথবা কোন কিছুর দোহাই দিয়ে বলাও কসমের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলি সব শির্‌কী আচরণ হিসেবে বিবেচিত। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শরিয়তে এ ধরনের কসমের কোন বৈধতা নেই। কেননা মানুষের এ ধরনের আচরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র ক্ষমতাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং যার নামে কসম করা হয় তাকে মর্যাদাবান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে মহিমান্বিত করা হয় । তাই অযথা কসম না করা বা প্রয়োজনে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কার নামে কসম করার অভ্যাস পরিত্যাগ করা এবং এ জাতীয় শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকাই সকলের জন্য বাঞ্ছণীয়।

২। যাদু-টোনার শিরক

যাদুর শির্ক বলতে এমন কতগুলো মন্ত্র-তন্ত্র বা অবোধগম্য শব্দসমষ্টিকে বুঝান হয় যা যাদুকর নিজে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে থাকে আবার কখনো কখনো বিভিন্ন ওষুধ, সুতায় গিরা বা ধুনা দিয়েও যাদু করা হয়।

যাদু-টোনা এমন সব অদ্ভুত কর্মকাণ্ড যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বনে জ্বিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি সাধন করা হয়। যাদুর বিষয়টি অত্যন্ত দুর্বোধ্য কৌশলগত ব্যাপার এবং এর সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করাও কষ্টসাধ্য। তবে সাধারণ পরিভাষায় যাদু বলতে এমন বিষয়কে বোঝায়, যাতে জ্বিন ও শয়তানের কারসাজি, কুফরী বাক্যের প্রভাব, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর অদৃশ্য প্রভাব, মেসম্যারিজমে কল্পনাশক্তির প্রভাব প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমান থাকতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিক্রিয়া এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; মন্ত্র-তন্ত্রের প্রতিক্রিয়া, ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া– যেমন জ্বীন-পরী, দানব বা শয়তানের প্রতিক্রিয়া অথবা সম্মোহনী শক্তির প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। যাদু সত্য এবং যাদুর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি সাধিত করার বাস্তবতাও অনস্বীকার্য। তবে যাদু কোন জিনিসের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না' বরং নকল ও কৃত্রিম ধারণার জন্ম দেয় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে যা নয়, মানুষ তাই মনে করে। যেমন; যাদুর প্রভাবে ব্যক্তি রশিকে সাপ মনে করে। যাদুর প্রতিক্রিয়া মূলত মস্তিস্কে হয় এবং মানুষের চিন্তা শক্তিকে প্রভাবিত করে। ফলে একজন ব্যাক্তি প্রকৃত বস্তুকে অন্যরূপে দেখে অথবা সে যে কাজ করেনি তা করেছে বলে মনে হয় বা প্রকৃত ঘটনা ভুলে যায় এবং অকারণে ভয় পায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানসিক সমস্যার কারণে ব্যক্তির শারীরিক ক্ষতিরও আশংকা দেখা দেয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যাদু করা হয় জ্বিন ও শয়তানের সহায়তায়। তাই যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা ও যাদু অবলম্বন করা মুসলিমদের জন্য অবৈধ ও হারাম। সর্বসাকুল্যে দু'টি কারনে যাদু শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দু'টি নিম্নরূপঃ

- **এগুলো করতে গেলে জ্বিন ও শয়তানের নামে মানত ও বলি দিতে হয় কিংবা যে কোন উপায়ে তাদের নৈকট্য লাভ করতে হয়–যা কুফর এবং শিরকের অন্তর্গত।**
- **যাদুকরেরা ইলমুল গায়েবের দাবী করে থাকে। এটাও একটি মারাত্মক শির্ক।**

যাদু-টোনা একটি কুফরী কাজ। যাদু চর্চাকারী অর্থাৎ যে যাদুকর তার মন্ত্রবলে কোন জ্বিন বা শয়তানকে বশীভূত করে যাদুর কাজে ব্যবহার করে সে কাফির এবং এ যাদুর সহযোগীতা গ্রহণকারীরাও তাদের দলভুক্ত। বিষয়টি পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

"সোলায়মান কখনো কুফরী করেনি, কুফরী করেছে সে সব অভিশপ্ত শয়তান, যারা মানুষকে যাদুমন্ত্র শিক্ষা দিয়েছে।"

আল কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত -১০২।

সোলায়মান নবীর রাজত্বকালে একদল শয়তান মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। তারা যাদু অবলম্বন করার ফলে আলহ্কে অস্বীকার করে কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাই যাদু চর্চা করা আলহ্কে অস্বীকার করারই নামান্ড়র। যারা যাদু অবলম্বন করে এবং এ বিশ্বাস করে যে, যাদু নিজস্ব ক্ষমতায় মানুষের উপর প্রভাব বিস্ড়ার করতে সক্ষম, প্রকারান্ড়ে তারাও ঐ অবিশ্বাসী দলের অন্ড়র্ভুক্ত। ওলামাদের সর্বসম্মতিক্রমে যাদুমন্ত্র একটি শির্কী কর্ম। তবে যাদু করা এবং যাদু অবলম্বন করা ব্যক্তির মানসিকতা ও বিশ্বাসের স্তরের উপর ভিত্তি করে শিরকে আসগরও হতে পারে আবার শিরকে আকবরও হতে পারে।

যাদু একটি ধ্বংসাত্মক কাজ। যাদুর মধ্যে কোন কল্যান বা উপকারীতা মোটেই নেই বরং যাদুর মাধ্যমে ক্ষতি সাধন করার প্রবনতটাই মূখ্য। কোরআন শরীফে যাদু-টোনাকে অনিষ্টকর বিদ্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টি ও তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা করা হয়। তবে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ইচ্ছা ছাড়া তা এককভাবে কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। যেমন পবিত্র কোরআনে বর্নিত আছে,

"তারা তাদের (হারুত-মারুত ফেরেশতা) কাছ থেকে এমন কিছু বিদ্যা (যাদু বিদ্যা) শিখে নিয়েছিলো, যা দিয়ে এরা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করতো। যদিও আলাহ্র ইচ্ছা ছাড়া কোন দিনই কেউ কারো সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে পারবে না।"

আল কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত -১০২।

যে মনে করে যে, তার যাদু আল্লাহ্র অনুমতি ও ইচ্ছা বিনা উপকার ও অনিষ্ট সাধন করতে পারে সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে আরো বলেছেন,

"আর যাদুকর কখনো কামিয়াব হয়না, যে রাস্তা দিয়েই সে আসুক না কেন।"

আল কোরআন, সুরা ত্ব-হা, আয়াত -৬৯।

আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই যাদু নিস্কৃয় হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ চাইলে যাদুকর কখনই সফল হতে পারে না– এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং মুমিনের জন্য সুসংবাদ। কোরআনের এ বক্তব্যের পরেও যারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে পারেনা বরং যাদুকরের স্মরণাপন্ন হয় তারাতো বস্তুতঃ ঐ যাদুকরকে আল্লাহ্র ক্ষমতায় অংশীদার সাব্যস্ত করে বসে আছেন।

সুতরাং যাদুতে নয়, বরং আমাদের বিশ্বাস রাখা উচিত এক আলাহ্র উপরে। কেবলমাত্র আলাহ্র স্মরণাপন্ন হলেই মানুষের উপর যাদু কোন ক্রিয়া করতে পারেনা এবং যাদুর সকল প্রভাবও বিন্ষ্ট হয়ে যায়। তাই যাদু নয় বরং আসুন আমরা যাদুর সকল বিভ্রান্ড়ি ও শির্ক থেকে আলাহ্র কাছে পানাহ চাই এবং যাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকি।

৩। রাশিফল ও জ্যেতিষের শিরক

রাশিফল বলতে বুঝায় কল্পিত রাশিচক্রে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের প্রভাবে ভূ-মণ্ডলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া বা ঘটনাসমূহের আগাম ভবিষ্যত বানী দেয়াকে। এটা জ্যেতিষবিদ্যা নামে অভিহিত এবং যারা এ বিদ্যায় পারদর্শী তারা জ্যেতিষী নামে পরিচিত।

জ্যেতিষীর শির্ক বলতে রাশি-নক্ষত্রের সাহায্যে ভূমণ্ডলে ঘটিতব্য ঘটনাঘটন সমূহের আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করাকে বুঝান হয়। যেমনঃ গ্রহ-ণক্ষত্রের গতি-বিধি ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে বৃষ্টিপাত ও ঝড়-বন্যা সহ নানা প্রাকৃতিক ঘটনা ও দুর্যোগের আগাম সংবাদ দেওয়া।

জ্যেতিষীরা বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে সকল প্রাকৃতিক ঘটনাই তারকারাজীর প্রভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমনঃ বৃষ্টিপাত, বন্যা, শীত, গরম, মহামারী বা যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি সব কিছুই তারকার প্রভাবে ঘটে থাকে। তাই জ্যেতির্বিদগণ এ সম্পর্কে অগ্রিম বার্তা প্রদান করতে সক্ষম। কিন্তু একজন তাওহীদবাদী মুসলিম জ্যেতিষে বিশ্বাস করে না। বস্তুতঃ রাশিফলের কোন ভিত্তিও নেই। তারকার

প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়না বা কোন অঘটনও ঘটেনা; বরং যারা একথা বিশ্বাস করে তারা কাফির মুশরিকদের দলভুক্ত। এর সমর্থনে একটি হাদিস বর্ণিত রয়েছে যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) হতে। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুদায়বিয়াতে আমাদের সাথে ফযরের নামায আদায় করেন। তখন রাতে কিছু বৃষ্টিপাত হওয়ার নিদর্শণ ছিল। নামায শেষে তিনি লোকদের বলেনঃ

"তোমরা কি জান, তোমাদের প্রভু কি বলেছেন?"

উত্তরে তারা বলল,

"আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।"

তখন তিনি বললেন,

"এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেনঃ ফযরের সময় আমার কিছু বান্দা মুমিন এবং কিছু সংখ্যক কাফের হয়ে গেছে। যারা বলেছে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতে বৃষ্টি হয়েছে, তারা তো আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং তারকার প্রতি অবিশ্বাসী। অপরদিকে যারা বলেছে– অমুক অমুক তারকার প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার অবিশ্বাসী এবং তারকার প্রতি বিশ্বাসী।"

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং ৩৮৬৭

পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়াদি পরিচালিত হয় আল্লাহরই ইচ্ছায়, সেখানে তারকার কোন প্রভাব নেই। তারকারাজী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা এবং এদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আল্লাহ্ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে পরিষ্কার বিবৃত আছে যে, তিনটি উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তারকারাজীকে সৃষ্টি করেছেন, তা নিম্নরূপ:

- **আকাশের সৌন্দর্যবর্ধন এবং তাকে সুশোভন করার জন্য।**
- **অন্ধকারে জল ও স্থলপথের নাবিক ও পথিকদের পথ নির্দেশনা, দিক ও সময় নির্নয়ের সুবিধার জন্য।**
- **গোপণ আসমানী তথ্য সংগ্রহকারী জ্বিন ও শয়তান দলকে বিতাড়িত করার জন্য তাদের প্রতি ক্ষেপনাস্ত্র (উল্কা) স্বরূপ ব্যাবহারের জন্য।**

এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

"নিকটবর্তী আকাশটিকে সুশেভিত করেছি প্রদীপমালা (গ্রহ-নক্ষত্র) দিয়ে এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ।"

আল কোরআন, সুরা মূলক, আয়াত-৫

কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

"তিনি তোমাদের জন্য তারকা বানিয়ে রেখেছেন যেন তোমরা জলে-স্থলের আঁধারে পথের দিশা পেতে পার।"

আল কোরআন, সুরা আনয়াম, আয়াত-৯৭

পবিত্র কোরআনে বা হাদিসগ্রন্থেও কোথাও উল্লেখ নেই যে, গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে মানুষের ভাগ্যফল বা ভূ-মণ্ডলের ঘটনাবলী পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রনের কোন সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়গুলি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রনে রয়েছে। তাই জ্যেতিষীদের পক্ষ থেকে ভূমণ্ডলে ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে আগাম ধারণা প্রদান

করার বিষয়টি ভিত্তিহীন এবং অমূলক। জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করা এবং এতে বিশ্বাস স্থাপন করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

জ্যোতির্বিদ্যা শিরক হওয়ার পিছনে মূলত দু'টি কারণ উল্লেখ করা যায়। কারণ দু'টি নিম্নরূপ:

- **জ্যোতিষীরা দাবী করে যে, গ্রহ-নক্ষত্র স্বেচ্ছা স্বয়ংক্রিয় এবং পৃথিবীতে যে কোন অঘটন এদেরই প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত হয়ে থাকে।**
- **জ্যোতিষীরা আগাম ভবিষ্যদ্বানীী করে থাকে– এটা ইলমুল গায়েবের দাবী বৈ কি!**

জ্যোতিষীরা বিশ্বাস করে যে, মানুষের জীবনের উপরও গ্রহ-নক্ষত্রের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে এবং এর মাধ্যমেই তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তাই তারা মানুষের কুষ্টি বিচার করে রাশিচক্রে তার অবস্থান নির্ণয় করে রাশি নির্ধারণ করার মাধ্যমে মানুষের রাশিফলের আগাম বার্তা দিয়ে থাকে। কিন্তু একজন তাওহীদবাদী মুসলিমের পক্ষে রাশিফল বিশ্বাস করার কোন অবকাশ নেই। কেননা জ্যোতিষের কাছে আনাগোনা করা, রাশিফল নির্ণয় করা ও রাশিফলে বিশ্বাস করা কুফরী কাজ। যে ব্যক্তি ভাগ্যের উপর গ্রহ-নক্ষত্রে প্রভাব এবং রাশিফলে বিশ্বাস করবে, সে সরাসরি মুশরিক হয়ে যাবে।

৪। গণনার শির্ক

গণনার শির্ক বলতে যে কোন পন্থায় বা যে কোন বিষয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করাকে বুঝান হয়। গণনা বিদ্যা চর্চার সাথে যারা জড়িত রয়েছে তাদেরকে মানুষ গণক বলে জানে। এ ছাড়াও জ্যোতিষী, ঠাকুরবাবা বা জ্বিন সাধকরাও গণনা বিদ্যায় পারদর্শীতার দাবীদার। এরা সকলেই দাবী করে যে, মানুষের ভাগ্য গণনা সহ যে কোন বিষয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী তারা করতে পারে। কিন্তু একজন তাওহীদবাদী মুসলিম নিজের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ জানার জন্য এদের কাছে গমন করে না অথবা হারিয়ে যাওয়া জিনিসের খোঁজ নিতে বা কোন অদৃশ্য খবর জানার জন্য কোন জ্বিন বাবা বা জ্বিন বিবিবর কাছেও আসে না এবং এদের প্রদত্ত অদৃশ্যের খবর ও ভষ্যিদ্বাণীতেও বিশ্বাস করে না। কারণ সে জানে যে, সকল প্রকার ভূত-ভষ্যিত ও অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"তুমি বলো, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আসমান সমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে এদের কেউই অদৃশ্য জগতের কিছু জানে না।"

আল কোরআন, সুরা নামল, আয়াত -৬৫

গায়েবের চাবি-কাঠী আল্লাহ্র হতে। তিনিই গায়েব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। গায়েবের চাবি পাঁচটি, যা কোন প্রকারে আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। এগুলি হচ্ছেঃ

- **বিশ্ব কখন ধ্বংস হয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে**
- **বৃষ্টি কখন কোথায় এবং কি পরিমানে হবে (আবহাওয়বিদগণ শুধু লক্ষণ ধরে বর্ষনের সম্ভাবনার কথা বলে থাকেন। সেটা নিশ্চিত খবর নয়; কখনও সঠিক হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে– এটা ইলমে গায়েব নয়)।**
- **গর্ভবতীর গর্ভের ভ্রুণ, এর অবস্থানকাল, আয়ু, আমল, রুজী, ভাগ্য (অত্যাধুনিক মেশিনে ভ্রুণের দৈহিক কাঠামো গঠনের পরে লিংগ এবং আকার আকৃতি সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যায় মাত্র)**

- **কে আগামী কাল অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি করবে, কি ঘটবে**
- **কে কোথায় কখন এবং কিভাবে মারা যাবে।**

তবুও কিছু মানুষ হন্যে হয়ে ছুটছে গণক, জ্যেতিষী বা ফকির বাবার কাছে– চাকুরী, ব্যবসায়ে উন্নতি, পরীক্ষায় পাশ, বিদেশ ভ্রমণ, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি সহ নানা বিষয়ের আগাম খবরা-খবর এবং এর প্রতিকারের বিষয় জানতে। গণকরাও প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসে থাকে মক্কেল ধরার জন্য এবং তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের পকেট ভারী করার আশায়। তারা হস্তরেখা দেখে, দৈহিক কোন লক্ষণ দেখে, ফাল নামা খুলে, অংক কষে, আঁকা-আঁকি করে, ফাল কাঠি টেনে, পাখি উড়িয়ে এবং বিভিন্ন উপায়ে ভাগ্যফল এবং শুভাশুভ নির্ধারণ করে দেয়। এ ছাড়াও হাত চালিয়ে, বাটি চালিয়ে বা আয়না পড়া দিয়ে চোর ধরা বা হারানো মাল খুঁজে পাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে থাকে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এগুলোর কোন ভিত্তি নেই এবং তাদের কর্মকাণ্ড সব অনুমানভিত্তিক পরিচালিত হয় মাত্র।

ভাগ্য গণনা আর হারানো বস্তুর সন্ধান চাওয়া, ভবিষ্যতের খবর জানতে চাওয়া প্রত্যেকটিই নিঃসন্দেহে কুফরী ও শির্কের পর্যায়ভুক্ত তথা পরিষ্কার হারাম। গণনা ও ভবিষ্যতবানী করা মুলত দু'টি কারণে শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দু'টি হলঃ

- **এগুলো করতে গেলে জ্বিনদের সহযোগিতার জন্য তাদের নামে মানত করতে হয় অথবা বিভিন্নভাবে তাদের নৈকট্য লাভ করতে হয়– যা শির্ক।**
- **গণকরা ইলমুল গায়েবের দাবী করে থাকে– তাও একটি শিরক বৈ কি!**

গণকের কাছে গমন করা এবং তাদের কথায় বিশ্বাস করাও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এদের কথায় যারা বিশ্বাস করে তারা বস্তুতঃ দ্বীন থেকে বহু দূরে ছিট্‌কে পড়ে। এ বিষয়ের উপর একাটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

"যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে যায় আর তার কথায় বিশ্বাস করে সে যেন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর নাযিলকৃত দ্বীন হতে পথভ্রষ্ট হল।"

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং ৩৮৬৫

অদৃশ্য সম্পর্কে জানার জন্য গণকের কাছে আনাগোনা করাও বৈধ নয়। যারা এধরনের কাজ করে তাদের কোন নেক আমল আলাহ্‌র কাছে গৃহীত হয়না। এ বিষয়ের উপর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে মুহাম্মাদ ইবনে মুছান্না আনযী (রহঃ) হতে। হুযুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কয়েকজন স্ত্রীর রেওয়াতে তিনি বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গিয়ে তার নিকট অদৃশ্য বিষয় কিছু জিজ্ঞেস করে, চল্লিশ রাত পর্যন্ত তার কোন নামায কবুল হবে না।"

হাদিস, মুসলিম শরীফ, নং ৫৬২৯

পাঠকবৃন্দ, কি ভয়াবহ কথা! তাই মুসলিম হয়েও যারা এহেন কর্মের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন, তারা অনতিবিলম্বে এ পথ পরিহার করে ঈমানের পথে সুদৃঢ় থাকার শপথ নিন।

৫। তা'বীয-কবচ, বালা, তাগা, ইত্যাদির শির্ক

তাবী'য কবচের শির্ক বলতে সাধারনতঃ রোগ-বালাই, কু-দৃষ্টি, অশুভ প্রভাব ইত্যাদি দূরীকরণ অথবা প্রতিরোধের জন্য দানা, গোটা, কড়ি, শিঁকড় বা তদবীর লিখিত কাগজ বা চামড়া ইত্যাদি বা অন্যকোনো বস্তু ঐ অবস্থায় অথবা ধাতব নির্মিত মাদুলীতে সংযুক্ত করে শরীরের যে কোনো অঙ্গে ঝুলানোকে বুঝানো হয়। তা'বীয-কবচ অবলম্বন করা এ অবস্থায় শির্ক হিসেবে বিবেচিত হবে যখন তা এ বিশ্বাস নিয়ে দেওয়া হয় বা গ্রহণ করা হয় যে, এগুলি ব্যবহারের কারণেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বা বিপদ কেটে যাবে। এ বিশ্বাসে এ জাতীয় অন্যন্য জিনিস যেমন বালা, তাগা, আংটি, পাথর ইত্যাদির ব্যবহারও শির্কের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে এ সকল বস্তু উপকারী হতে পারে এ বিশ্বাস বা আস্থা না রেখে যদি শুধুমাত্র সৌন্দর্যবর্ধক উপকরণ হিসেবে এগুলির ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে শির্ক হবে না।

তা'বীয-কবচ, গিঁড়া, তাগা, বালা ইত্যাদিকে বালা-মুছিবত, রোগ-বালাই থেকে পরিত্রাণের ওসীলা মনে করে পরিধান করা ছোট শির্ক। শায়খ আব্দুল আজিজ বিন বাজ বলেছেন, "শয়তানের নাম, হাড়, পূঁতি, পেরেক, তিলিসমা অর্থাৎ অর্থবিহীন বিদঘুটে শব্দ বা অক্ষর প্রভৃতি বস্তু দিয়ে তা'বীয বানানো ছোট শিরক।"

প্রকৃতপক্ষে এগুলি সমস্যা সমাধানের বৈধ উপায় কিংবা বিজ্ঞান সম্মত ঔষধ নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে রোগ নিরাময় এবং শারীরিক সুস্থ্যতার জন্য দু'টি জায়েয মাধ্যম অবলম্বন করা যেতে পারে:

ক. শরীয়ত সম্মত ঝাড় ফুঁক– কোরআনের আয়াত বা দোয়ার মাধ্যমে ঝাড় ফুঁক করা বৈধ– যা ক্রিয়াশীল হওয়া কোরআন ও হাদিস কর্তৃক প্রমাণিত। এ মাধ্যমটি গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হওয়াই প্রমাণ করে।

খ. প্রকৃতিগত মাধ্যম– যেমন ঔষধ, পথ্য ইত্যাদি। মানুষের সুস্থতা-অসুস্থতা, মঙ্গল-অমঙ্গল সাধনের কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। প্রকৃতির মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য শেফা রেখেছেন। প্রাকৃতিক উপাদান থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তৈরীকৃত ঔষধ নির্ধারিত রোগ নিরাময়ের মাধ্যম। এটাও আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীলতার বহিঃপ্রকাশ।

তা'বীয-কবচ উক্ত মাধ্যম দু'টোর কোনটিরই অধীন নয়। তবে সমাজের একশ্রেণীর অজ্ঞ মানুষ বিভিন্ন সমস্যা যেমন, অসুস্থতা, রোগ-ব্যাধি, অমঙ্গল, বালা-মুছিবত, বদনজর, মানসিক অস্থিরতা ইত্যাদি থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য তা'বীয-কবচ সহ বিভিন্ন তদ্‌বীর যেমন, বালা, পাথরের আংটি বা ডোরা সুতার আশ্রয় নিয়ে থাকে। অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মহব্বত কিংবা বিচ্ছেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বা অন্য কারো ক্ষতি করার জন্য তা'বীয-কবচের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এগুলির কোন ভিত্তি নেই এবং এই ধরনের আচরণ মূলত ঈমানের অসম্পূর্ণতার লক্ষণ এবং আল্লাহর উপর অনির্ভরতার বহিঃপ্রকাশ।

এক শ্রেণীর ওঝা, ফকির, কবিরাজ বা জ্বীনসাধকেরা এই তা'বীয ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাছাড়াও তা'বীয ব্যাবসায় কোন কোন মসজিদের ইমাম বা আলেম সমাজও পিছিয়ে নেই। কোরআনের আয়াত দিয়ে তা'বীয দেয়া বা এর ব্যবহার সম্পর্কে মুসলিম ওলামা বা মনীষিদের মাঝে দু'টি মত রয়েছে। একদল এটাকে জায়েয বলেছেন, আবার অন্যান্যরা এটাকে না-জায়েয বা হারাম বলেছেন। এ বিষয়ে আমরা কোন মন্তব্য করব না। তবে এতটুকু বলা যায় যে, এক্ষেত্রেও যদি তা'বীয ব্যবহারকারীর নির্ভরশীলতা আল্লাহ্‌র উপর না থেকে তা'বীযের উপর নেমে আসে তাহলে সেটা আপত্তিকর। বস্তুতঃ

তা'বীযই তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে বা তাকে সুস্থতা দান করবে– এ ধরনের একটি মনোভাব ব্যবহারকারীর অন্তরে তার অজান্তেই সৃষ্টি হয়ে যায়, যা সুস্পষ্ট শির্ক। অধিকাংশ সাহাবী ও তাদের অনুসারীদের মতে কোরআনের তা'বীয ব্যবহার করাও নাজায়েয। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোরআন দ্বারা চিকিৎসা করার স্বরূপ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, আর তা হচ্ছে কোরআন তেলোয়াত করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। এ ছাড়া কোরআনের আয়াত তা'বীয আকারে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে কোন প্রমাণ নেই, এমনকি সাহাবাদের থেকেও নেই। যদি কোরআনের আয়াত দ্বারা তা'বীয তৈরী করা বৈধ হত, তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই তা বলে দিতেন। আবার কোরআনের আয়াতকে বিকৃত করে অর্থাৎ আয়াতের নক্শা তৈরী করে কিংবা আয়াতকে সাংকেতিক চিহ্ন বা সংখ্যায় প্রকাশ করে তা দিয়ে তা'বীয তৈরী করা একটি চরম ধৃষ্টতা। কেননা এ বিকৃতির ফলে পবিত্র কোরআননের অবমাননা করা হয় এবং কোরআন নাযিলের মহৎ উদ্দেশ্যকে ব্যহত করা হয়। তাই এ জাতীয় তা'বীয তৈরী করা এবং এর ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় হারাম। কোরআনের আয়াত ছাড়া অন্য সকল পন্থায় অর্থাৎ মন্ত্র-তন্ত্র, কুফরী কালাম বা কোন নক্শা, চিত্র, সংখ্যা অথবা কোন ফেরেশতা, জ্বিন কিংবা শয়তানের নাম অথবা কোন তেলেসমাতি যাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়ে বা কোন ধাতু, পশু-পাখীর হাড়, লোম বা পালক কিংবা গাছের শিঁকড় দিয়ে যে তা'বীয বানানো হয়, তা ব্যাহার করা ওলামাদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এ জাতীয় তা'বীয ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে, গায়রুল্লাহর উপর ভরসা করা বা তাদের আশ্রয় প্রার্থনা করা– যা প্রকাশ্য শির্ক হিসেবে বিবেচিত। তাই তা'বীয, বালা, তাগা ইত্যাদি থেকে মানুষের দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। এগুলি পরিহার করে বান্দা শুধু মাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কেহই নেই যে তাঁর বান্দার দুঃখ দূর করতে পারে বা কোনো উপকার করতে পারে। এ সম্পর্কে কোরআনের আয়াত আছে,

"আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচন করার আর কেউ নেই এবং আল্লাহ্ যদি তোমার মঙ্গল চাহেন তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ দানকরেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশীল, পরম দয়ালু।"

আল কোরআন, সুরা ইউনুস, আয়াত- ১০৭।

তা'বীয ব্যবহার করা না জায়েয হওয়ার স্বপক্ষে একটি হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত উকবা ইবনে আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি তা'বীয লটকালো সে শির্ক করলো"

তফসীর ইবনে কাসির, ১২ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪১

এ হাদিস দ্বারা তা'বীয ব্যবহার শির্ক হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। শর'ই বিশেষজ্ঞদের মতে তা'বীযের ব্যবহার স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ছোট শিরকের অন্তর্গত। তবে তা'বীয প্রদানকারী ও ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তা বড় শির্কেও রূপান্তরিত হতে পারে। তা'বীয অবলম্বনকারী যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহে তা'বীয উপকারী হয়ে থাকে মনে করে এবং এ ভাবনা অন্তরে রেখে মুখের দ্বারা শুধু তা'বীযকে উপকারী বলে বা তা'বীযের দ্বারা রোগীর উপকার হয়েছে এমনটি বলে, তাহলে তা শির্কে আসগর হিসেবে গণ্য হবে; আর যদি অনুরূপ ধারণা না করে এমনটি মনে করে যে, এ তা'বীয নিজে থেকেই উপকারী হয়ে থাকে এবং নিজেই রোগকে প্রভাবিত করতে পারে বা রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তাহলে তা শির্কে আকবর হিসেবে গণ্য হবে। আমাদের জানার

বিষয় এই যে, কোন বস্তু তা যাই হোকনা কেন, তা কারোর কোনো লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মবিধায়ক। তাঁর ইচ্ছার বাইরে বাইরে যাওয়ার সাধ্য কারো নেই। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"তিনি মানুষের জন্য কোনো অনুগ্রহের পথ খুলতে চাইলে কেউই তাঁর পথরোধকারী নেই, আবার তিনি যা কিছু বন্ধ করে রাখেন তারপর তা কেউই তার জন্য পাঠাতে পারে না, তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।"

আল কোরআন, সুরা ফাতির, আয়াত- ২

তা'বীয অবলম্বনের ফলে মানুষের উপর আল্লাহ্র কোন রক্ষণাবেক্ষণ থাকেনা। কেননা তা'বীয ব্যবহারের ফলে ব্যক্তির ভরসা ওর উপরই চলে আসে। আল্লাহ্ তা'আলাও তা'বীয ব্যাবহারকারীকে ওর ওপরই সোপর্দ করেন। এ বিষয়ে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ঊসা ইবনে আবদুর রহমান লাইলা (রঃ) হতে। তিনি বলেনঃ

আমি আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম আবু মাবাদ আল জুহনীকে দেখতে গেলাম। তিনি বিষাক্ত ফোঁড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম,

"তা'বীয লাগান না কেন?"

তিনি বললেন,

"মরণ তো এরও কাছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যাক্তি কিছু লটকায় তাকে তার প্রতি সোপর্দ করা হয়।"

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং-২০২২

তা'বীযের মতই অন্য কোন বস্তু: যেমন বালা, তাগা, ডোরা সুতা ইত্যাদির ব্যবহারের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই এবং এ জাতীয় আচরণও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ের উপর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত যয়নব (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, তার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন,

"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, তা'বীয এবং ডোরা সুতা বাঁধা শির্ক।"

তফসীর ইবনে কাসির, ১২ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪১

তা'বীয কবচ, বালা, তাগা, সুতা ইত্যাদি সকল বস্তুর ব্যবহার শির্ক- এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে আশা করি। তাই তা'বীয-কবচ থেকে সকলের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাই সমীচীন। যেহেতু এটা আকিদার বিষয়, তাই এখানে শিথিলতার কোন সুযোগ নেই।

আবহমান কাল থেকে তা'বীয-কবচ আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে বলে এখানকার এক শ্রেণীর আলেম-ওলামাও এগুলোকে বৈধতা দিয়ে থাকেন। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আবহমান কাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসলেই সেটা বৈধতা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। বৈধতার সর্বোচ্চ এবং কেবলমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে কোরআন ও হাদিস। তাই আবহমান কাল থেকে প্রচলিত কাজটি যদি কোরআন ও হাদিস ভিত্তিক না হয়, তবে তা অবৈধ এবং সর্ববস্থায় পরিত্যাজ্য। অতএব এখনও যে সব

আলেম-ওলামা তা'বীয কবচ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন, তাদের কাছে এবং এর ব্যবহারকারীদের কাছে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

৬। ঝাড়-ফুঁকের শির্ক

ঝাড়-ফুঁক করার বিষয়টি কিছুটা স্বতন্ত্র। ঝাড়-ফুঁক বৈধও হতে পারে আবার অবৈধ বা না-জায়েযও হতে পারে। ঝাড়-ফুঁকের শির্ক বলতে এমন মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করাকে বুঝানো হয় যে মন্ত্রের মধ্যে শির্ক রয়েছে। সেই মন্ত্রই শির্ক যাতে ফেরেশতা, নবী, জ্বিন ও দেব-দেবী সহ অন্যান্য গায়রুল্লাহর সহযোগিতা কামনা করা হয় এবং যার মধ্যে কুফরী কালামের সংমিশ্রণ রয়েছে। তবে আল্লাহ্ তা'আলার নাযিল করা কিতাব পবিত্র কোরআন পাক ও তাঁর নাম ও বিশেষণ দিয়ে ঝাড়-ফুঁক সর্বাবস্থায় জায়েয। এর বৈধতা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত। এক হাদিসে ইব্রাহীম ইবনে মুসা (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে রোগে ওফাত পান সেই রোগের সময় তিনি নিজ দেহে সুরা নাস ও ফালাক পড়ে ফুঁক দিতেন। এরপর যখন রোগ তীব্র হয়ে গেল, তখন আমি সেগুলো পড়ে ফুঁক দিতাম।"

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং-৫৩২৪

অনুরূপভাবে দোয়া-কালাম পড়েও ঝাড়-ফুঁক করা যায়। আহম্মদ ইবনে আবু রাজা হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঝাড়-ফুঁক করতেন, আর এ দু'আ পাঠ করতেনঃ অর্থাৎ ব্যাথা দূর করে দাও হে মানুষের পালনকর্তা। শেফা দানের ইখতিয়ার কেবল তোমারই হাতে। এ ব্যাথা তুমি ছাড়া আর কেউ দূর করতে পারেনা।"

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং-৫৩৩৩

এসব দিক বিবেচনা করে শর'ই বিশেষজ্ঞগণ ঝাড়-ফুঁক জায়েয হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রেখেছেন, যা নিম্নরূপ:

- **তা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কালাম ও তাঁর নাম বা গুণাবলীর মাধ্যমে হতে হবে।**
- **তা কুফরী কালাম বা শিরকের সংমিশ্রন বর্জিত হতে হবে।**
- **তা যাদুমন্ত্র ব্যতিরেকে হতে হবে।**
- **সেখানে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকতে হবে যে, আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা ছাড়া মন্ত্র কোন কাজই করতে পারে না।**

তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোরআনে পাক বা দোয়া-কালাম ব্যতীত কোনো মন্ত্র-তন্ত্র বা কুফরী-কালাম দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করার কোন বৈধতা নেই; বরং এধরনের ঝাড়-ফুঁক শির্কী কর্ম হিসেবে বিবেচিত। এর সমর্থনে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) হতে। তিনি বলেনঃ

আমরা জাহেলী যুগে বিভিন্ন মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করাতাম। সুতরাং আমরা হুযুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম,

> **"ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! ঝাড়-ফুঁক সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?"**

তিনি বললেন,

> **"তোমাদের মন্ত্রগুলি আমাকে পড়ে শুনাতে থাকবে। যদি তাতে শির্ক যুক্ত কিছু না থাকে তবে তাতে কোন দোষ নেই।"**
>
> হাদিস, মুসলিম, নং-৫৫৪৬; আবুদাউদ, নং- ৩৮৪৭

যয়নব (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন,

> **"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- কে বলতে শুনেছি, মন্ত্র, তাবিজ ও মহব্বতের তা'বীয সব শির্কের অন্তর্ভুক্ত ।"**
>
> হাদিস, সুনান ইবনে মাজাহ, নং- ৩৫৩০

তাই মন্ত্র-তন্ত্রের ঝাড়-ফুঁক থেকে মানুষের দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। এগুলি পরিহার করে বান্দা শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে।

৭। তাবার্রুক বা বরকতের শির্ক

তাবার্রুক বা বরকত বলতে বুঝায় কোন ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ের মাঝে মঙ্গল ও কল্যাণের আশা রাখা, শুভ ধারণা পোষণ করা বা কামনা করা এবং প্রাচুর্য ও পবিত্রতায় বিশ্বাস রাখা। সকল মানুষের এ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, যাবতীয় বরকত মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসে।

প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য কোন কোন ব্যক্তি, বস্তু বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বরকত রেখেছেন; আবার অনেক কিছুর মধ্যেই তা রাখেননি। কাজেই শরিয়ত অসমর্থিত কোন কিছুর মাঝে বরকত আছে বলে বিশ্বাস করা ও তা খুঁজতে যাওয়া এবং এর মধ্যে কল্যাণ ও পূণ্য হাসিলের প্রচেষ্টা করা বৈধ নহে। যে সমস্ত স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদির তাবার্রুক গ্রহণ করা যায় তা শুধু ইসলামের স্বীকৃত ও অনুমতিতে হতে হবে এবং জানতে হবে যে, এগুলি বরকতের কারণ বা হেতু মাত্র, তা বরকতদাতা নয়। বরং বরকতদাতা শুধুমাত্র আল্লাহ্। যেমন: ঔষধ রোগমুক্তির কারণ মাত্র, রোগমুক্তিদাতা নয়।

কি শরীফ, কি মুবারক, কিসে বরকত আছে বা কি দ্বারা তাবার্রুক হবে, কোথায় কোন সময় কিভাবে বরকত লাভ হবে তা শুধু শরীয়তই বলতে পারে। কোনো ধারণা, ভক্তি বা তা'যীমের অতিরঞ্জন তা নির্নয় করতে পারে না; উপরন্তু তা শির্কের কারণ হয়ে থাকবে।

তাবার্রুকের শির্ক বলতে কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তি, বস্তু বা সময়ের মধ্যে বরকত রাখেননি সেগুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা করাকে বুঝায়।

তাবার্রুকের প্রকারভেদঃ তাবার্রুক বা বরকত কামনা সর্বসাকুল্যে দু'ধরনের হতে পারে,

ক. বৈধ তাবার্রুক এবং
খ. অবৈধ তাবার্রুক।

বৈধ তাবার্রুকঃ যে ধরণের ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যমে বরকত কামনা করা ইসলামী শরীয়তে জায়েয রয়েছে, সেগুলির মাধ্যমে বরকত কামনা করাকে বৈধ তাবার্রুক বুঝান হয়। যেমন:

- নবী সত্তা ও তার নিদর্শণ সমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণ: শরীয়ত কর্তৃক নির্ণীত মুবারক ব্যক্তিত্ব ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তার দেহ মোবারক এবং তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন চুল, ঘাম ও লালা ইত্যাদি ও তার লেবাস এবং তার ব্যবহৃত সকল বস্তুই ছিল বরকতপূর্ণ। এ বিষয়টি সাহাবাদের আমল থেকে প্রমাণিত রয়েছে।

- আল্লাহ্‌র যিকির ও নেককারদের সাহচর্যে থাকার মাধ্যমে বরকত গ্রহণ।

- যে কোন মসজিদে সালাত আদায় এবং ইবাদতের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ।

- পবিত্র সময়: রমযান মাস, শবে কদর, জুমু'আর দিন, সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার, হারামের চার মাস, আশুরার দিন, দুই ঈদের দিন এবং প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ ইত্যাদি সময় বরকতের।

- শরীয়ত সীকৃত খাদ্য, পানীয় বা ঔষধের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ: বিশেষ করে যাইতুনের তেল, মধু, কালোজিরা, দুধ, যমযমের পানি, আজওয়া খেজুর ইত্যাদির মাধ্যমে বরকত গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত।

- নির্দিষ্ট স্থান: মক্কা মুকার্রমা, মদিনা নবুবীয়া এবং শাম পবিত্র এবং মুবারক স্থান। এছাড়াও আরাফাত ময়দান, মুযদালিফা ও মিনা পবিত্র স্থান, তবে তা হজ্জ মৌসুমের নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। এ সকল স্থানে অবস্থান করা পূণ্যের কাজ। তবে যে শর'য়ী সীমা অতিক্রম করে এখানকার মাটি, কঙ্কর, ধূলা ছুঁয়ে বা গায় মাখিয়ে বা গাছ-পালা স্পর্শ করে বরকতের আশা করে বা এর দ্বারা আরোগ্য লাভের আশা করে সে ক্ষতিগ্রস্ত।

অবৈধ বা শির্‌ক জাতীয় তাবার্রুকঃ ইসলামী শরিয়তে জায়েয প্রকারের তাবার্রুক ছাড়া আর সকলই শির্‌ক জাতীয় তাবার্রুকের অন্তর্ভুক্ত। এটা আবার অনেক ধরনের হতে পারে:

o বরকতের নিয়তে কোন ঐতিহাসিক জায়গা ভ্রমন এবং কোন বস্তু স্পর্শ করণ: উহুদ পর্বত, বদর, খায়বর, হেরা বা সওর গিরি গুহায় উপস্থিত হয়ে তাবার্রুকের আশা করা অথবা কাবা শরীফের গিলাফ, মাকামে ইব্যাহিম, কবরে নববীর রেলিং, মসজিদে নববীর মিম্বর ও মেহরাব ইত্যাদি স্পর্শ করে হাত গায় বুলিয়ে বরকত গ্রহণ করা না জায়েয, বিদ'আত এবং শির্‌ক। কেননা এর কোন অনুমতি বা দলীল শরিয়তে নেই। এমনকি হযরে আসওয়াদ স্পর্শ করা বা ইশারা করা এবং রুকনে ইয়ামেনী যে স্পর্শ করা হয় তা কোন তাবার্রুকের জন্য নয়; বরং তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে করা হয়। হযরে আসওয়াদ কারো কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না, চুম্বনকালে হাজীর পাপও চুষে নেয় না। যেমন হাদীস শরীফে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হাযরে আসওয়াদের কাছাকাছি হয়ে তাতে চুমু খান এবং বলেন,

"তুমি একটি পাথর মাত্র, তোমার মধ্যে উপকার বা অপকার করার কোন ক্ষমতা নেই। যদি আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)**- কে তোমায় চুমু খেতে না দেখতাম তবে আমিও তোমায় চুমু খেতাম না।"**

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং ১৮৭১; তিরমিযী শরীফ, নং ৮০৭

এ হাদিসের আলোকে বোঝা যাচ্ছে যে, হযরে আসওয়াদে চুম্বন করা একটি মোস্তাহাব কাজ। এর মধ্যে বিশেষ কোন বরকত নেই যার মাধ্যমে পাপ মোচন হতে পারে। এতদসত্ত্বেও হজ্জ মওসুমে এ পাথরকে ঘিরে প্রচণ্ড ভীর লক্ষ্য করা যায় একটি বারের জন্য একে চুমু খাওয়ার জন্য। ঠেলা-ঠেলি আর ধাক্কা-ধাক্কি চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে সেখানে নানা দুর্ঘটনা সহ প্রান হানির ঘটনাও ঘটেছে। এটি নিঃসন্দেহে না জায়েয কাজ এবং তা থেকে বিরত থাকাই সকলের জন্য মঙ্গল জনক।

o কোন বুজুর্গ, পীর, অলি বা তদীয় নিদর্শন সমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণ: কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তদীয় নিদর্শন সমূহ কর্তৃক যখন বরকত হাসিল করা জায়েয তখন অবশ্যই বুজুর্গ, পীর, অলি বা তদীয় নিদর্শন সমূহ কর্তৃক বরকত হাসিল করা জায়েয হতে হবে। কিন্তু বিষয়টি ঠিক তা নয় বরং কেবলমাত্র এদের মধ্যে জীবিতদের সাহচর্য নেওয়ার মাধ্যমে বরকত হাসিল হতে পারে। এ ছাড়া অন্য যে কোন উপায় এদের মাধ্যমে বরকত হাসিল করার প্রচেষ্টা করা শরিয়ত সম্মত নয়। তবুও মানুষ এদের মাধ্যমে বরকত হাসিলের প্রচেষ্টায় রত রয়েছে যুগ যুগ ধরে। উদাহরণস্বরূপ: কোন বুজুর্গদের কবর জিয়ারত করা, তাদের মাকামের দরজা, চৌকাট কিংবা দেয়ালে চুম্বন করা, মাজারের স্তম্ভ বা দেওয়ালে বুক লাগিয়ে প্রার্থনা করা, মাজারের গিলাফ স্পর্শ করে কান্নাকাটি করা, সেখানকার ধূলো-মাটি পবিত্র জেনে তা গায়ে মাখা, সেখানকার গাছ-পালাকে সম্মান করা ইত্যাদি আচরণ নিশ্চয় হারাম, বিদ'আত ও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে মাজারের পুকুরের পানিকে পবিত্র মনে করে তাতে গোসল করা, মাজারের শিন্নী, ফুল, আগরবাতি, মোমবাতি, কবরের চাদর ইত্যাদিকে তাবার্রুক মনে করে ব্যাবহার করার অনুমতি ইসলামে নেই। এগুলি এক ধরনের বিধর্মীদের পূজার বেদীতে অর্ঘ্য করা প্রসাদের শামিল।

o শরীয়ত অসমর্থিত কোন সময় কর্তৃক বরকত কামনা করা: শরীয়তের নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত কোন বিশেষ দিন বা সময়কে পবিত্র বা পালনীয় এবং বরকতের মনে করাকে শরীয়ত অনুমতি দেয় না। যেমন: নবীর জন্ম দিন বা নবী দিবস, শবে মিরাজ, শবে বরাত, হিজরত দিবস, বদর দিবস অথবা কারো মৃত্যু দিবস ইত্যাদি দিবসকে বরকতময় মনে করে তা উদ্‌যাপন করার কোন শর'য়ী বৈধতা নেই।

o আরবী লেখা বা মসজিদের ছবিকে বরকতময় মনে করা: তাবার্রুক বা অভিষ্ট লাভের আশায় 'আল্লাহু' বা কোন কোরআনের আয়াত লকেটে লিখে গলায় লটকানো কিংবা বাঁধিয়ে দেওয়ালে বা গাড়ীতে ঝুলানোর নির্দেশ ইসলামে নেই। আবার পাশাপাশি 'আল্লাহু', 'মুহাম্মাদ' সমভাবে আরবীতে লিখে, 'ইয়া মুহাম্মাদ' ' ইয়া রাসূলুল্লাহ', ইয়া আলী, 'ইয়া গরীব নেওয়াজ' ইত্যাদি লিখে অথবা কাবা ও মসজিদে নববী বা অন্য কোন মসজিদ অথবা কোন বিখ্যাত পীরের মাজারের ছবির মাধ্যমে তাবার্রুক গ্রহণ করা কিংবা বালা-মুছিবত দূর করার উদ্দেশ্যে অথবা কোন অভিষ্ট লাভের আশায় সে ছবি গলায়, বাড়ীর দেওয়ালে অথবা গাড়ী ইত্যাদিতে ঝুলান শির্কের পর্যয়ে পড়ে– (তাওহীদ; আব্দুল হামীদ ফাইযী, সৌদি আরব)।

৮। অশুভ লক্ষণের শির্ক

অশুভ লক্ষনের শির্ক বলতে বুঝায় কোন বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণী দর্শণে বা উহার বিশেষ কোন আচরণে কোনো অমঙ্গল নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করা। এভাবে যাত্রালগ্নে কোন অপছন্দনীয় ব্যক্তির চেহারা দর্শণ, কোন বিশ্রী প্রাণী বা বস্তু দর্শণ অথবা এদের কোনরূপ আচরণ এমন কি কোনো শব্দ বা ধ্বনি শ্রবণ অথবা কোনো জায়গায় অবতরণ কারো জন্য কোনো অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে বলে বিশ্বাস করলে এ শির্ক সংঘটিত হয়ে থাকে। এ জাতীয় লক্ষণ বোধ ব্যাধি আজকের নতুন নয় বরং তা অনেক পুরাতন যুগেরই বটে। প্রাচীন কাল ধরেই তা সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই এবং এর কোনো সত্যতাও নেই। কোন কাজের পূর্বলক্ষণ বলতে কিছু নেই। সকল মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। সব কিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছায় সঠিক সময়ে যথাযত ভাবেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

কুলক্ষণ বোধ ব্যাধি এক প্রকার শিরক। এটা শির্ক একারণে যে, তাতে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকে ক্ষতি সাধক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। অন্যদিকে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে বান্দার সুগভীর সম্পর্ক কায়েম করার শামিল এবং তা তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্ নির্ভরশীলতা বিরোধীও বটে। বস্তুতঃ তা শয়তানের ওয়াসওয়াসা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সকল কল্যাণের মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তাই সকল কল্যাণকে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ এবং পূণ্যের ফল হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। পক্ষান্তরে সকল অকল্যাণ আল্লাহ্ তা'আলার ইনসাফ ও নিজ গুণাহের শাস্তি হিসেবে মেনে নিতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"তোমার যদি কোন কল্যাণ সাধিত হয় তাহলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর যদি তোমার কোন অকল্যাণ সাধিত হয় তা হলে তা একমাত্র তোমার কর্ম দোষেই হয়েছে।"

আল কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত- ৭৯

কোন বস্তু, ব্যক্তি বা কোনো প্রাণীর মধ্যে এমন কোন অকল্যাণ নিহিত নেই যার অমূলক আশংকা করা যেতে পারে এবং যা আল্লাহ্র ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারে। এমন একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই। পেঁচায় কুলক্ষণ নেই এবং সফর মাসেও অকল্যাণ নেই।"

হাদিস, সহীহ বুখারী শরীফ, নং ৫৩৪৬

তাই অশুভ লক্ষণ বা কোন কিছুতে কুলক্ষণের কোন ভিত্তি নেই। উপরন্তু এ ধরনের আলামত বাছ-বিচার করা একটি শির্কী কর্ম এবং তা থেকে সকলকে দূরে থাকাই বাঞ্ছণীয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

"অশুভ লক্ষণ গ্রহণ শির্কী কাজ। আমাদের সবারই অশুভ লক্ষণের ধারণা হয়, তবে তাওয়াক্কুলের কারণে আল্লাহ্ তা দূর করে দেন।।"

হাদিস, ইবনে মাজাহ, নং ৩৫৩৮

অন্য একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

"যাকে কুলক্ষণ বোধ নিজ প্রয়োজন মেটানো থেকে বিরত রেখেছে বস্তুতঃ সে শির্ক করল ।"

হাদিস, মুসনদে আহমাদ, নং ২/২২০

তবে আমাদের সমাজে এ কুলক্ষণ ব্যাধিটি দীর্ঘদিন থেকে যেভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে তার কিছুটা পরিচয় তুলে ধরা দরকার, কেননা সেখান থেকে মানুষ কিছুটা হলেও শিক্ষা নিতে পারবে বলে আশা রাখি। যেমনঃ শূন্য কলসী দেখলে যাত্রা অশুভ হয়, হোঁচট খেলে বা হাঁচি দিলে ভালকাজে বাঁধা আসে, পেঁচা দর্শন কুলক্ষণ, ইত্যাদি। আবার কিছু লোক নির্দিষ্ট কোন সময়, দিন ও মাসকে অশুভ বলে মনে করেন এবং সে সময়ে কোন শুভ কাজের আয়োজন, উদ্বোধন করা থেকে বিরত থাকেন। বিশেষ করে বিবাহ-শাদী এবং নতুন গৃহ সঞ্চারের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করা যায়। অনেকে শনিবার বা সপ্তাহের অন্য কোন দিন বা কোন মাসকে অশুভ ভেবে থাকেন। এমনিভাবে জন্ম দিন বা জন্ম মাসে বিবাহ-শাদীতে অকল্যাণ রয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হাদিস দৃষ্টে এ সকল আচরণ কোন ভাবেই বৈধতা পেতে পারে না। বরং তা শির্কী কর্ম হিসেবে বিবেচিত। উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও মানুষ তার বিশ্বাস এবং আচার-আচরণে যেভাবে অশুভ লক্ষণের শির্কে জড়িয়ে থাকতে পারে তার কিছু বাস্তব নমুনা উপস্থাপন করা যায়ঃ

- কুকুরের কান্না সুরের ডাক শুনলে বিপদের আশংকা করা
- দাঁড় কাকের কা-কা শুনে কোন দুর্ঘটনা বা আচমকা বিপদ আসন্ন ভাবো।
- বাম চোখের পাতা লাফালে অসুখ-বিসুখ হবে ভাবা
- সকাল বেলায় লেংড়া-খোড়া দেখলে বা কানা দেখলে সারাদিন অমঙ্গলে কাটবে ভাবা
- চোখে ফুল ফোটা প্রিয়জন হারাবার লক্ষণ ভাবা ইত্যাদি এবং আরো অনেক।

তবে আমাদেরকে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে এ ধরনের আলামতের মধ্যে কোন কুলক্ষণ নেই। বস্তুতঃ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সবকিছুই আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ে সঠিকভাবে সম্পাদন করে থাকেন।

মূলকথা হচ্ছে, আপনি যখন শরীয়ত সম্মত কোন কাজ করতে ইচ্ছে করেন তখন দিন-ক্ষণ বাচ-বিচার না করে তা একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করেই শুরু করে দিন। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কুৎসিৎ রূপ দেখে বা কোনো অরুচিকর বাক্য শুনে বা হাঁচি শুনে বা পেঁচা দেখে সে কাজ শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন না। যদি তা করেন তাহলে আপনি আপনার অজান্তেই শির্ক করে বসলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো তাঁর একান্ত ইচ্ছায় কোন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে অকল্যান নিহিত রাখতে পারেন যা একান্তভাবেই তাঁরই ইচ্ছায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কিছু ক্ষতি সাধন করতে পারে। সেক্ষেত্রে সেটা প্রতিহত করার ক্ষমতা অন্যকারো নেই। তাই একনিষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'আলার শরণাপন্ন হলে তা থেকে বান্দাকে নিশ্চয়ই তিনি নিস্কৃতি দিবেন ইনশা আল্লাহ্।

৯। আল্লাহ্র সাথে অন্যকে জুড়ে নিয়ে কথা বলার শির্ক

আমাদের সমাজে এমন কিছু কথার প্রচলন দেখা যায় যেখানে আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন সত্তার নাম জুড়ে কোন বিষয় উপস্থাপন করা হয়। যেমন- "আল্লাহ্ এবং আপনি না হলে আমার সবই ধ্বংস হয়ে যেত" আবার কেমন আছেন? প্রশ্ন করলে এর উত্তরে প্রায়শঃই মানুষকে এরূপ বলতে শোনা যায় "আল্লাহ্ এবং আপনি যেমন চেয়েছেন" ইত্যাদি।

উল্লিখিত বাক্য দু'টোতে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে অংশী স্থাপন করা হয়েছে, সুতরাং এ ধরনের কথা-বার্তা শিরক। এখানে 'এবং' শব্দটির মধ্যে সমকক্ষতার গন্ধ আছে। তবে 'এবং' এর পরিবর্তে যদি অন্য শব্দ ব্যাবহার করা যায়, যেমন 'অতঃপর', 'এরপর' ইত্যাদি, তাহলে এ শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকা যায়। যেমন "আল্লাহ্‌ অতঃপর আপনি যেমন চেয়েছেন" এখানে 'এবং' এর যায়গায় 'অতঃপর' শব্দটি ব্যাবহারের ফলে এর দ্বারা সমকক্ষতা প্রকাশ পায় না। তবে সবথেকে নিরাপদ হচ্ছে এই যে, কারো নাম না জড়িয়ে এভাবে বলা যে, 'আল্লাহ্‌ একাই যা চান'। এ সম্পর্কে একটি হাদিস উপস্থাপন করা যায়। সহীহ হাদিসে বর্নিত আছে,

একব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলল,

"যা আল্লাহ্‌ চান ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **চান।"**

তিনি বললেন,

"তুমি কি আমাকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করছ? একথা বল-যা আল্লাহ্‌ একাই চান।"

তফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড-পৃষ্ঠা ১৮৮,১৮৯

মুসলিমদের মাঝে এ জাতীয় বাক্য ব্যবহারর আরো অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়। যেমন:

- আমার জন্য শুধু আল্লাহ্‌ এবং আপনি রয়েছেন।
- আমি আল্লাহ্‌ এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর উপর নির্ভর করি।
- এটি আল্লাহ্‌ এবং আপনার বরকতেই হয়েছে।
- আমি আল্লাহ্‌র নিকট এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করি।
- আমার জন্য উপরে আছেন আল্লাহ্‌ আর নিচে আছেন আপনি।

উল্লিখিত বাক্যগুলিতে 'এবং' ও 'আর' শব্দ দু'টি সংযোগ স্থাপন কারী শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যের শরীক স্থাপন কারী বাক্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন আগেই বলা হয়েছে যে, এ শব্দ দু'টোর পরিবর্তে যখন 'অতঃপর' বা 'এরপর' ব্যবহার করা হয় তখন সে ভয় থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং শির্‌ক থেকেও বাঁচা যায়। এর স্বপক্ষে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"যখন তোমাদের কেউ শপথ করে, সে যেন এমন না বলেঃ আল্লাহ্‌ যা চান এবং তুমি যা চাও, বরং সে যেন বলেঃ আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন, এরপর তুমি যা চাও।"

হাদিস, ইবনে মাজাহ, নং ২১১৭

সুতরাং আমরা আমাদের দৈনন্দিন আচরণে ও কথা-বার্তায় এ ধরনের সূক্ষ্ম ভুল গুলোকে হাদিসের আলোকে শুধরে নেওয়ার প্রচেষ্টা করব আর একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করব এবং তাঁর নিকটেই সাহায্য কামনা করব।

১০। দ্ব্যর্থক শব্দ উচ্চারণের শির্‌ক

ঘটনাবহুল মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখের অনেক ঘটনাই ঘটে থাকে। কিন্তু কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা মানুষকে পীড়া দেয় বা অখুশী করে। তখন মানুষ সার্বক্ষনিক অনুশোচনায় ভুগতে থাকে এবং নানা প্রকার বিলাপ

করতে থাকে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে তা নির্ধারিত তকদীর অনুযায়ী ঘটে থাকে। তার জন্য নিজের বা অন্যের কোন আচরণকে দোষারোপ করে এভাবে কথা বলাঃ 'যদি এটা না করতাম ওটা হতো না' অথবা 'যদি এটা করতে তাহলে ওটা হোত' ইত্যাদি প্রকারে দ্ব্যার্থক বা অনিশ্চিত শব্দ উচ্চারণ করা এ প্রকারের ছোট শির্ক। কেননা এ জাতীয় কথা এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়াও বান্দাহ নিজের বা অপরের ইচ্ছার ভিত্তিতে কারো লাভ ক্ষতি তথা তকদীরের উপর প্রভাব ঘটাতে পারে। মানুষ আরো নানাভাবে এ দ্ব্যর্থক শব্দগুলোর ব্যবহার করে শির্কে পতিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এর কিছু উদাহরণ পেশ করা যায়:

- যদি অমুক ডাক্তারকে সময়মত দেখানো না যেত তাহলে লোকটিকে বাঁচান যেত না।
- যদি অমুকের সাহায্য না পাওয়া যেত তাহলে এবার নিশ্চিত না খেয়ে মরতে হতো।
- যদি বাড়ীতে কুকুরটা না থাকতো তাহলে চোর অবশ্যই আসতো।

এখানে 'যদি' শব্দটি দিয়ে ডাক্তার, অমুক এবং কুকুরকে বিপদ মুক্তির ওসীলা মনে করা হয়েছে– যা শির্কের পর্যায়ে পড়ে। উপরন্তু এ ধরনের আচরণ সত্যিকার অর্থে তকদীরে অবিশ্বাস এবং আল্লাহ্র উপর অনির্ভরতার বহিঃপ্রকাশ। তাই এ সকল আচরণ শির্ক। এভাবে এ শির্কের আরো অনেক উদাহরণ পেশ করা যায়:

- কোন বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পরে কেউ যখন বলেঃ যদি লোকটি বিমানে না উঠত তাহলে মারা যেত না।
- লোকটি যদি জঙ্গলে না যেত তাহলে বাঘের মুখে তার মৃত্যু হত না।
- যদি ঐ রাস্তায় যেতাম তাহলে নির্ঘাত আমার মৃত্যু হত।

কোন অতীত ঘটনাকে 'যদি' শব্দটি দিয়ে এভাবে বিতর্কিত করে তোলা সমীচীন নহে। কেননা মানুষের জীবন-মৃত্যু তো আল্লাহ্র হাতে। তা ছাড়াও মানুষের জীবনের সকল ঘটনাই আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রনে এবং তকদীর নির্ভর। তাই এ সব বিষয় বিতর্কিত না করে এবং হায়-হুতাশ না করে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করাই শ্রেয় এবং তাওয়াক্কুলের পরিচায়ক। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তকদীর মানুষকে তার গন্তব্যে ঠিকই টেনে নেবে। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর অনাকাঙ্খিত বিপদ নেমে আসলে তাদের মধ্যে যারা মুনাফিক তাদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন,

"তারা বলেঃ এ যুদ্ধ পরিচালনায় যদি আমাদের ভূমিকা থাকত, তাহলে আজ আমরা এখানে নিহত হতাম না; তুমি তাদের বলে দাও যদি আজ তোমরা সবাই ঘরের ভিতরেও থাকতে তবুও নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিল তারা অবশ্যই মরণের বিছানার দিকে বের হয়ে আসতে।"

আল কোরআন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৫৪

উক্ত আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে 'যদি' শব্দটি উচ্চারণ করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য, খাঁটি মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়। মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো তার উপর কোন বিপদ আসলে সে এমন শব্দ উচ্চারণ করবে যা ধৈর্য, সওয়াবের আশা ও তকদীরে দৃঢ় বিশ্বাস বুঝাবে।

বস্তুতঃ 'যদি' শব্দটি মানুষকে তাওয়াক্কুল থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেয় এবং শয়তানের অনুপ্রবেশের পথ সুগম করে দেয়। এ সম্পর্কে একটি হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

"তোমার উপর কোন বিপদ পতিত হলে তুমি এটা মনে করনা যে, আমি এরূপ করলে বিপাদাপন্ন হতাম না, বরং একথা বল যে, আল্লাহ্পাক যা নির্ধারন করেছেন এবং ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা তোমার 'যদি' শব্দটি শয়তানের কর্মের দরজা খুলে দিয়েছে।"

সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদিস- ৬৫৩৪,

সুতরাং শয়তানের পথ পরিহার করে 'যদি' শব্দের প্রভাব মুক্ত হয়ে বিশ্বাস ও চেতনায় একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল থাকাটাই নিরাপদ।

১১। যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়ার শির্ক

যুগ এবং বাতাস আল্লাহ্ তা'আলারই সৃষ্টি। আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই এগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যুগ বা বাতাস নিজে থেকে কারো কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই এ গুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের জন্য প্রভূত কল্যাণ। তাই যুগ বা বাতাসকে গালি দেওয়ার কোন মানে হয় না।

যুগ, সময় বা কালকে গালি দেয়া বলতে বুঝায় যুগকে অভিসম্পাত করা, কোন বিশেষ সময়কে অলুক্ষণে, অশুভ বা ক্ষতিকর মনে করা, সময়ের দুর্নাম করা ইত্যাদি। আমাদের আচরণে যেভাবে যুগকে গালি দেয়া হয় তার কিছু নমুনা পেশ করা হল:

- শেষ জমানা বড়ই খারাপ, এ সময়টা অকল্যাণকর বা অশুভ, এ জমানা নিষ্ঠুর কলিকাল ইত্যাদি।
- শনিবার ও মঙ্গলবার অশুভ দিন। কাজেই এদু'দিনে কারো বিবাহ শাদী করানো যাবে না অথবা বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কাটা যাবে না।
- অমাবশ্যাতে স্ত্রী মিলনের ফলে সন্তান হলে তা কুসন্তান হবে।
- অনেকে অপদার্থ সন্তানকে এভাবে গালি দেয়ঃ কি কুলক্ষনেই না জন্মেছিলে!
- অনেক মুসলিমকেও দেখা যায় যে, পঞ্জিকা দেখে দিন-ক্ষণ বাচ-বিচার করে কোন শুভ কাজ বা যাত্রা শুরু করে ইত্যাদি।

বাতাসকেও মানুষ বিভিন্নভাবে গালাগাল দিয়ে থাকে, যেমন গ্রামে গঞ্জে বাচ্চাদের অসুখ-বিসুখ হলে বলতে শোনা যায়ঃ ছেলেটির বা মেয়েটির বদ হাওয়া লেগেছে বা বাতাস লেগেছে। আবার ঝড়ো হাওয়ার পরে অনেককেই বলতে শোনা যায়ঃ মরার বাতাস আমার সব কিছু তছনছ করে দিল ইত্যাদি।

যুগ বা বাতাসকে দোষারোপ করার চরিত্র শুধু আজকের নয় বরং তা প্রাচীন আমল থেকেই চলে আসছে। তৎকালীন মক্কার মুশরিকরা মনে করত যে একমাত্র যুগই তাদের ধ্বংসের কারণ। যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়ার মধ্যে তিনটি অপকার রয়েছে, যথা–

- গালির অনুপযুক্ত বস্তুকে গালি দেয়া। সুতরাং এটা কবিরা গুণাহ।
- ওদেরকে গালি দেয়া শির্ক। কারণ যে ওদেরকে গালি দেয় সে অবশ্যই এমন মনে করে যে, ওরা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ছাড়াই কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে।
- ওদেরকে গালি দেয়া মানে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকেই গালি দেয়া। কারণ তাঁর আদেশেই বাতাস বয় এবং যুগ পরিবর্তিত হয়। এটা আর একটি কবিরা গুণাহ।

সময়ের সাথেই মানুষের সুখ-দুঃখ আবর্তিত হয়, একথা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে সময়ের নিজস্ব কোন ক্ষমতাই বা হাত নেই কারো কোন উপকার বা ক্ষতি সাধন করার; বরং সময় আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি এবং কালচক্র নিয়ন্ত্রিতও হয় আল্লাহ্রই ইচ্ছায়। তাই সময়কে গালি দেয়া আল্লাহ্ তা'আলাকেই গালি দেয়ার শামিল। আবার বাতাস আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস তথা জীবন ধারনের একটি বিশেষ উপকরণ। কিন্তু কখনো কখনো বাতাস আবার বয়ে আনতে পারে দুঃখ-দুর্দশা। তবে সেটাও আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে বলে একান্ত বিশ্বাস করতে হবে। যুগ ও বাতাস এ দু'টোই আল্লাহ্র বিশেষ নি'য়ামত। কাজেই এদেরকে গালি দেয়া কারো পক্ষেই সমীচীন নহে। অথচ মানুষ যখন কোন কষ্ট ও বিপদ আপদে পড়ে তখন যুগকে সম্পর্কযুক্ত করে গালি দেয়। এ জমানায় অনেকের মুখেই আফসোসের সুরে বলতে শোনা যায়ঃ হায়রে কলির কাল! কি দেখলাম আর কি হয়ে গেল! আবার এমনটিও বলে থাকেঃ এখন সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে। অথবা কাউকে উপদেশের সুরে এভাবে বলেঃ এখন দিনকাল খারাপ হয়ে গেছে, দেখে-শুনে পথ চলো। প্রকৃতপক্ষে যুগ কিছুই করে না। সবকিছুই করেন আল্লাহ্ তা'আলা। এ কথা বাতাসের বেলায়ও প্রযোজ্য। তাই যুগ ও বাতসিকে গালি দেয় হারাম। এ বিষয়ের উপর বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত আছে। এখানে তার দু'একটি উল্লেখ করা যায়:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"আল্লাহ্ বলেনঃ আদম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়, তারা জমানাকে গালি দেয় অথচ আমিই জমানা। একমাত্র আমার হাতে রাত ও দিনের পরিবর্তন হয়।"

সহীহ বুখারী শরীফ, হাদিস- ৫৭৪৮

বাতাসকে গালি দেয়ার নিষিদ্ধতার উপর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন উবাই ইবনে কাব (রাঃ)। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"তোমরা বায়ুকে গালি দিওনা। তোমরা অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পেলে বলবেঃ হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে কামনা করি এ বায়ুর কল্যাণ। আমরা তোমার নিকট আশ্রয় চাই এ বায়ুর অনিষ্টতা থেকে এবং এর মধ্যে নিহিত ক্ষতি থেকে।"

সহীহ তিরমিযী শরীফ, হাদিস- ২১৯৮

যুগ এবং বাতাস সহ সব কিছুর নিয়ন্ত্রণই যখন আল্লাহ্র হাতে তখন অনর্থক এ দু'টি বস্তুকে গালি দিয়ে নিজের পাপের বোঝা ভারী করার কোন মানেই হয় না। আল্লাহ্র কাছে সকল বিষয়ের কল্যাণ কামনা করি এবং এর অকল্যাণ থেকে পানাহ চাই।

১২। নামের শির্ক

মানুষের নামের সাথেও শির্ক নিহিত থাকতে পারে। মানুষ আল্লাহ্র বান্দা বা দাস। তাই কারো জন্য এমন নাম রাখা উচিত নয় যাতে আল্লাহ্র সমকক্ষতা বুঝায় বা যার মধ্যে শির্কের গন্ধ পাওয়া যায়। শাহেনশাহ্, রাজাধীরাজ বা মহারাজ, ইত্যাদি নামগুলি খাস করে সৃষ্টি কর্তার বেলায় প্রযোজ্য। সুতরাং কারো জন্য আল্লাহ্র এ নামগুলি ব্যবহার করা অনুচিত। এ নামগুলি মানুষের জন্য ব্যবহার করা হলে আল্লাহ্র কাছে তা নিকৃষ্ট নাম হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকেবর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত নামধারী হলো সে ব্যক্তি, যে রাজাধিরাজ বা শাহানশাহ নাম ধারণ করে।"

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫৭৭৩

আবার আল্লাহ্র অনেকগুলি গুণবাচক নাম রয়েছে যেমন রাহমান, রহীম, করীম, খালেক ইত্যাদি। কারো জন্য শুধু এই নামের ব্যাবহার শোভনীয় নয়। তবে এ সমস্ত নাম মানুষের জন্য জায়েয হবে তখন, যখন এ নামের পেছনে আব্দ শব্দটি যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে শুধু জায়েযই নয় বরং এটা অতি সুন্দর নাম হিসেবেও বিবেচিত হবে। যেমন আব্দুর রাহমান। এখানে রাহমানের সাথে আব্দ শব্দটি যোগ করাতে আব্দুর রাহমান হয়েছে এবং তা দিয়ে রাহমানের দাস অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ্র দাস হিসেবে পরিচিত করান হয়েছে যা একটি স্বতন্ত্র নামের পরিচিতিও বটে। ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"মহান আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম আবদুল্লাহ ও আব্দুর রাহমান।"

সহীহ ইবনে মাজাহ, হাদিস- ৩৭২৮

অন্যভাবে বলা যায়, যে সকল নাম দ্বারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকারো দাস বা গোলাম অর্থ প্রকাশ করতে পারে, সে সকল নাম মানুষের জন্য পরিহার করা উত্তম। কেননা এর মধ্যেও শির্কের গন্ধ বিদ্যমান। যেমনঃ আব্দুন্নবী, আব্দুর রাসূল, গোলাম নবী, গোলাম রাসূল, গোলাম মোস্তফা, গোলাম আম্বিয়া, গোলাম পীর ইত্যাদি নামগুলিতে আব্দ এবং গোলাম যোগ হওয়াতে যথাক্রমে নবী, রাসূল, মোস্তফা, আম্বিয়া ও পীর জাতীয় সত্তার দাস বা গোলাম অর্থ প্রকাশ করে– যা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আবার নবী বখ্শ, রাসূল বখ্শ, আলী বখ্শ, পীর বখ্শ (অর্থাৎ নবী, রাসূল, আলী বা পীরের দান) ইত্যাদি নাম রাখাও শির্ক। কারণ সন্তান দান তো আল্লহ্ই করে থাকেন। সুতরাং এ জাতীয় নাম পরিহার করে চলাই সবার জন্য মঙ্গলজনক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের সমাজে মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত শির্‌কঃ

আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। একজন ব্যক্তির পক্ষে তাই মুসলিম হওয়াটা অত্যন্ত গৌরব ও আনন্দের বিষয়। তবে নাম সর্বস্ব মুসলিম হওয়াতে কোন সাফল্য নেই। সত্যিকারের মুসলিম হবার জন্য একজন মানুষকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হয়; অর্থাৎ তাকে ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম বা বিধি-নিষেধ পুরোপুরিভাবে পালন করতে হয় এবং এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিয়োজিত থাকতে হয়। যারা প্রতিমা, দেব-দেবী, প্রস্তর, বৃক্ষ, তারকা, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, সমুদ্র এগুলোকে ক্ষমতাশীল মনে করে এগুলির পূজা করে তারা মুশরিক। তবে খোলাখুলি ভাবে মুশরিক ও মূর্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু শির্‌ক নয়, বরং যে ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করে এবং কোন প্রতিমার পূজা পাঠ করে না, কিন্তু কোন ফেরেশতা কিংবা রাসূল কিংবা কোন ওলীকে আল্লাহ্‌র কোন কোন বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে, সে ব্যক্তিও মুশরিক। এভাবে মুসলিমদের মাঝে ঈমান থাকা সত্ত্বেও অনেকেই মুশরিক। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ নিজেদেরকে সত্যিকারের মুসলিম বলে দাবী করলেও বাস্তবে তাদের বিশ্বাস, অভ্যাস বা আচার-আচরণের মধ্যে অনেক ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান থাকা সত্ত্বেও তারা বিভিন্নভাবে মুশরিকদের ন্যায় আচরণ করে। দৈনন্দিন জীবনে মুসলিমগণ বিভিন্ন রকমের ইবাদত বন্দেগী করে থাকে। ইবাদতের ব্যাপারে এক আল্লাহ্‌র অধিকার সংরক্ষণ করা তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ দিক। আলাহ্‌ তা'আলা একাই ইবাদত পাওয়ার হকদার এবং তিনিই ইবাদতের কল্যাণকর প্রতিদান দেয়ার মালিক। কিন্তু মানুষের আচরণ দ্বারা যদি এর কোন ব্যতিক্রম করা হয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো প্রতি যদি ইবাদত নিবেদিত হয়, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই শির্‌ক হিসেবে বিবেচিত হবে। ইবাদত শব্দটির পরিধি অনেক ব্যাপক। তাই সকল প্রকার ইবাদত

মূলক আচরণগুলি সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখতে হবে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্ক সংঘটিত হবার সকল সম্ভাব্য আচরণ পরিহার করতে হবে। এজন্য সকলেরই অতি সন্তর্পণে পথ চলা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত। একইভাবে তাদের ধর্মীয় জ্ঞানও সীমিত। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তারা পুরোপুরিভাবেই আলেম-ওলামাদের উপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে আলেমদের উপর যে কঠিন দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে তার কতটুকু তারা পালন করতে পেরেছেন সেটা বাস্তবিকই ভাববার বিষয়। এ ছাড়াও আমাদের সমাজে একশ্রেণীর লোক রয়েছেন যাদেরকে মানুষ আলেম বলে জানে, কিন্তু বাস্তবে তারা শরীয়তের জ্ঞান কতটুকু রাখেন সেটাও প্রশ্নের সম্মুখীন। আবার আমাদের সমাজের অধিকাংশ আলেমগণ বিশেষ কোন গোষ্ঠীর কেতাবের উপর নির্ভরশীল। কোনভাবে কোরআন চর্চা চালিয়ে গেলেও সহীহ হাদিসের বিষয়ে তারা উদাসীন। এমনকি কোন বিষয়ে সহীহ হাদিসের দলীল পেশ করা হলেও তাদের কাছে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এসব কারণেই আমাদের সমাজে শির্ক সহ বিভিন্ন প্রকারের অপরাধ চলে আসছে অব্যহতভাবে।

মুসলিমদের বিশ্বাস ও আচার আচরণে বিভিন্ন ভাবে শির্ক সংঘটিত হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এখানকার মুসলিমদের মধ্যে বিশ্বাসে, আচার-আচরণে এবং অভ্যাসগত কাজ-কর্মের মধ্যে যে সকল শির্কের প্রচলন দেখা যায় তার একটি সামগ্রিক বাস্তব চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হলো: **(সকল বিষয়ের দলীল প্রথম অধ্যায়ে দেখুন)**।

১. রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কেন্দ্র করে শির্ক-এর আচরণঃ

মহান আল্লাহ্‌র তা'আলা যুগে যুগে আসমানী কিতাব ও সহীফা সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে সত্য দ্বীন তথা হিদায়েতের পথ প্রদর্শনের জন্য। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐশীবাণীর সর্বশেষ সংস্করণ পবিত্র আল-কোরআন সহ প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানব জাতির জন্য। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে নবুয়াত এবং রিসালাতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটেছে বিধায় তিনি আল্লাহ্‌র মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে বিবেচিত। পবিত্র কোরআনে বহু জায়গায় আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ এসেছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্য রাসূলের আনুগত্য বা অনুসরণ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। রাসূলের অনুসরণ ছাড়া আল্লাহ্‌র আনুগত্য অর্থহীন। তবে রাসূলের আনুগত্য বলতে কি বুঝায়, এ সম্পর্কে আমাদের সকলেরই পরিষ্কার এবং সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। একজন মানুষের সারা জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড রাসূলের আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত করা অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ করাই হল তাঁর আনুগত্য। রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিজে করেছেন, যা করার জন্য সাহাবাগণকে আদেশ দিয়েছেন বা যা করার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন তা পালন করা এবং যা তিনি নিজে করেন নি, অন্যদেরকেও যা করতে নিষেধ করেছেন বা যা করার অনুমতি দেননি–সে সকল আচরণ থেকে বিরত থাকাই প্রকৃতপক্ষে রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ। তবে রাসূলের আনুগত্যের নামে এমন কোন বিশ্বাস পোষণ করা বা আচরণ করা যাবে না, যা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমাদের সমাজে সুন্নতের নামে বেশ কিছু বিদ'আত প্রচলিত রয়েছে এবং বিদ'আতের অন্তরালে তা কোন কোন ক্ষেত্রে শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। একদল অতি উৎসাহী আবেগপ্রবণ নবী-প্রেমিক রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অতিরিক্ত মহব্বত প্রদর্শন করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে ফেলছেন এবং শির্কের মত বড় পাপ সংঘটিত করে যাচ্ছেন। তাদের বিশ্বাস ও আচরণে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কেন্দ্র করে যে প্রকারে শির্ক সংঘটিত হয় তার কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হলঃ

ক) রাসূল (সঃ) গায়েব বা অদৃশ্য জানেন বলে বিশ্বাস করার শির্‌কঃ

গায়েবের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই রাখেন। রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানতেন না। এ বিষয়ের উপর কোরআন ও হাদিসের দলীল আমরা প্রথম অধ্যায়ে মূল আলোচনার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছি। রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে থেকেই গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন বলে বিশ্বাস করা এবং সেভাবে আচরণ করা এক প্রকারের আসমা অস্ সিফাতের শির্‌ক। এ ধরনের শির্‌ক এর প্রচলন আমাদের সমাজে বহুদিন থেকেই বিদ্যমান আছে। বাস্তবে এ শির্‌ক কিভাবে সংঘটিত হয় তা বুঝতে হলে কিছুটা পূর্ব আলোচনার প্রয়োজন। আল্লাহ্‌পাক মুমিনদেরকে তাঁর রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে হিসেবে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা সকল মুমিনের উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও মানুষদেরকে তাঁর উপর দরূদ প্রেরণের জন্য উৎসাহিত করেছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করার সঠিক নিয়ম-কানুন এবং পদ্ধতিও স্বয়ং তিনিই শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করতে গিয়ে মানুষ 'মিলাদ'-এর মত একটি বিদ'আতী অনুষ্ঠানের প্রচলন করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, মিলাদে তারা কিয়াম করে আবার কোথাও কোথাও একখানি চেয়ার খালি রাখা হয় এ বিশ্বাসে যে, রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিলাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে থাকেন। এ ধরনের আচরণ করে রাসূলের প্রতি একটা বড় কর্তব্য পালন করা হল বলে আত্মশ্লাঘা লাভ কিংবা এসবের মাধ্যমে নিজেদেরকে বড় মানের রাসূল প্রেমিক রূপে জাহির করে জনগণকে বোকা বানানো হচ্ছে। আবার অনেকে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর মান-মর্যাদা বাড়ানোর জন্য তাঁর ব্যাপারে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং বর্তমানেও তিনি সর্বত্র হাজির-নাজির আছেন। অনেক ক্ষেত্রে এ ধারণাও পোষণ করা হয় যে নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন এবং তিনি সকল স্থান থেকে মানুষের আহ্বান শুনতে পান এবং বিণিময়ে তাদের ফায়দা দিয়ে থাকেন। কিন্তু গায়েব জানার বিষয়টি যেহেতু কেবলমাত্র আল্লাহর বিশেষ গুণ তাই রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ধারণা প্রসূত এ ধরনের সকল আচরণ আসমা অস্ সিফাতের শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত।

খ) রাসূল (সঃ)-এর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে তাঁকে আল্লাহর অবতারে পরিণত করার মাধ্যমে শির্‌কঃ

রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র অবতার ছিলেন না বা তিনি অতিমানবও ছিলেন না, তবে তিনি সবচেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চমানের একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নূরের তৈরীও নন, ফেরেশতাও নন বা জ্বিন জাতিভুক্ত কোন সত্তাও নন। তিনি রক্ত-মাংশে গড়া একজন খাঁটি মানুষ এবং আদম সন্তান। এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য সকলের মত একজন মানুষ এবং আল্লাহ্‌র বান্দা, অন্যদের সাথে তাঁর পার্থক্য এখানে যে, তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র ওহি আসত। কিন্তু সমাজের কিছু মানুষ এমনকি একশ্রেণীর আলেম পর্যন্ত রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন যে, তিনি নূরের তৈরী। তবে যারা এ বিশ্বাস নিয়ে পথ চলছেন তারা আসলে প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন এবং সেই সাথে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বিকৃত করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। আবার সমাজে এমনও কিছু মানুষ রয়েছেন যারা রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের জন্য কথা-বার্তায় বা আচার-আচরণে এমন বাড়াবাড়ি করে ফেলেন যা তাঁকে প্রতিপালকের মর্যাদার স্তরে উন্নীত করে। এমনটি মনে হয় যে, আল্লাহ্‌ যেন মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রূপে ধরায় আবির্ভূত হয়েছেন বা অবতরণ করেছেন। সমাজে

প্রচলিত বিতর্কিত মিলাদ অনুষ্ঠানে যে সব শের বা কবিতার ছন্দ আওড়ান হয় তার মধ্যে অনেক শির্কী কথার সংমিশ্রণ রয়েছে, যেমন-

- **'যিনি খোদা রূপে আরসে সমাসীন ছিলেন, মদিনায় নেমে মোস্তফা হয়ে গেলেন।'**
- **'আরশে যিনি আহাদ ছিলেন, যমীনে তিনি আহমাদ হলেন।'**
- **'আহমাদের ঐ মিমের পর্দা উঠিয়ে দেরে মন, দেখবি সেথা বিরাজ করে আহাদ নিরঞ্জন।'**
- **'মোহাম্মদ যদিও খোদা নন, তবুও তিনি খোদা থেকে পৃথকও নন।'**

উল্লেখিত শেরগুলির মূল উর্দু ও ফার্সী ভাষায় লিখিত হলেও আমাদের সমাজে আনাচে-কানাচে অনেকেই এগুলি মুখস্ত করে মিলাদ আনুষ্ঠানে পাঠ করে থাকেন। এ ধরনের আচরণ হিন্দু-খ্রিস্টানদের মত অবতারবাদের ধারণা বৈ কিছু নয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে অবতারবাদের কোন স্থান নেই। তাই এজাতীয় বিশ্বাস এবং আচরণ শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

গ) রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **কে সিজ্‌দা দানের মাধ্যমে শির্কঃ**

সিজ্‌দা হল আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের চুড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। ঈমানের দাবীতে সিজ্‌দা প্রাপ্তির হকদার কেবলমাত্র এবং একমাত্র আল্লাহ। সৃষ্টিকর্তার স্থলে সৃষ্টির প্রতি সিজ্‌দা করা শির্ক। আল্লাহ মানুষকে কেবল তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমেও এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্টের দাবীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সিজদার সম্মান পাবার অধিকারী নন। কিন্ত আমাদের সমাজের কিছু অতি সংবেদনশীল মুসলিম আবেগতাড়িত হয়ে নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁর রওযা মোবারকে কদম্বুসি ও অন্যান্য বিদ'আতি কর্ম-কাণ্ড ঘটিয়ে থাকেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সিজ্‌দা পর্যন্ত করে থাকেন। কিন্তু রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় যখন কোন সাহাবী তাঁকে সিজ্‌দা করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি কঠোর ভায়ায় সেটা প্রত্যখ্যান করেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর রওযা মোবারকে সিজ্‌দা করা কি ভ্রান্ত আকিদার আচরণ হিসেবে শির্ক সংঘটিত করে না? প্রকৃতপক্ষে রওযা মোবারকে হোক আর দূর-দূরান্তে থেকেই হোক, রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করা উলূহ্যিয়াতের শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ) রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **-এর নামের জিকিরের মাধ্যমে শির্কঃ**

ইয়া-আল্লাহু! ইয়া-রাহমানু! ইয়া রাহিমু! ইত্যাদি সৃষ্টিকর্তার জাত এবং সিফাতী নাম সমূহ মুখে জপ করে যিক্‌রের মাধ্যমে তাঁর উপাসনা করা হয়। আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কার নাম জপে এ জাতীয় জিক্‌রি করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সমাজের অনেক মুসলিম আবেগতাড়িত হয়ে আল্লাহ্‌র নামের সাথে মিলিয়ে বা এককভাবে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামের জিকির করে থাকেন, যেমনঃ 'ইয়া আল্লাহু-ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌'! 'ইয়া রাহমাতুল্লিল আলামিন! নূরে রাসূল-নূরে খোদা! ইয়া নবী- ইয়া রাসূল, আল্লাহ্‌-রাসূল!' ইত্যাদি। আবার অনেক সময় এমনভাবে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌-রাসূলের মর্জিতে, আল্লাহ্‌-রাসূলের দোয়ায় বা আল্লাহ্‌-নবীর হেফাযতে ভাল আছি বা বেঁচে আছি বা চলে যাচ্ছে' ইত্যাদি। এ সকল আচার-আচরণ আমাদের সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এধরনের আচরণ এক প্রকারের জিকিরের মধ্যে শামিল এবং এর মাধ্যমে শির্ক সংঘটিত হয়ে থাকে।

ঙ) রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **-এর নাম, জাত ও মর্যদার ওসীলা গ্রহণ করে দোয়ার মাধ্যমে শিরকঃ**

আল্লাহ্ তা'আলা অমুখাপেক্ষী, তাই কারো ওসীলা গ্রহণ না করে সরাসরি আল্লাহ্র কাছে আবেদন পেশ করাই সমীচীন। আল্লাহ্র নামাবলী ও তাঁর গুণাবলীর ওসীলা ব্যতীত অন্যকোন জাতসত্তা বা বস্তুর ওসীলায় দোয়া করা জায়েয নহে; উপরন্তু সেটা আল্লাহ্ তা'আলার শান এবং তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন করার শামিল। তবে আমাদের সমাজে ওসীলা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। এক শ্রেণীর মুসলিম রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মর্যাদার ওসীলা করে আল্লাহ্র কাছে দোয়া কামনা করাকে বৈধ মনে করে থাকেন। এর যথার্থতা প্রমাণের স্বপক্ষের দলীল হিসেবে তারা একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওসীলায় হযরত আদম (আঃ) গুণাহ্ থেকে মাফ পেয়েছিলেন বলে যে হাদিসটির উদ্ধৃতি দেয়া হয়, সে হাদিসটি আসলে ভিত্তিহীন। হাদিসটি কোন সহীহ সনদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে সেটা জাল হাদিস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। আবার কোরআন থেকে যেটা প্রমাণিত হয় তা হলো, আল্লাহ্র তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে একটি দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন এবং সে দোয়া পাঠ করেই তিনি গুণাহ থেকে মুক্ত হয়েছেন। অতএব রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে ওসীলা করে দোয়া করার বৈধতা কোনভাবেই দলীলসিদ্ধ নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর ওফাতের পরেও তাঁর সাহাবীদের মাঝে তাঁর মর্যাদা ও তাঁর নাম নিয়ে এমন ওসীলার প্রচলন ছিলনা। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে রাসূলের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, তবে সেটা ওসীলা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নয়। এতদসত্ত্বেও মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ওসীলা ধরে দোয়া কামনা করে থাকে। আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত কিছু দরূদ ও দোয়া আছে, এর মধ্যে খতমে নারী বিশেষ উল্লেখযোগ্য; যার মধ্যে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ওসীলা করে আল্লাহ্র কাছে দোয়া চাওয়া হয়। রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ওসীলা গ্রহণের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করা হচ্ছে যে, তাঁর নাম নিলেই যাবতীয় সমস্যার জট খুলে যায়। আল্লাহ্র কাছে রাসূলের অতি উচ্চ মর্যাদা থাকার কারণে তাঁর নামের ওসীলায় আল্লাহ্ প্রভাবিত হয়ে মানুষের দোয়া কবুল করে থাকেন বলেই অনেকের বিশ্বাস। আবার তারা এও ভেবে নিয়েছেন যে আল্লাহ্র কাছে সাধারণ মানুষের দোয়া কবুল হবার যোগ্যতা রাখেনা। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাহ্মান ও রহিম। তিনি সকলের জন্য উদার, কেবল মানুষের চাইতে যা সময় লাগে কিন্তু তাঁর দিতে সময় লাগেনা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পরিচালনাগত কাজে কাউকে শরীক রাখেন না। তিনি কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি মানুষের দোয়া শ্রবণ করে থাকেন এবং বিনিময় দিয়ে থাকেন, সেখানে কোন নবী-রাসূল কিংবা অন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ যেহেতু অমুখাপেক্ষী, তাই তিনি কারো মর্যাদার দ্বারা প্রভাবিত হন না। উপরন্তু কারো মর্যাদার ওসীলা করে তাঁর কাছে কামনা করা বা কোন আর্জি পেশ করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র মর্যাদা হানি করারই নামান্তর। তাই আল্লাহ্ পাকের মর্যাদার দাবীতে, কোন ওসীলা বা মাধ্যম গ্রহণ না করে সরাসরি আল্লাহ্র কাছে কামনা করাই যুক্তিযুক্ত এবং শরিয়ত সম্মত। রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান জানানোর জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। সেক্ষেত্রে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর অনুগত্য ও যথাযথ আনুসরণ করা। কিন্তু নবী-রাসূল বা অন্য কোন নামের ওসীলা গ্রহণ করে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা বা কিছু কামনা করার বৈধতা কোরআন ও হাদিস দ্বারা সমর্থিত নয়। তাই যারা ওসীলায় বিশ্বাস করেন এবং বাস্তবে আচার-আচরণ দিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করেন, তারা প্রকৃতপক্ষে সীমালঙ্ঘনের অপরাধ করছেন এবং গর্হিত কাজে লিপ্ত হচ্ছেন।

চ) রাসূল (সঃ)-এর কাছে দোয়া ও শাফায়াত চাওয়ার মাধ্যমে শিরকঃ

দোয়া কামনা করার আঁধার এবং দোয়া কবুলের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকোন সত্তার কাছে দোয়া করার কোন শর'ই বৈধতা নেই। এতদসত্ত্বেও অজ্ঞতাবশতঃ মানুষ অনেকসময় সরাসরি রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে দোয়া করে থাকেন। তারা নবী-রাসূলদেরকে ত্রাণকর্তা ভেবে নিয়ে জাগতিক এবং পরকালীন কল্যাণার্জনের জন্য তাদের কাছে দোয়া যাঞ্চা করে থাকেন। কিন্তু বিষয়টি একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, দোয়া যেহেতু একটি ইবাদত, তাই দোয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘণ করা যাবেনা এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্তার কাছে দোয়া চাওয়া যাবেনা। আল্লাহ্র কাছে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যে মর্যাদা, সে মর্যাদার দাবীতে সর্বক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য এবং অনুসরণ সকল মুমিনের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু কোনভাবেই রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইবাদত করা জায়েয নহে। সেক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সরাসরি দোয়া চাওয়া হলে সেটা শির্কের অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রচলিত প্রথায় মুমিনদের দোয়ার মধ্যে শাফায়াতের দোয়াও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরকালে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক তাঁর উম্মতের জন্য শাফায়াতের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সর্বজনবিদিত। তবে শাফায়াতের মূল কথা হচ্ছে, রোজ কিয়ামতের দিন মানুষ যখন ঘোর বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশের আদেশ প্রাপ্ত হবে, তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি করুণার বশঃবর্তী হয়ে তাঁর প্রিয় রাসূলকে শাফায়াত করার অনুমতি প্রদান করবেন। রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন আল্লাহ্র কাছে সুপারিশের মাধ্যমে তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে অনেককে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে আনবেন। বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তাই সভাবতঃই রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফায়াত প্রাপ্তির নসীব হাসিল করাটা সকলের কাছে আকাঙ্খিত। তবে শাফায়াত সম্পর্কিত সকল বিষয়াদি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারে। মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে শাফায়াত কামনা করে সফলকাম হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্র দরবারে কারো শাফায়াত কবুল হওয়া তো দূরের কথা; আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কেউই তাঁর কাছে কারো পক্ষে সুপারিশের জন্য মুখ খোলার সাহসটুকুও পর্যন্ত পাবে না। প্রকৃতপক্ষে রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফায়াত প্রাপ্ত হয়ে ধন্য হবেন তাওহীদবাদী আল্লাহ্র মুখলিস বান্দাগণ; কিন্তু কাফির শ্রেণী এবং আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে এমন মুশরিকদের নসীবে এ শাফায়াত নেই। শাফায়াত কোন চাওয়ার বিষয় নয়; বরং নিজের যোগ্যতা দিয়ে তা অর্জন করতে হয়। তাই শাফায়াত প্রাপ্তির উপযুক্ত উপায় হচ্ছে, বিশুদ্ধ ঈমান নিয়ে রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা অর্থাৎ সুন্নাত মোতাবেক আমলে সলেহ বা নেক আমল করা এবং রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করা, বিশেষতঃ মুয়াযযিনের আযান শেষে আল্লাহ্র কাছে তাঁর জন্য বেহেশতের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ (ওসীলা) স্থানের জন্য দোয়া করা (কেননা রাসূল সঃ নিজেই বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি তাঁর জন্য ওসীলার দোয়া করলে ঐ ব্যক্তির জন্য তাঁর শাফায়াত অবধারিত হয়ে যায়)। অতএব, যারা এ যোগ্যতার মাপকাঠীতে উত্তীর্ণ হতে পারবে তারা হয় বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে অথবা প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফায়াত লাভে ধন্য হবে। কিন্তু তা না করে যদি হাজারবারও রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সরাসরি কিংবা তাঁর ওসীলা ধরে শাফায়াত কামনা করা হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না; উপরন্তু তা শির্কের মত কঠিন অপরাধের দায়ে দণ্ডিত হবার কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এতদসত্ত্বেও আমাদের সমাজের একশ্রেণীর মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ সরাসরি রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছেই তাঁর শাফায়াত কামনা করে দোয়া করে থাকেন।

এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এধরনের আচরণ শির্ক বৈ কিছু নয়, তাই সর্বাবস্থায় এ আচরণ পরিহারযোগ্য।

২। ফেরেশ্তাদের প্রতি আচরণগত শির্ক:

দৃষ্টির অন্তরালে থাকা ফেরেশ্তাকুল আল্লাহ্র এক অনুপম সৃষ্টি। অসংখ্য ফেরেশ্তা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন যারা সদা-সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকে এবং মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে তাঁর সকল আদেশ নির্দিধায় পালন করে যাচ্ছে। নিজেদের ইচ্ছাশক্তিতে পরিচালিত হবার কোন উপায় তাদের নেই। সকল নির্বাহী আদেশের মালিক একমাত্র আলাহ্ তা'আলা। ফেরেশতাগণ শুধুমাত্র তাঁর আদেশমত সকল বিষয় নির্ধারিত সময়ে সঠিকভাবে পালন করার দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা আলাহ্র একান্ড় অনুগত দাস মাত্র। কিন্তু প্রাচীন আরবের মুশরিকদের মাঝে ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা (নাউজুবিল্লাহ্) মনে করা হত এবং তাদের ওসীলা করে ইবাদত প্রচলিত ছিল। আমাদের বর্তমান সমাজেও এ ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত না থাকলেও কিছু কিছু মানুষের মধ্যে ফেরেশ্তাদেরকে কোন বিষয়ের মধ্যস্ততাকারী সাব্যস্ত করে দোয়া করার রেওয়াজ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ ধরনের বিশ্বাস ও আচরণ নিঃসন্দেহে শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

৩। জ্বিনদের প্রতি অমূলক ধারণা প্রসূত আচরণগত শির্ক:

মানব চক্ষুর অন্তরালে থাকা আর এক সৃষ্টির নাম জ্বিন জাতি। মানুষের মত তাদেরকেও রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্র সম্মুখে তাদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। জ্বিন জাতির মধ্যেও ভাল জ্বিন ও দুষ্ট জ্বিনের প্রকারভেদ রয়েছে। ঈমানদার জ্বিনদের দ্বারা মানুষের কোন ক্ষতি সাধিত হয়না। পক্ষান্তরে দুষ্ট জ্বিনেরা শয়তানের অনুসারী, মানুষের ঈমান ও আমল উভয়ই নষ্ট করার ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে নানাবিধ কৌশল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানব সমাজে যে সকল শির্কী ধ্যান-ধারণা, কর্ম ও অভ্যাসের প্রচলন রয়েছে, তা মূলত এই দুষ্ট জ্বিনের ষড়যন্ত্রেরই ফসল। যাকে যে কৌশল অবলম্বন করলে পথভ্রষ্ট করা যায়, তাকে সে কৌশলেই ঘায়েল করার চেষ্টা করে চলছে এই দুষ্ট জ্বিনেরা। শয়তানের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য মজবুত ঈমান, শরিয়তের জ্ঞান এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র সাহায্য প্রয়োজন। অপরিমিত জ্ঞান ও কমজোর ঈমানের কারনে মানুষ পদে পদে ধোঁকা খাচ্ছে এবং শয়তানের ফাঁদে আটকে গিয়ে বিপখগামী হয়ে যাচ্ছে এবং শির্কের মত বড় ধরনের আপরাধ করে ফেলছে। এ পর্যায়ে জ্বিনদের সম্পর্কে ধারণাপ্রসূত আচরণের মাধ্যমে মানুষ যে পন্থায় শির্ক করে থাকে তার কিছু বাস্তব উদাহরণ:

ক) জ্বিন ও জ্বিন-সাধকরা গায়েব জানে বলে বিশ্বাস রাখার শির্ক:

আমাদের সমাজের অনেক মুসলিম এ বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন যে, জ্বিনের মাধ্যমে জ্বিন-সাধকরা অদৃশ্য বা গায়েব সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। সে জন্য দেখা যায় কারো কিছু চুরি হলে বা কোন জিনিস হারিয়ে গেলে তারা জ্বিন-সাধকের স্মরণাপন্ন হয় এই আশায় যে, তারা জ্বিন হাজির করে এর মাধ্যমে নিখোঁজ বস্তুর সন্ধান দিতে পারে। এছাড়াও অনেকেই জ্বিনের মাধ্যমে অদৃশ্য বা গায়েবের খবর জানার উদ্দেশ্যে জ্বিন-সাধকের কাছে ধর্ণা দিয়ে থাকেন জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে। কিন্তু জ্বিন, মানুষ বা অন্যকোন সৃষ্টি যে গায়েব বা অদৃশ্যের খবর জানেনা, তা পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এজন্য রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও জ্বিনদের স্মরণাপন্ন হতে নিষেধ করেছেন। তাই আজও যারা

জ্বিন ও জ্বিন-সাধকেরা গায়েব জানে মনে করে তাদের কাছে গমন করে থাকেন তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে শির্‌কের অপরাধ করে চলছেন।

খ) জ্বিনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য জ্বিনকে ভেট দানের মাধ্যমে শির্‌কঃ

সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষকে জ্বিনের ভয় পাবার কথা। প্রকৃতপক্ষে জ্বিনরা মানুষকে ভয়ও পায়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের দুর্বলতার সুযোগে তারা সাহসী হয়ে ওঠে এবং ভয় প্রদর্শণ করে অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করে। জ্বিন-পরী ও দেও-দানবসহ যাবতীয় অনিষ্টকারীদের অনিষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য একজন মুমিনের করণীয় হচ্ছে, পাক-পবিত্র থাকার চেষ্টা করা ও তাদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। কেননা যে কোন বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে তাঁর একটি বিশেষ ধরনের উপাসনা। কিন্তু সমাজের বাস্তবতায় আমরা এর উল্টোটাই দেখে থাকি। জ্বিনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য মানুষ জ্বিনদের নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং বিভিন্ন তদবীরের মাধ্যমে এদের খুশী রাখার চেষ্টা করে। যেমনঃ গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ জ্বিনদের মাধ্যমে মাছ গায়েব হওয়ার আশংকায়, তা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে বিল বা জলাশয়ের মাছ ধরার জন্য পানি সেচের পূর্বে জলাশয়ের পাড়ে কোন গাছের নিচে 'কাল' নামক দুষ্ট জ্বিনকে শিরনী-পায়েস বা হালুয়া ভেট দিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে তারা জ্বিনের সন্তুষ্টি কামনা করেন এবং দুষ্ট জ্বিন কর্তৃক মাছ গায়েব হবার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ওর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু আমাদের জেনে নেয়া উচিত যে, এধরণের আচরণ শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

গ) জঙ্গলের জ্বিনের কাছে আশ্রয় চাওয়ার শির্‌কঃ

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবনে যারা কাঠ ও মধু সংগ্রহ করতে যান, তারা একটি বিশেষ রীতিতে জঙ্গলের কাঠ সর্দারনীর নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করে থাকেন। জঙ্গলে প্রবেশের পূর্বে তারা সর্দারনীকে এই বলে আহ্বান করে "মাগো! জঙ্গলে তোমার সন্তানেরা এসেছে, মাগো! আশা করি তোমার অন্তরে দয়া থাকবে। হে জঙ্গল সর্দারনী মা! তোমার সন্তানদের রক্ষা কর, তাদের তুমি ভুলে যেও না। জঙ্গলের অনিষ্টকারী বাঘ, সিংহ ও জ্বিনদের একপাশে রেখে দিও।" এধরনের আচরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ ছাড়া গায়রুল্লাহর উপর ভরসা করার কারনে শির্‌ক সংঘটিত হয়।

৪) মাজার বা কবর কেন্দ্রিক আচার-আচরণগত শির্‌কঃ

ইসলামে কবর বা মাজার যিয়ারত জায়েয করা হয়েছে। তবে সওয়াব হাসিলের লক্ষ্যে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার উপর নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্য সর্বসাকুল্যে দু'টি:

- মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা এবং
- মৃত্যুর কথা স্মরণ করে নিজের অন্তরে আল্লাভীতি জাগরিত করা।

এ দু'টি উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারতের অনুমতি নেই। তবুও একশ্রেণীর মানুষ ভ্রান্ত আকিদার বশবর্তী হয়ে যিয়ারতের মূখ্য বা আসল উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে তৃতীয় আর একটি উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়ে তা হাসিলের প্রচেষ্টা করে থাকে। তারা কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির কাছে বা মৃত ব্যক্তির ওসীলা ধরে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে– যার কোন বৈধতা শরীয়তে নেই। এটি একটি বিদ'আতী কর্ম

এবং শির্‌কও বটে। এ ছাড়াও মাজারে মানত করা, ফুল দেওয়া, ওরশ করা ইত্যাদি সহ আরো অনেক প্রকার বিদ'আতী আচরণ মাজারকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়– যা মাজার পূজার শামিল।

অজ্ঞতাবশতঃ কেউ কেউ মাজারে গিয়ে সরাসরি কবরস্থ পীর-অলির কাছে দোয়া চায়; অনেকে আবার মৃতব্যক্তির কাছে দোয়া চান না বটে, তবে আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে তারা কবরে বা মাজারে চলে যায়। পীর-অলিগণের কবরে, তাদের স্মৃতি বিজরিত স্থানে কিংবা তাদের জন্ম ও মৃত্যু দিনে দোয়া করার জন্য তারা বিশেষভাবে আগ্রহী। এভাবে দোয়া করলে আল্লাহ্‌ কবুল করবেন বলে তারা মনে করে। বিশেষত অনেক মুসলমানের বদ্ধমূল ধারণা যে, বুজুর্গগণের মাজারে গিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলে দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। তাদের এই চিন্তা ও কর্ম খেলাফে সুন্নাত, জঘন্য বিদ'আত ও শির্‌কের মধ্যে নিপতিত হওয়ার অন্যতম পথ। এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণার ফলে মাজারগুলি আজ মুসলিমদের ঈমান হরণের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

আমাদের সমাজে অধিকাংশ শির্‌ক সংঘটিত হয় মাজার বা কবরকে কেন্দ্র করে। পীর, অলি, আউলিয়া তথা বুজুর্গানে দ্বীন, প্রমুখের মৃত্যুর পরে তাদের সমাধিতে নানা প্রকার স্থাপনা তৈরী করে কবরকে 'মাজার' খেতাব দিয়ে ওরস পালন সহ বিভিন্ন প্রকার বিদআতি কর্ম-কাণ্ড সমাজে প্রচলিত রয়েছে। সমাজের সাধারণ মানুষের এসকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি দুর্বলতা ও অন্ধবিশ্বাসের কারণে মৃত্যুর পরেও তাদেরকে যথাযথ মর্যাদায় স্মরণ করার সিলসিলা চলমান রয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগের অনেক পরে মানুষের মাঝে বুজুর্গগণের কবরের নিকট দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে নিজের হাজত প্রয়োজন প্রার্থণার রীতি ক্রমান্বয়ে দেখা যেতে থাকে। ইসলামী শিক্ষার অভাব, কুসংস্কার ও জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস ছিল এর কারণ। জনশ্রুতি আছে– অমুক বুজুর্গের কবরের কাছে দোয়া করলে তা কবুল হয়। ওমনি মানুষ ছুটলেন সেখানে দোয়া করতে। এভাবে আমাদের দেশে যায়গায় যায়গায় গজিয়ে উঠেছে অগনিত মাজার। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক এ সব মাজারে নজর নিয়ত পেশ করছে। সরলমনা অনেক আলেম ও নেককার মানুষও এ সকল বিষয়ে জড়িয়ে গেছেন। আমাদের সমাজের অসংখ্য মুসলিম বিপদ-আপদ, রোগ-ব্যাধি, মামলা-মোকদ্দমা, ফসল, সন্তান, বিবাহ ইত্যাদি জাগতিক সমস্যাদির জন্য দেশের অগনিত মাজারে গিয়ে মাজারে শায়িত মৃতব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করেন। তাদের নিকট সমস্যা মিটানোর আব্দার করেন। তারা যেন খুশী হয়ে সমস্যা মিটানোর ব্যবস্থা করেন এই আশায় প্রার্থণার পূর্বে সিজদা, ক্রন্দন, নজর, মানত, ভেট, উৎসর্গ, টাকা-পয়সা, ইত্যাদি পেশ করা হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মাজার কেন্দ্রীক এ জাতীয় আচরণ মূর্তি পূজার ন্যায় মাজার পূজার শামিল এবং শির্‌ক।

মুসলিমগণ মাজারে গিয়ে অনেক ধরনের শির্‌কী আচরণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। যেমন কোন অলি, কামেল, পীর ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে ডাকা কিংবা মৃত ব্যক্তির কবরের নিকটে গিয়ে কিছু চাওয়া, আকাংখা করা ইত্যাদি আচরণ শর'ই দৃষ্টিতে প্রকাশ্য শিরক। ব্যক্তি হয়ত আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্তকে স্বীকার করে কিন্তু তা সত্ত্বেও পীর, অলি, গাউস, কুতুব ইত্যাদিকে আল্লাহ্‌র প্রতিভূ মেনে তাদের নিকট যাবতীয় চাওয়া পাওয়া পেশ করে। রোগ মুক্তির জন্য, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য, সন্তান কামনায়, বিয়ে-শাদী, চাকুরীর উন্নতি ইত্যাদি দুনিয়াবী বিভিন্ন কারণে তাদের কাছেই যাবতীয় নিবেদন পেশ করে থাকে। তাদের এই অনুভূতি নেই যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করছে। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এক শ্রেণীর ভণ্ড পীর। তারা কেউ কেউ নিজেই আল্লাহ্‌র আসনে সমাসীন (নাউযুবিল্লাহ) এবং তাদের রয়েছে অনেক স্বার্থন্বেষী অন্ধভক্ত। তাদের প্রচেষ্টায় প্রতিবছর মহা সমারোহে চলছে ইছালে সওয়াবের মাহফিল। সেখানে গরু, খাসী ও মুরগীর সঙ্গে চলছে হাজার হাজার টাকার দক্ষিণা। আবার অনেক পীরের মাজারে

বড় বড় গেট বানিয়ে মহাপবিত্র ওরস শরীফের আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে। এর সাথে রয়েছে বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতা এমনকি সরকারী অনুদানও। যারা সারা জীবন নামায রোযার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, হালাল হারামের ধার ধারে না, তারা ধারণা করে যে, পীরের দরবারে কিছু দান করার মাধ্যমে তাদের পাপরাশি মুছে যাবে। ভাবখানা এই যে, পীরের দোয়া পেলে তারা আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমার যোগ্য হয়ে উঠবে কিংবা পীরের সুপারিশের মাধ্যমে তারা পুলসিরাতের সেই তরণী পার হয়ে যাবে। এ যে কত বড় মূর্খতা তারা যদি তা বুঝতো তাহলে তারা এ জাতীয় বিভ্রান্তিতে নিপতিত হতনা। এভাবে আমরা আমাদের অজান্তে যে কত প্রকারের শির্‌ক করে চলেছি তার কোন ইয়াত্তা নেই। আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোক যখন অশিক্ষিত তখন তারা অজ্ঞতাবশতঃ এ সব মাজারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর কিছু লোক সমাজে আছে যারা তাদেরকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে এসব পথে পরিচালিত করে। কিন্তু আফসোস হয় ঐ সমস্ত শিক্ষিত লোকদের জন্য যারা বড় বড় ডিগ্রী ধারী হয়েও ইসলামী জ্ঞান আহরণ না করার ফলে এ জাতীয় গুণাহের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছেন। তারা একদিকে সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার, মদ্যপান, কালোবাজারী ইত্যাদি পাপাচারে লিপ্ত, অথচ তাদের দুর্বল মুহূর্তে ঐ সমস্ত পীরের মাজারে যেয়ে হাজার হাজার টাকার নজর নিয়াজ দিয়ে এসে ভাবে যে তার সমস্ত পাপরাশি হয়ত এর মাধ্যমে মুছে সাফ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা যে একদিকের পাপ মোচন করতে গিয়ে শির্‌কের মত অন্য আর একটি জঘন্য পাপের আঞ্জাম দিচ্ছেন সেদিকে তাদের হুঁশ নেই মোটেই।

আমাদের নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা এই যে, আমরা আল্লাহ্‌র সাথে আর কাউকে ডাকবো না। অথচ আমাদের চারিদিকে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা মাজারের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাই ঈমান থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুসলিমগণ মাজারস্থ অলিদের ডাকতেই ব্যস্ত সারাক্ষণ। আল্লাহ্‌কে ডাকার বদলে তারা এদেরকেই ডাকতে বেশী আগ্রহী। তাই বিপদে পড়লেই তারা মৃত অলীদের কবরের কাছে চলে যান এবং এদের স্মরণাপন্ন হন। মৃত অলীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে আবার কখনও বা সরাসরি অলীর কাছেই প্রয়োজন পুরা করার আবেদন করে থাকেন তারা। এভাবে মাজারকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শিরকী কর্ম। গোলাপ শাহের মাজার, হাইকোর্ট মাজার, শাহ জালালের মাজার, লেচু শাহের মাজার, বায়জীদ বোস্তামীর মাজার, খান জাহান আলীর মাজারসহ সারা দেশের হাজারো মাজারের অবস্থা দেখলে আমরা অস্থির চিন্তায় ভুগি। এ সকল মাজারে দেখা যায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হাজারো মানুষের ভীড়। মাজারকে কেন্দ্র করে নজর, মানত, উৎসর্গ, দোয়া-মোনাজাত এবং কান্নাকাটিসহ নানা প্রকার ইবাদত মূলক আচরণে নিবিষ্ট দেখতে পাওয়া যায় লোকদেরকে। কখনও বা মাজারের সামনে সিজদারত থাকতেও দেখা যায় অনেককে। এ সব দৃশ্য দেখলে ভয়ে গা শিউরে ওঠার কথা। আল্লাহ্‌র নির্দেশ কি! আর আমরা করছি বা কি?

বিষয়টি দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়ে গেছে যে, তারা বড় কোন কাজের প্রারাম্ভে কোন না কোন মাজার যিয়ারত করে সেই কাজটা শুরু করে। বিশেষ করে নির্বাচণী প্রচার-প্রচারণা শুরুর আগে সিলেটের শাহ জালাল (রহঃ) বা খান জাহান আলী (রহঃ) অথবা আটরশী পীরের দরবার কিংবা অন্য কোন মাজারে যায় এবং সেখান থেকে দোয়া ও আশীষ নিয়ে কাজ শুরু করে। তারা মনে করে যে, এ সকল জায়গায় গিয়ে তাদের মাজারে ফাতেহা পাঠ করলে মাজারস্থ মৃত অলী তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করবে। হায়রে মানবকুল! একটি বারের জন্যও ভেবে দেখল না যে, ঐ সব অলি অন্যদের উপকার করা তো দূরের কথা- তারা তো এখন জীবিতদের দোয়ার কাঙ্গাল। বস্তুতঃ তাদের পক্ষে এখন কোন প্রকারের আমল করার সুযোগই আর অবশিষ্ট নেই; চাই তা নিজের জন্য হোক

বা অন্যের জন্য। তাই দুনিয়ার কারো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। মানুষের এ জাতীয় আচরণ এক প্রকারের ইবাদতের শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষকে এ জাতীয় শির্ক সম্পর্কে সচেতন করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। তবে দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের দেশের কতিপয় টিভি চ্যানেল আবার এদের বিরোধীতা করতেও সচেষ্ট রয়েছে। তারা কিসের স্বার্থে শির্ক ও বিদ'আতকে জিয়িয়ে রাখতে সচেষ্ট রয়েছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে আসুন বিভ্রান্ত না হয়ে আমরা কোরআন ও সহীহ হাদিসের চর্চার মাধ্যমে শির্ককে জানার চেষ্টা করি এবং শুদ্ধ আমলের দ্বারা জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করি এবং পরকালীন কল্যাণার্জনে সচেষ্ট হই।

ভক্তি-শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের মাত্রা সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই তারা সীমালঙ্ঘন করে শির্কের মত কঠিন পাপে জড়িয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে আমাদের সমাজের মুসলিমদের মধ্যে মাজার তথা মাজারবাসীদের প্রতি বিশ্বাসগত, পরিচালনাগত, উপাসনাগত এবং অভ্যাসগত শির্কের যে প্রচলন রয়েছে তার একটি সামগ্রিক বাস্তব চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হলো:

ক) মাজারস্থ আল্লাহ্‌র অলিগণ গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করার মাধ্যমে শির্ক:

আমাদের সমাজে পীরভক্তগণ সহ অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মাঝে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা আল্লাহ্‌র অলিগণ তাদের রূহানী শক্তিবলে জানতে পারেন। ভক্তির আতিশয্যে কোন কোন পীরকে আল্লাহ্‌র যাবতীয় গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত করতেও দেখা যায়। তারা বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন যে, মাজারস্থ আল্লাহ্‌র অলিগণ মানুষের আহ্বান শ্রবণ করে থাকেন এবং বিনিময়ে ফায়দা দিয়ে থাকেন। এ সব ধারণার ভিত্তিতেই বিপদের সময়ে হোক আর সাধারণ অবস্থায়-ই হোক সর্বাবস্থায় অন্ধ-ভক্তরা তাদের অলিদেরকে 'ইয়া গাউস' 'ইয়া খাজা' বা 'ইয়া খানজাহান' এসব নাম যপে তাদের নিজ নিজ অলিদের আহ্বান করে থাকেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ সকল বিশ্বাসগত আচরণ শির্কের অন্তর্ভুক্ত, কেননা একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না এবং কাউকে সাহায্য করার মালিকও নয়। মাযার বা কবরবাসী মানুষের আহ্বান শুনতেও পারে না বা ফায়দাও দিতে পারে না; এ বিষয়ের উপর কোরআন ও হাদিসের দলিল আমাদের মূল পর্বের আলোচনায় পেশ করা হয়েছে।

খ) মাজারস্থ পীর-অলিগণের মধ্যে কেউ কেউ পৃথিবী পরিচালনার কাজে ন্যস্ত বলে বিশ্বাস করার শিরক:

আমাদের দেশে ভ্রান্ত তরিকত ও মারেফাত পন্থীদের মাঝে এমন একটি অদ্ভুত বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর অলিগণের মধ্যে থেকে কতিপয় পূণ্যবানদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন কার্জ পরিচালনার জন্য গাউস, কুতুব ও আব্দাল ইত্যাদি পদে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। সরকারী ক্ষমতা লাভ, প্রশাসনিক পদের নিয়োগ, বদলী বা অপসরণ তাদেরই ইশারায় নাকি হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের হাতে কাউকে কিছু দেয়া বা না দেয়া, কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষমতা দান করে থাকেন। এমনকি তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী-ই নাকি আদালতের যাবতীয় রায় সমূহ জারী হয়ে থাকে। এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই বড় পীর আব্দুল কাদির জীলানীকে 'গাউসে আযম বা ত্রাণকর্তা' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এ নামেই তার ভক্তগণ তাকে স্মরণ করে থাকে। এ ধারণার ভিত্তিতেই অন্যান্য পীর-ভক্তরা তাদের পীর সাহেবদের যমানার 'কুতুব' খেতাবে ভুষিত করে থাকেন। এ ধারণার ভিত্তিতেই আমাদের দেশে চট্টগ্রামের

আহমাদুল্লাহ্ মাউজভাণ্ডারী চরম ভক্তদের মাঝে 'ভাণ্ডারী' হিসেবে বিবেচিত হয়ে আছেন। এভাবেই এসকল বিশ্বাস বা ধারণা প্রসূত আচরণের মাধ্যমে হিন্দুদের অনুসৃত অবতারবাদের মত মুসলিম ভক্তগণও পীর-অলি সহ বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ মনিষীদেরকে আল্লাহ্র অবতার বানিয়ে নিয়েছে। তবে মূল কথা হচ্ছে, এ ধরনের সকল বিশ্বাসই ভ্রান্ত এবং ইসলামে অবতারবাদের কোন জায়গা নেই। আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নতে এসবের কোন অস্তিত্ব নেই। এ জাতীয় বিশ্বাসের মধ্যে সীমালঙ্ঘনের কারণে নিশ্চিতভাবে শির্কের গন্ধ রয়েছে এবং এর মধ্যেই চিরস্থায়ী ধ্বংস ও শাস্তি অনিবার্য হয়ে রয়েছে।

গ) মাজারস্থ অলির নিকট থেকে কল্যাণ লাভের আশা করার মাধ্যমে শির্কঃ

মুসলিমদের জন্য বিনা সফরে পীর, অলি, দরবেশ ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকল মুসলিমের কবর যিয়ারতের অনুমতি রয়েছে। তবে কবর যিয়ারতের মাধ্যমে সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে সফর করার কোন বৈধতা নেই। শর'ই দৃষ্টিতে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবরস্থ ব্যক্তির জন্য মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা এবং নিজের শেষ পরিণতির কথা চিন্তা করে পরকালকে স্মরণ করা। কিন্তু সামাজিক বাস্তবতায় পীর-আউলিয়াদের ভক্তদের অবস্থা বিচার করলে দেখা যায়, তারা কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করে দিয়েছে। তারা মাজারবাসীর প্রয়োজন পুরা করার পরিবর্তে মাজারকে নিজেদের প্রয়োজন পুরা করার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। তারা মনে করে যে, পীর-অলিগণ আল্লাহ্র অত্যন্ত প্রিয়ভাজন বলে ইন্তেকালের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলে যান এবং তাদের রূহানী শক্তি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ফলে পৃথিবীর যে কোন মানুষের আহ্বান তারা শুনতে পান এবং কল্যাণ দিতে পারেন এবং যে কোন অকল্যাণ দূর করতে পারেন। এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই ভক্তগণ তাদের কাছে পার্থিব ও পরকালীন যাবতীয় প্রয়োজনাদি নিয়ে আগমন করেন। কিন্তু মানুষের জীবনে যে সকল প্রয়োজন রয়েছে যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কেউ পূরণ করতে পারে না। বিশেষত সে সব প্রয়োজনের মধ্যে সন্তান দান, রোগমুক্তি, বালা-মুছিবত অপসারণ, রিযিক দান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ জাতীয় বিষয়াদি প্রাপ্তির জন্য আনুষঙ্গিক ও উপযুক্ত কর্ম করে তা আল্লাহ্র নিকটেই কামনা করতে হবে। কিন্তু সমাজের বাস্তবতায় দেখা যায় যে মানুষ আল্লাহ্র পরিবর্তে মাজারবাসী পীর-অলি নির্ভর হয়ে পরেছে। রোগীরা রোগমুক্তির জন্য, সন্তানহীনরা সন্তান লাভের জন্য, বিপন্নরা বিপদ মুক্তির জন্য, চাকুরীহীনরা চাকুরী লাভের আশায়, অপরাধীরা ক্ষমা প্রাপ্তির আশায় এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীরা নির্বাচনে জয়ী হবার আশায় সেখানে গমন করে থাকেন। তাদের মাযারে গমনের পার্থিব উদ্দেশ্য বিভিন্ন রকমের হলেও সকলের পরকালীন উদ্দেশ্য অভিন্ন আর তা হল মাজারবাসীর শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি লাভ। মনকামনা পুরো করার জন্য ভক্তরা দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে থাকেন মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে। এ ধরনের মাজার সমূহের মধ্যে আজমীর শরীফের খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রহঃ)-এর মাজার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভক্তদের ধারণা যে, যিনি যে উদ্দেশ্যে তাকে আহ্বান করেন, তাদের সকলের জন্যই তার দু'হাত প্রসারিত রয়েছে। তাদের এ বিশ্বাসকে তারা শ্লোগানে পরিণত করে নিয়েছে "কেউ ফেরে না খালি হাতে, খাজা তোমার দরবার হতে'। এভাবে আরো অনেক ছন্দ ও গানের মাধ্যমে তার গুণকীর্তন প্রচলিত রয়েছে। যদি প্রশ্ন তোলা যায়, মাজারবাসী অলিগণ কি সত্যিই কল্যাণ দিতে পারেন? তবে অবশ্যই এর উত্তর হবে, না। কেননা কোরআন ও হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত রয়েছে যে, মানুষ সে যেই হোকনা কেন, মুত্যুর পরে তার সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বিদেহী আত্মা দুনিয়াবাসীর দোয়ার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির এমন কোন আমল নেই যা দ্বারা সে নিজে বা অপর কেউ উপকৃত হতে পারে। মাজার কেন্দ্রীক এ ধরনের আচরণ প্রকাশ্য শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ের উপর কোরআনের দলিল প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় পেশ করা হয়েছে। এরপরেও যারা

মাজারবাসীর কাছ থেকে কল্যাণ লাভের আশায় তাদেরকে আহ্বান করে থাকেন তাদের অবস্থাও যে প্রাচীন আরবের মুশরিকদের অনুরূপ তা বলাই বাহুল্য। সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্য করা গেছে যে, একশ্রেণীর আলেম মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ সফর করে মাযার কেন্দ্রীক বিভিন্ন বিদয়াতী কর্ম-কাণ্ডের সচিত্র প্রতিবেদন তৈরা করে তা একটি বিশেষ টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে সম্প্রচার করে সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় রত রয়েছেন। মাজারে অবস্থান করা, মাজারে সালাত আদায় করা, কবর স্পর্শ করে চুম্বন করা, কবর প্রদক্ষিণ করা, কবরের কাছে বিনয়াবনত হয়ে কবরকে সম্মান করা সহ বিভিন্ন প্রকার বিদ'য়াতি কর্ম-কাণ্ড তারা নিজেরা যেমন করে আসছেন তেমনি মিডিয়াতে প্রচার করে অন্যদেরকেও তা করার জন্য উৎসাহিত করে আসছেন। মাজার কেন্দ্রিক সকল আচার-আচরণের বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যেই তারা মূলত এধরনের প্রচারণার সাথে লিপ্ত রয়েছেন। তবে এ ধরনের আচরণ যে বিদ'য়াত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, সে সম্পর্কে তারা বে-খবর এবং উদাসীন রয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ ধরনের মাজার কেন্দ্রিক যাবতীয় আচরণ প্রকারন্তে কবর পুজার-ই শামিল এবং যারা এ ধরনের প্রচার-প্রচারণার সাথে সংযুক্ত রয়েছেন তারা যে মূলত শির্ককে উৎসাহিত করে যাচ্ছেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করাই যুক্তিযুক্ত এবং সকলের জন্য সমীচীন।

ঘ) অলিদের মাজারের মাটি, গাছ, পুকুরের পানি ও জীব-জন্তুর দ্বারা উপকার বা অনিষ্ট সাধিত হবার বিশ্বাসের মাধ্যমে শির্কঃ

মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এ পৃথিবীর অনেক কিছুই মানুষের জন্য উপকারী হতে পারে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কোন অলির মাজারের মাটি, গাছ, পুকুরের পানি, কচ্ছপ, কুমির, মাছ, কবুতর ইত্যাদিকে অলির সাথে সংশ্লিষ্টতার জন্য অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং বিশেষ উপকারী বলে বিবেচনা করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তা সত্বেও অনেক মুসলিমদের মাঝে এগুলি উপকারী হওয়ার ধারণা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল রয়েছে। সে কারণে তাদেরকে অলিগণের কবরের মাটি, পুকুরের পানি ইত্যাদি সযতনে সংগ্রহ করে তা থেকে ফায়দা লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে দেখা যায়। পুকুরের পানি ময়লা হলেও তা যমযমের পানির মত আগ্রহের সাথে পান করে থাকে। রোগ-বালাই থেকে মুক্ত থাকার জন্য বা আরোগ্য লাভের মানত পূরা করার জন্য মাজারের পুকুরে গোসলের নিয়তে ছোট-বড় সকলকেই দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে ছুটে আসতে দেখা যায়। রোগ মুক্তি বা সন্তান লাভের আশায় মাযারস্থ গাছে তারকাঁটা মারতে ও লাল কাপড় বেঁধে রাখতে দেখা যায় অনেককে। আবার অনিষ্টের ভয়ে মাযারের কবুতর ও মাছ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে দেখা যায়। অনিষ্ট হবার ভয়ে মাজারের গাছের ডাল কাটা ও পাতা ছেঁড়া থেকে বিরত থাকতে দেখা যায় । প্রকৃতপক্ষে যারা এভাবে আউলিয়াদের নিদর্শনকে রোগমুক্তির ও বিপদের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিয়েছে তারা যেন প্রাচীন আরবের মুশরিকদের দেবতা কেন্দ্রিক আচরণের অনুরূপ আচরণ দ্বারা নিজেদেরকে সর্বনাশা শিরকের মধ্যে জড়িয়ে ফেলছে।

ঙ) কবরকে সিজদা করা ও কবরমুখী হয়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে শির্কঃ

সিজ্‌দার মাধ্যমে যে ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়, সে সম্মান লাভের হকদার একমাত্র মহান আল্লাহ্‌। কোন মানুষকে এভাবে সিজ্‌দার মাধ্যমে সম্মান করা হলে তা একটি প্রত্যক্ষ শির্কী কর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি পীর-অলীর ভক্তগণ মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করে এক পর্যায়ে তাদের কবরকে কেন্দ্র করে সিজদা করে থাকেন। আবার অনেকেই অলির কবরকে কিবলার

মত গণ্য করে তাজিমের সাথে সে দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে থাকেন। এ জাতীয় সকল আচরণ প্রকাশ্য শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

চ) কবরের চারপার্শে ত্বাওয়াফ করার মাধ্যমে শির্কঃ

ত্বাওয়াফের উপাসনাটি কাবা শরীফের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারনে তা কোন মাজার তো দূরের কথা, অন্য কোন মসজিদকে কেন্দ্র করে করারও কোন অনুমতি শরিয়তে নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক আউলিয়ার মাজারে ভক্তগণকে ত্বাওয়াফের মত করে অলির কবরকে প্রদক্ষিণ করতে দেখা যায়। এ ধরনের কবর কেন্দ্রিক প্রদক্ষিণ সুস্পষ্ট শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

ছ) মাজারে এ'ত্বেকাফের মাধ্যমে শির্কঃ

এ'ত্বেকাফ একটি বিশেষ ধরনের উপাসনা যা পুরুষগণ মসজিদে অবস্থান করার মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকেন। জাহিলিয়াতের যুগে আরবের মুশরিকগণ তাদের দেবতার পাশে অবস্থান করত ওদের খুশী করার জন্য। এ যুগের মুসলিমদের মধ্যেও মুশরিকদের অনুরূপ আচরণ দ্বারা মাযারে অবস্থান গ্রহণের বাস্তবতা পরিদৃষ্ট হয়। মাজারের উদ্দেশ্যে সফর করার বৈধতাই যখন প্রমাণিত নয়, সেক্ষেত্রে মাযারে সম্মান সূচক অবস্থান কি করে বৈধ হতে পারে? কেউ যদি মাজারে অবস্থানের মাধ্যমে কবরস্থ অলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল করতে চায়, তাহলে তার সে অবস্থান শির্কী কর্ম হিসেবে গণ্য হবে।

জ) মাজারে মানত এবং পশু উৎসর্গ করার মাধ্যমে শির্কঃ

মানত বৈধ হবার জন্য তা যেমন কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই করতে হবে, তেমনি তা প্রদানের ক্ষেত্রেও শির্ক সংঘটিত হবার সম্ভাব্য স্থান যেমনঃ কোন মাজার, কবর বা ওরস পালনের স্থান থেকে পবিত্র হতে হবে। উপরন্তু শরী'য়া পরিপন্থী কোন বিষয়ের জন্য মানত বৈধ নয়। আমাদের সমাজে মানত একটি অতি সমাদৃত ইবাদতের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। বালা-মুছিবত, রোগ-বালাই, শোক-তাপ ইত্যাদি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এবং কল্যাণ হাসিলের জন্য মানুষ টাকা-পয়সা, জীব-জন্তু, শিরনী-পায়েস ও মিষ্টান্ন থেকে শুরু করে নানাপ্রকার সামগ্রী মানত করে থাকে বিভিন্ন দরগাহে বা মাজারে। তারা হাঁস-মুরগী, কবুতর থেকে শুরু করে গরু-ছাগল পর্যন্ত মাজারের নামে মানত করে এবং তা মাজারস্থ পীর-অলির নামে উৎসর্গ করতে দেখা যায়। আবার কখনও কখনও মাযারস্ত পুকুরের পানিতে গোসল সহ নানা প্রকার ইবাদতের মানত করে তা পুরো করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মাজারের উদ্দেশ্যে সফর করে ছুটে আসতে দেখা যায়। এ ধরনের মানতের মধ্যে মানতকারীর প্রধানতঃ দু'ধরনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকতে পারে। প্রথমতঃ মাজারে মানত করে সংশ্লিষ্ট অলির নিকট কামনা করা এবং দ্বিতীয়তঃ অলির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে কামনা করা। এ উভয় প্রকার আচরণই শরিয়তে অবৈধ কর্ম হিসেবে বিবেচিত এবং নিঃসন্দেহে শির্ক সংঘটিত হবার কারণ। মৃত অলির কাছে সরাসরি কামনা করা বা তাদেরকে আল্লাহ্‌ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যস্ততাকারী নির্ধারণ করার কোন দলিল কোরআন ও হাদিসে নেই। এটি মূর্খ ও ভণ্ডপীর এবং অন্ধভক্তগণের একটি সাজান কল্পকথা বৈ কিছু নয়।

ঝ) মাজারস্থ অলিদের থেকে গোপন ভয় পোষণ করার শির্কঃ

আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা অলি-আউলিয়া ও দরবেশ শ্রেণীর বুজুর্গ ব্যক্তিদের সম্পর্কে অন্তরে একপ্রকার গোপন ভয় পোষণ করে থাকেন। তাদের ধারণা যে মাযারে কোন প্রকার বেয়াদবি করলে বা মাযারের প্রতি সম্মান প্রদশনে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট অলি বা দরবেশ রাগান্বিত হয়ে তার অনিষ্ট সাধন করতে পারেন। তাই মাজারকে সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে লোকদের বিভিন্ন প্রকার আচার-আচরণে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। যিয়ারতকারীগণ কবরকে সামনে রেখে পিছু হটে বেরিয়ে আসার মাধ্যমে সম্মান জানায়; গাড়ী চালকেরা মাযারের কাছাকাছি গাড়ীর গতি কমিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সমীহের সাথে মাযার অতিক্রমের মাধ্যমে মাযারকে সম্মান জানায়; নদী তীরস্থ মাযার অতিক্রমের সময় লঞ্চ বা ষ্টীমারের গতি কমিয়ে দেওয়া হয়; এজাতীয় সকল আচরণ মাজারকে তাযীম করা এবং মাজারবাসীর থেকে অনিষ্ট সাধনের গোপন ভয় পোষণ করার কারণেই করা হয়ে থাকে। এছাড়াও অনেকে মাজারের নিকটস্থ গাছের ডাল কাটতে ও পাতা ছিঁড়তে অন্তরে গোপন ভয় অনুভব করে। তবে এ জাতীয় আচরণ আরবের তৎকালীন মুশরিকদের মধ্যে তাদের দেবতাদের সম্পর্কে গোপন ভয় পোষণ করার আচরণের অনুরূপ এবং তা গোপন ভয়ের শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

ঞ) মাজারস্থ পীর-অলিদেরকে ওসীলা নির্ধারণের মাধ্যমে শির্কঃ

সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ্‌র নামে কোন মাজারস্থ পীর-আউলিয়ার নিকট বা তাদের রূহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করাকে জায়েয মনে করা হয়। মনে করা হয় যে তাদেরকে শুধু ওসীলা হিসেবেই গ্রহণ করা হচ্ছে, আর এরূপ ওসীলা নির্ধারণে কোন দোষ নেই। পীর পূজারী লোকেরা মনে করে যে, পীর-আউলিয়ারা আল্লাহ্‌র অত্যন্ত প্রিয় বান্দা বলে তাদের দোয়া ও সুপারিশ আল্লাহ্‌র দরবারে অতি সত্বর গৃহীত হয়ে থাকে। এ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে তাদের রূহে অসীম শক্তি ও বিশালতার সৃষ্টি হয়, তাই তারা মানুষের আবেদন-নিবেদন শ্রবণ করে থাকেন এবং সুপারিশের মাধ্যমে কল্যাণ বয়ে আনতে পারেন। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষকে পীর-অলিদের মাযারে গিয়ে বলতে শোনা যায়, "হে কবরস্থ পূণ্যাত্মা! তোমরা আমাদের জন্য আমাদের গরিবী দূর করার, প্রাচুর্য দানের, সন্তান দানের, রোগ নিরাময়ের এবং উভয় জগতে আমাদের কল্যাণ হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া কর, কেননা তোমরা নেক আমলকারী আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা এবং তোমাদের দোয়া আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হয়।" এভাবে পীর-আউলিয়াদের ওসীলায় দোয়া করার প্রচলন আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত একটি রীতি। কিন্তু এটা বাস্তবিকই একটা ধোঁকা, কেননা কোরআন ও হাদিসে এর সপক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায়না। কোন কিছু প্রার্থনা করার সময় যদিও আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া হয়, তবুও দোয়ার সময় গায়রুল্লাহ্‌র নাম নেয়া হলে তা মূলত গায়রুলালাহ্‌র কাছে চাওয়া হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা এর মাধ্যমে দোয়াকারীর মনে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও বিশালতা সম্পর্কে সংশয় থাকার বিষয়টি পরিস্কার হয়ে উঠে। তাই কেউ যদি মনে করে যে আল্লাহ্‌ ও বান্দার মাঝে এধরনের ওসীলা ধরা ও সুপারিশ করার প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে সে তো আল্লাহ্‌ সম্পর্কে খুব জঘন্য ও খারাপ ধারণা পোষণ করল এবং গায়রুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও গুণাবলীর শরীক করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেল। পীর-আউলিয়াদের ওসীলা নির্ধারণ করে তাদের মাধ্যমে দোয়া করা, মাজারে মানত পুরা করা, মাযারকে সিজদা করা ইত্যাদি আচার-আচরণ প্রকারান্তে মাযার বা কবর পূজারই সামিল।

৫) জীবিত পীর-আউলিয়াদের প্রতি আচরণগত শিরকঃ

মুসলিম সমাজে পীর-অলিগণ একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন রয়েছেন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষের কাছে তারা সমভাবে সমাদৃত। একথা অনস্বীকার্য যে ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার ব্যপারে সমাজে তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এ হিসেবে সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিলকারী নেক বান্দা হিসেবে বিবেচিত। বস্তুতঃ একজন খাঁটি পীর তার মর্যাদার যথার্থ সম্মান পাওয়ার দাবীদার বটে। তবে এ ক্ষেত্রে শরি'য়া নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করার কোন অবকাশ নেই। এতদসত্বেও সামাজিক বাস্তবতায় সাধারণ মানুষের তাদের প্রতি আচার-আচরণে বেশ কিছু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়, যা সীমালঙ্ঘনের অপরাধ হিসেবে শির্‌ক পর্যন্ত সংঘটিত করে থাকে। এধরনের আচরণের মধ্যে রয়েছে:

ক) পীর-অলিদের অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে শির্‌ক:

সমাজের বিশেষ ধর্মীয় নেতা হিসেবে পীর-অলিদের অনুসরণ করা শর'য়ী দৃষ্টিতে সকলের জন্য জায়েয। পীর-অলিদের অনুসরণের মধ্য দিয়ে যদি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সে ক্ষেত্রে এধরনের অনুসরণ বাধ্যতামূলক। তবে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় পীর-অলি বা অন্যকার অনুসরণ কোন অবস্থাতেই বৈধ হতে পারেনা; বরং তা অপরাধ সংঘটিত হবার কারণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা শির্‌ক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। আমাদের সমাজে পীরভক্ত এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যাদেরকে শরীয়াত বিহীন তরীকত ও মারিফাত নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে সুরেশ্বর, বিশ্ব-জাকের মঞ্জিল এবং মাইজভাণ্ডারী পন্থীদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা তাদের পীরের নির্দেশে শরিয়াতের বিধি-বিধান পালন থেকে বিরত থাকে এবং পীরের নির্দেশকে শরীয়াতের নির্দেশের উপরে স্থান দিয়ে সেমতে জীবন পরিচালনা করে থাকে। তারা পীরের ভালবাসার আতিশয্যে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। আর এভাবেই আল্লাহ্‌র নিঃশর্ত আনুগত্যের ক্ষেত্রে স্ব স্ব পীর বা অলিকে আল্লাহ্‌র শরীক স্থাপন করে থাকে। আবার শরিয়াত পন্থী কিছু কিছু পীরদের বেলায়ও দেখা গেছে যে তারা ইবাদতের বা জীবন-যাপনের এক একটা নিজস্ব বিদ'য়াতি পদ্ধতি আবিষ্কার করে নিয়েছেন। সাধারণ লোকজনও অন্ধভাবে তাদের পীরদের আনুগত্য ও অনুসরণ করে থাকে। কুরআন ও হাদিস দ্বারা তাদের কোন কর্মের ত্রুটি প্রমাণ করে দিলেও তারা সংশ্লিষ্ট পীরের দোহাই দেন এবং তাদের নির্দেশ ব্যতীত তা পরিত্যাগ করেন না। এধরনের অন্ধ আনুগত্য ও অনুসরণ সংশ্লিষ্ট পীরকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করারই নামান্তর।

খ) পীর-অলিকে ওসীলা নির্ধারণের শির্‌ক:

জীবিত পীরকে ওসীলা বানানোর রেওয়াজ এ সমাজে বহুদিন থেকে প্রচলিত রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই ওসীলা গ্রহণের বৈধ সীমা লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়। শরিয়ার দৃষ্টিতে জীবিত মানুষের দোয়ার ওসীলা গ্রহণের বৈধতা রয়েছে; কিন্তু কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির জাত সত্তার ওসীলা করে দোয়া করা জায়েয নয়। একটি ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে এর বাস্তবতা উপলব্ধি করা যেতে পারে। যখন কোন ব্যক্তি পবিত্র হজ্জ্ব পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন আমরা স্বভাবতঃই তাকে আমাদের জন্য দোয়া করতে বলে থাকি। এখানে ব্যক্তির দোয়ার ওসীলা নেয়া হয়েছে বিধায় তা বৈধ ওসীলার মধ্যে সামিল বলে বিবেচিত। তবে এমনভাবে কেউ নিশ্চয়ই বলে না যে, অমুক পূণ্যবান ব্যক্তি হজ্জ্ব পালন করছে, অতএব তার মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ করে আল্লাহ্‌ তোমার কাছে দোয়া করছি। আর যদি এমনভাবে কেউ বলেও থাকে তবে সেটা ওসীলার বৈধ সীমালঙ্ঘনের কারণে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। তদ্রুপ জীবিত পীরের দোয়ার ওসীলা নেয়াতে দোষের কিছু নেই, তবে কোন পীর-অলির মর্যাদার ওসীলা করে

আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। এখানে পীরের দোয়ার ওসীলা নেয়া এবং পীরের মর্যাদা বা নামের ওসীলায় দোয়া করা বাক্যাংশ দু'টি যদিও সমার্থবোধক বলে মনে হয়, তবুও ভাষাগত পার্থক্য থাকার কারণে এর মধ্যে অর্থের ব্যবধান রয়েছে বিস্তর। তাই বাক্যাংশ দু'টির সঠিক আর্থিক বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। প্রথম বাক্যে পীরের দোয়ার ওসীলা বলতে বুঝায়ঃ কোন বুজুর্গ বা পীরের কাছে গিয়ে তাকে নিজের বা পরিবারবর্গের বা আত্মীয়-স্বজনের বা দেশবাসীর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে অনুরোধ করা। তিনি ব্যক্তির সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে দোয়া পরিচালনা করতে পারেন। এ দোয়া আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে যে কোন পূণ্যবান ব্যক্তি বা সাধারণ মানুষের দোয়ার ওসীলা গ্রহণ করাতেও কোন দোষ নেই। আবার দ্বিতীয় বাক্যে পীরের ওসীলায় দোয়া করা বলতে বুঝায়ঃ কোন বুজুর্গ বা পীরের মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেই দোয়া কামনা করা। এখানে পীর সাহেবদের জাত সত্তার ওসীলা নির্ধারণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে কামনা করা হয় বলে তা প্রকারান্তে পীর সাহেবদের মর্যাদা উন্নীত করে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপন করারই সামিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সমাজের সাধারণ মানুষের উল্লেখিত বাক্যাংশ দু'টির অর্থগত ব্যবধান এবং এর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় তারা ওসীলার বৈধ সীমা অতিক্রম করে থাকেন প্রতিনিয়ত। উপরন্তু সংশ্লিষ্ট কিছু পীর-ও ওসীলার অপব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদেরকে পীরের ওসীলা গ্রহণের বৈধতার বিষয়ে প্রতারিত করে আসছেন। তাদের মনে পীর সাহেবগণ এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে সমর্থ হয়েছেন যে, পীরের ওসীলা ছাড়া মানুষের পরকালে মুক্তি হাসিল হবার নয়। এর যথার্থতা নিরুপণের জন্য সমাজে প্রচলিত 'পীরের হাতে বায়াত' গ্রহণের উদাহরণটি উপস্থাপন করা যেতে পারে। সাধারণ মানুষ পরকালে মুক্তিলাভের উপায় হিসেবে পীরের হাতে বায়াত গ্রহণ করাকে জরুরী মনে করে থাকেন এবং এজন্য তারা সংশ্লিষ্ট পীর সাহেবদের স্মরণাপন্ন হয়ে তাদের হাতে বায়াত নিয়ে থাকেন। আবার কোন কোন পীর সাহেবগণ নিজেরাই জনগণকে বায়াত গ্রহণে উৎসাহিত করে থাকেন এই বলে যে বায়াত সাধারণ মানুষের জন্য আখিরাতের মুক্তির উপায় এবং পীরের হাতে বায়াত না নিলে কার জন্য পরকালের মুক্তি হাসিল হবার নয়। তবে মূল কথা হচ্ছে, বায়াত বৈধ হবার জন্য বায়াত নেয়া বা দেয়ার পিছনে উভয়ের নিয়তটাই মূখ্য বিবেচ্য বিষয়। কেউ যদি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের জন্য পীরসাহেবকে কেবলমাত্র একজন শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে সেটা শর'য়ী দৃষ্টিতে বৈধ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু বায়াত গ্রহণকারী যখন পীরের মর্যাদার ওসীলায় পরকালে পার পেয়ে যাবার নিয়তে বায়াত নিয়ে থাকেন অথবা বায়াতকারী যদি এই উদ্দেশ্য নিয়ে বায়াত দিয়ে থাকেন যে পীরের হাতে বায়াত ছাড়া কেউ পরকালীন মুক্তি হাসিল করতে সক্ষম হবে না, তাহলে সেটা হবে উভয় পক্ষের চরম ভুল ধারণা এবং তা অপরাধ সংঘটনের কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু সামাজিক বাস্তবতায় এবং একশ্রেণীর পীরকে তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে এ ধরনের ভুল করতে দেখা যায়। তারা সাধারণ মানুষদের মনে এ ধারণার জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল করা এবং পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র ঈমান ও আমলে সলেহ্‌ করাই যথেষ্ট নয়, এর জন্য প্রয়োজন রয়েছে একজন পীরের হাতে বায়াত করে তার ওসীলা গ্রহণ করা। ভাবটা এমন যেন পীরের হাতে বায়াত নিলেই একজন সাধারণ মানুষের জান্নাত লাভের পথ নিশ্চিত সুগম হয়ে গেল। সমাজের সাধারণ মানুষদেরকেও প্রতিনিয়ত তাদের প্রতারণার শিকার হতে দেখা যায়। তবে আমরা জানি যে অপরাধীরা যতই অপরাধ করুক না কেন, তাদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র দরজা সব সময়ের জন্যই উম্মুক্ত রয়েছে। কোন প্রকার ওসীলা ছাড়াই খাঁটি তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে বান্দা ক্ষমা পেয়ে থাকেন। এ সত্যটি কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু ভক্তরা যদি পীর ব্যতীত মুক্তি নেই বলে ভাবতে থাকে আর পীর সাহেবও যদি নিজেকে সাধারণ মানুষের ত্রাণকর্তা ভাবতে থাকেন তাহলে তো বিপত্তির সৃষ্টি হয়। কোন কোন পীর সাহেব এভাবে বলে থাকেন যে, বান্দার গুনাহ্‌ যখন অধিক হয়ে

যায়, তখন ওসীলা ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করলে আল্লাহ্ তা মাফ করতে চান না। কিন্তু যখন তার পীরের মাধ্যমে দোয়া চাওয়া হয় তখন আল্লাহ্ তা কবুল করেন। এধরনের কথা বলা ধৃষ্টতা বৈ কিছু নয়। তবে যে সকল ভক্তগণ এ ধরনের প্রতারণার শিকার হয়ে পীরের ওসীলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করে থাকেন, তারা প্রকারান্তে নিজের পীরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপন করার অপরাধ করে যাচ্ছেন।

গ) পীরের নিকট রহমত ও করুণা কামনার শির্‌কঃ

রহমত ও করুণার আঁধার মহান আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষ কোন অপরাধ করুক আর না-ই করুক, সর্বাবস্থায় তার মন আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর রহমত ও করুণার ভিখারী হয়ে থাকবে। তাঁর কাছেই অনুনয় বিনয় করে নিজের যাবতীয় কৃত অপরাধের জন্য মার্জনা কামনা করবে। কিন্তু বাস্তবে একশ্রেণীর পীর-ভক্তদের মাঝে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তাদের পীর বাবার কাছেই বিনয় প্রকাশ করে করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করে থাকে। অন্ধ-ভক্তদেরকে তাদের পীরের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে আবেদন নিবেদন করতে শোনা যায়, যেমনঃ 'হে আমার পীর বাবা ও কিবলা! আমার উপর রহম করুন' আবার কখনও-বা 'ওহে বাবা! তুমি যদি আমার উপর রহম না কর, তাহলে আমার কি হবে!' ইত্যাদি। এভাবেই অন্ধ ভক্তরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তাদের পীরদের কাছেই আত্মসমর্পন করে তার করুণা ও দয়া ভিক্ষা করে থাকেন। বস্তুত এসকল আচরণ দ্বারা তারা পীরসাহেবকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করে শির্‌কে পতিত হচ্ছেন।

ঘ) পীরকে সিজ্‌দা দানের মাধ্যমে শির্‌কঃ

কোন কোন পীরের আস্তানায় এ ধরনের আচরণ পরিলক্ষিত হয় যে ভক্তগণ আবেগভরে পীরের বৈঠকখানার দিকে মুখ করে দোয়া করে থাকেন দ্রুত দোয়া কবুল হওয়ার জন্য। এজাতীয় আচরণ আটরশির বিশ্ব যাকের মঞ্জিল সহ অনেক পীরের আস্তানার ভক্তদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। তবে কেউ যদি পীরের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তার দিকে মুখ করে দোয়া করাকে আদব ভেবে নেয় তাহলে এ উপাসনা আল্লাহ্‌র জন্য না হয়ে তার পীরের জন্যই হয়ে থাকবে এবং সেটা শির্‌কী আচরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার অনেক সময় অন্ধ পীরভক্তগণ সংশ্লিষ্ট পীরের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের পায়ে চুমা খেয়ে থাকেন এমনকি সিজ্‌দা পর্যন্ত করে থাকেন, কেননা তাদের দৃষ্টিতে পীরসাহেবদের মন জয় করাই হল আসল কাজ, তা করতে পারলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে সকলের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো প্রতি সিজ্‌দার সম্মান প্রদর্শন করা প্রকাশ্য শির্‌কী কর্ম হিসেবে বিবেচিত।

৬) মানুষের মত ও পথের অন্ধ অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে শির্‌কঃ

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে শুরু করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও রাসূলের আদর্শের অনুসরণ জরুরী এবং চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা ও কাজ- কর্মের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ থাকা আবশ্যক। আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্যতায় অন্য কোন মানুষের মত ও পথের অন্ধ অনুসরণ করা জায়েয নহে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সমাজের সাধারণ লোকের ন্যায় জ্ঞানী লোকেরাও অনুসরণের বৈধ নীতিমালা লঙ্ঘন করে চলছেন অনেকটা নিজের

অজান্তেই। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক এ উভয় ক্ষেত্রেই অনুসরণের বৈধ পন্থা উপেক্ষিত হতে দেখা যায় সর্বাধিক। এর বাস্ড়ব প্রতিফলন দেখা যায় এমন কিছু বিষয় উপস্থাপন করা হল:

ক) মাযহাবের তাক্লিদের (অন্ধ অনুসরণ) মাধ্যমে শির্কঃ

রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের পরে বিশিষ্ট চার খলিফার শাসনামলে ইসলাম ছিল অবিভক্ত এবং অভিন্ন। কিন্তু খলিফাগণের শাসনামলের অব্যবহিত পরেই ইসলামের মধ্যে ফাটল ধরে এবং এর জের হিসেবে শিয়া এবং সুন্নী নামে প্রধান দু'টি দলের সৃষ্টি হয়। উভয় দলই নিজ নিজ মতবাদকে সঠিক পথের অনুসারী বলে মনে করে এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন। কালক্রমে সুন্নীদের মধ্যে আবার মাযহাব নামে চারটি প্রসিদ্ধ দলের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে আমাদের সমাজে মুসলিমদের মধ্যে আরও অনেক ভিন্ন মত ও পথের দল-উপদলের আবির্ভাব ঘটেছে, যেমনঃ সুরেশ্বরী, মুজাদ্দেদীয়া, কাদেরীয়া, মাইজভান্ডারী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ইত্যাদি দল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় ব্যপারে সাধারণ মানুষ তথা আলেমগণ নিজ নিজ মাযহাব বা দলের নিঃশর্ত অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাবের মধ্যে আকিদাগত এবং কোরআন ও হাদিসের স্পষ্ট বক্তব্যের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ বা মতপার্থক্য নেই। শুধুমাত্র কোরআনে বর্ণিত অস্পষ্ট হুকুম-আহকামের বিষয়ে মাযহাবগুলির মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতামত বিদ্যমান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাযহাবের সংশ্লিষ্ট ইমামগণের ইজতেহাদী মতামতের উপর ভিত্তি করেই কোন বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। মানুষ মাত্রেরই ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। সেজন্য ইজতেহাদী বিষয়াদিতে কোন মাযহাবই একক ভাবে সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারেনি বিধায় প্রচলিত মাযহাবগুলির মধ্যে অনেক মতবিরোধ ও মতানৈক্য দেখা যায়। যেমনঃ পুরুষ ও মহিলাদের নামাজের পদ্ধতিগত পার্থক্য, বিতরের নামাজের রাকাত সমূহ ও আদায় পদ্ধতি, রাফাইয়াদাইন, জামাতে নামাজের মধ্যে মুক্তাদিদের সুরা ফাতিহা পাঠ করা, সালাতের শেষ বৈঠকে বসার নিয়ম, নামাজান্তে সালাম ফিরানোর পরে মুসুল্লিদের নিয়ে সমবেত মুনাজাত করা, আসরের নামাজের মুস্তাহাব সময়, তারাবির নামাজের রাকাত সংখ্যা, ঈদের নামাজে তাকবীর সংখ্যা, মিলাদ মাহফিলের বৈধতা ইত্যাদি সহ হালাল-হারামের বিধান সম্পর্কিত বিষয়ে মাযহাবগুলির মধ্যে বেশ কিছু মতপার্থক্য বা বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। মাযহাবগুলির মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক এবং অন্তঃর্দ্বন্দ্ব চলে আসছে বেশ কিছু কাল ধরে যা সমাজে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তবে সহীহ ও জয়ীফ তথা জাল হাদিসের পার্থক্য নিরুপণের ব্যর্থতা এবং একশ্রেণীর অন্ধ অনুসারীদের গোঁড়ামীর কারণে সমাজে এমন দ্বন্দ্ব-কলহ প্রচলিত আছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ দ্বন্দ নিরসনের জন্য সমাজের আলেম শ্রেণীকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। গোঁড়ামী ছেড়ে দিয়ে মত-বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলির সত্যতা অনুসন্ধান করে তা যেখানে যে মাযহাবেই থাকুক না কেন, সঠিক ও সবল দলীল এবং গ্রহণযোগ্য যুক্তির ভিত্তিতে যাচাই করে নিয়ে এর উপর ঐকমত্য হয়ে নিজেরা অনুসরণ করা এবং সাধারণ মানুষকেও তা পালন করতে উৎসাহিত করাই হচ্ছে আলেম সমাজের দায়িত্ব। কোন কিছু অনুসরণের পূর্বে তা দেখে-শুনে, বুঝে-সুঝে ও যাচাই করার পরে অনুসরণ করতে হবে– এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশিত অনুসরণের সঠিক ও সরল পন্থা। কিন্তু বর্তমান সমাজের চিত্র কিছুটা ভিন্নতর। এখানে ধর্মীয় বিষয়ে সাধারণ মানুষ তথা অধিকাংশ আলেমগণ নিজ নিজ মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করে চলছেন। কোন বিষয়ে নিজের ইমাম বা মাযহাবের বিপরীতে সহীহ হাদিসের সন্ধান পাওয়া গেলেও বিভিন্ন অনর্থক যুক্তি-তর্ক দাঁড় করিয়ে তারা নিজ নিজ মাযহাবের নিঃশর্ত অনুসরণে অনঢ় থাকছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোন বিষয়ে ইজতেহাদ করতে গিয়ে ইমমগণ ভুল, শুদ্ধ উভয়ই করে থাকবেন। সেক্ষেত্রে এ সংকল্পের ভিত্তিতে তাদের তাক্লীদ করতে হবে যে, কোন বিষয়ে তাকলিদ করার পর যদি এর বিপরীতে কোন সহীহ্ হাদিস পাওয়া যায় তখন তাকলীদকে বর্জন

করা হবে এবং হাদিসের অনুসরণ করা হবে। প্রত্যেক মাযহাবের ইমামগণেরও সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল এই যে, তাদের মতামতের উপর যখন বিশুদ্ধ হাদিস পাওয়া যাবে তখন সেটাই তাদের মাযহাব হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু আমাদের সমাজের আলেমগণ বোধ করি তাদের এ বক্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত নন অথবা এটাকে গুরুত্বহীন ভাবেন। তাই তারা চোখ বন্ধ করে নিজ নিজ মাযহাবের যাবতীয় বিষয়াদি অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলছেন। তাদের এ ধরনের আচরণ তৎকালীন আরবের মুশরিকদের না বুঝে তাদের বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণের সামিল। যারা অন্ধভাবে মাযহাব অনুসরণ করতে গিয়ে কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের বক্তব্যের উপরে নিজের ইমাম বা মাযহাবের কথাকে অধিক গুরুত্ব দান করেন, তারা নিজেদেরকে আনুগত্যের উপাসনায় নিজ ইমাম বা মাযহাবকে আল্লাহ্‌র শরীক স্থাপনের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তবে সকলের উচিত এ শির্‌ক-এর অভিযোগ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা। আর তার জন্য সঠিক জ্ঞান আহরণ করা আবশ্যক। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেট সুবিধাদির মাধ্যমে বিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। যে কেউ ইচ্ছা করলেই ঘরে বসে চাহিদা মোতাবেক তথ্য আহরণ করে ইসলামী জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করতে পারে।

খ) রাজনীতিতে শির্‌কী আচরণ

গণতন্ত্র চর্চাকারী অনেককেই প্রায়ই একথা বলতে শোনা যায় যে, রাজনীতির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই অথবা রাজনীতিতে ধর্মের কোন স্থান নেই। এ বক্তব্যটি আদৌ সঠিক বা যুক্তিযুক্ত কিনা তা আমাদের বিবেচনা করা দরকার। যারা এমনটি বলেন তাদের বোধ করি মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র আল-কোরআন সম্পর্কে স্পষ্ট বা বাস্তব কোন ধারণা নেই। আল-কোরআন হচ্ছে মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জীবন থেকে রাজনীতি যেমন বিচ্ছিন্ন নয় তেমনি রাজনীতি থেকে ধর্মকেও আলাদা করা যায় না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিধান সহ জীবনের যাবতীয় বিধানের এক পরিপূর্ণ ভাণ্ডার এই আল-কোরআন। আল-কোরআন হচ্ছে মানবতার সেরা সংবিধান। আর নবী মোহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হচ্ছেন আল-কোরআনের এক জীবন্ত মডেল। তিনি ছিলেন মানব ইতিহাসের একজন সেরা মানব। তিনি আমাদের ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে সকল নীতির সেরা রাজনীতি পর্যন্ত শিখিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন সর্বকালের সেরা সমর নায়ক তথা একজন সফল রাষ্ট্র নায়ক। প্রত্যেক মুসলমানকেই নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ অনুসরণ করেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। কাজেই রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করার কোন সুযোগই নেই। তবে যারা এমনটি করার প্রচেষ্টা করছেন তারা হয়তো বোকা নয়তো যালিম। আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেই যেখানে তাঁর রাসূলের নিঃশর্ত আনুগত্যের জন্য নির্দেশ দান করেছেন সেখানে রাজনীতির ক্ষেত্রেও রাসূলের আনুগত্য একান্ত জরুরী। একজন সাধারণ মুসলিম বা মুসলিম রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং অনুসারীদের ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে– আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী দেশ ও বিচার কার্য পরিচালনা করার চেষ্টা করা এবং সে লক্ষ্যে দেশের সংবিধান তৈরী করা। কিন্তু বাস্তবে আমরা যা দেখছি তা হল, আমাদের দেশে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করেন, তাদের অধিকাংশরাই রাজনীতির ক্ষেত্রে কোরআনের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করতে রাজী নন। তারা এটাকে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। তারা দেশীয় রাজনীতিতে পাশ্চাত্য রাজনীতির অনুসরণ ও অনুকরণেই বেশী আগ্রহী। তাই তারা দেশ পরিচালনার জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া নির্দেশিকা আল-কোরআনের আলোকে সংবিধান রচনা না করে নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী পাশ্চাত্য ঢংয়ে বা বিধি-বিধানের অনুসরণে সংবিধান তৈরী করে নিচ্ছেন। চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস, হত্যা, ব্যাভিচার ইত্যাদি সহ আরো অনেক বিষয়ের ক্ষেত্রে কোরআনের সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করে মনগড়া আইন ও বিধান রচনা এবং তা সংসদে পাশ

করে নিয়ে বিচার কার্য পরিচালনা করা হচ্ছে। কোরআন ও সহীহ সুন্নাহ্ যেখানে যাবতীয় আইনের মূল উৎস হিসেবে স্বীকৃতি পাবার কথা, সেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিজেরাই আইনের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যারা দেশ ও বিচার বিভাগ পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন ও বিধানকে বর্তমান সময়ে অচল ও তা বাস্তবায়নে অযোগ্য বলে উপেক্ষা করে নিজেদেরকে প্রয়োজনীয় আইন রচনা করার যোগ্য বলে মনে করেন, তারা এবং তাদের অনুসারীরা আল্লাহ্র রবূবিয়্যাতের শিরকে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছেন।

গ) গণতন্ত্র চর্চায় শির্কঃ

আমাদের মত গণতান্ত্রিক দেশে একটি কথা প্রায়শঃ বলতে শোনা যায় যে, সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। জনগণ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতায় বসাতে পারে। বস্তুতঃ গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হচ্ছে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। তাই গণতন্ত্র চর্চাকারী যে কেউ অতি সহজেই বিশ্বাস করে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদান এবং ক্ষমতাচ্যুত করার মালিক একমাত্র জনগণ, যেহেতু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের ভোটের মাধ্যমেই ক্ষমতার পালাবদল হয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি ভ্রান্ড় আকিদা এবং শির্কও বটে। কেননা এ অকিদা কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে যে, সকল ক্ষমতার মালিক এবং উৎস হচ্ছেন একমাত্র আলাহ্ তা'আলা। কাউকে রাজত্ব প্রদান করা এবং সম্মানিত করা অথবা কাউকে ক্ষমতাচ্যুত করা ও হেনস্ড় করা এ সব কিছুই সম্পূর্ণ আলাহ্র ইখতিয়ারাধীন। আপাতঃদৃষ্টিতে যদিও দেখা যায় যে, জনগণের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল হয় তবুও বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাহ্র ইচ্ছাধীন। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কেহই ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না। আলাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং সম্মানিত করেন। কাজেই জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এ কথাটি সঠিক নয়। যেখানে আলাহ্ই সকল ক্ষমতার মালিক সেখানে জনগণকে ক্ষমতার উৎস বলা হলে বা এ আকিদা পোষণ করা হলে আলাহ্র একচ্ছত্র ক্ষমতায় জনগণকে শরীক সাব্যস্ড় করা হয় এবং শির্ক সংঘটিত হয়।

৭. অভ্যাসগত শির্কঃ

দৈনন্দিন জীবনে মুসলিমদের মাঝে অসংখ্য লোক অভ্যাসগতভাবে এমন কিছু কর্মের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে শির্কী কর্ম হিসেবে বিবেচিত। মহান আল্লাহ্ মানুষের জীবনের যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক হওয়া সত্ত্বেও, তাদেরকে কল্যান লাভ ও অকল্যাণ দূরীকরণার্থে এমন সব পন্থা অবলম্বনে অভ্যস্ত দেখা যায়, যা বস্তুত আল্লাহ্র পরিবর্তে তাঁর সৃষ্টির নিকট কামনা করার শামিল। নিম্নে এর কতিপয় বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা হলঃ

ক) গায়রুল্লহর কসমের মাধ্যমে শির্ক :

একশ্রেণীর মানুষকে কথায় কথায় কসম করতে অভ্যস্ত দেখা যায়। শরি'য়া মানুষকে কসম করতে উৎসাহিত করেনি, কিন্তু কেউ যদি নিতান্তই কসম করতে বাধ্য হয়, তবে একমাত্র আল্লাহ্র নামে কসম করার বৈধতা রয়েছে। গায়রুল্লাহর নামে কসম করা জায়েয নহে, উপরন্তু তা শির্কী আচরণ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু বাস্তব জীবনে অনেককেই বাপ-দাদা, ছেলে-সন্তান, নবী-রাসূল, পীর-আউলিয়া, চন্দ্র-সূর্য,

গ্রহ-নক্ষত্র, আগুন-পানি, মাটি তথা বিদ্যা ইত্যাদির নামে কসম করতে দেখা যায়। এসকল কসম গায়রুল্লাহর নামে করা হয় বলে তা শির্কী কর্ম হিসেবে বিবেচিত।

খ) তা'বীয অবলম্বনের শির্কঃ

আমাদের সমাজে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে জ্বিনের অশুভ দৃষ্টি এবং বিভিন্ন রোগ-বালাই, বিপদ-আপদ ও অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য তা'বীয ব্যবহার করা একটি সাধারণ রীতিতে পরিনত হয়েছে। একশ্রেণীর ওঝা, ফকির, কবিরাজ বা জ্বিনসাধকেরা এই তা'বীয ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাছাড়াও তা'বীয ব্যাবসায় কোন কোন মসজিদের ইমাম বা আলেম সমাজও পিছিয়ে নেই। কোরআনের আয়াত দিয়ে তা'বীয দেয়া বা এর ব্যবহার সম্পর্কে মুসলিম ওলামা বা মনীষিদের মাঝে দু'টি মত রয়েছে। একদল এটাকে জায়েয বলেছেন, আবার অন্যান্যরা এটাকে না-জায়েয বা হারাম বলেছেন। এ বিষয়ে আমরা কোন মন্তব্য করব না। তবে কোরআনের আয়াতকে বিকৃত করে অর্থাৎ আয়াতের নক্শা তৈরী করে কিংবা আয়াতের সাংকেতিক চিহ্ন আবিস্কার করে তা কাগজে লিখে তাবী'য তৈরী করা সর্বাবস্থায় হারাম। এটি একটি চরম ধৃষ্টতা। কেননা এ বিকৃতির ফলে পবিত্র কোরআনকে অবমাননা করা হয় এবং কোরআন নাযিলের মহৎ উদ্দেশ্যকে ব্যহত করা হয়। কাজেই এহেন আচরণ সর্বাবস্থায় পরিতাগ করা উচিত। কোরআনের আয়াত ছাড়া অন্য সকল পন্থায় অর্থাৎ মন্ত্র-তন্ত্র, কুফরী কালাম, শয়তানী উপকরণ বা কোন নক্শা, চিত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে তা'বীয তৈরী করা এবং সে তা'বীয ব্যবহার করা ওলামাদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কেননা, এমন তা'বীয ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে, গায়রুল্লাহর উপর ভরসা করা বা তাদের আশ্রয় প্রার্থনা করা– যা প্রকাশ্য শির্ক হিসেবে বিবেচিত। এতদসত্বেও মানুষ তা'বীয ব্যবহারের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে রয়েছে। অনেক সময়ে স্বামীকে বশ করার জন্য স্ত্রী বা স্ত্রীকে বশ করার জন্য স্বামী কর্তৃক তা'বীয সংগ্রহ করে বিছানা, বালিশ বা অন্যত্র রেখে দেওয়ার প্রচলন দেখা যায়। আবার শাশুরী-বউ এর কোন্দল মেটাতে বা সম্পর্কোন্নায়নেও তা'বীযের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। এসকল ক্ষেত্রে যাদুকর, তান্ত্রিক, কবিরাজ বা জ্বীনসাধকের স্মরণাপন্ন হয়ে তা'বীয সংগ্রহ করার প্রবনতাই সর্বাধিক লক্ষ্যণীয়। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এজাতীয় আচরণ শির্কের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এটা পরিত্যায্য।

গ) রোগ নিরাময় ও ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তাগা, বালা বা পাথরের আংটি ব্যবহারের মাধ্যমে শির্কঃ

আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বাইরে কোন বস্তুই নিজস্ব গুনে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না। তাই কোন বস্তুকে কোন ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী বলা বা এ ধারণার বশঃবর্তী হয়ে তা ব্যবহার করা শির্কে আসগর হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যেমন জ্যোতিষী বা গণকের দেয়া মূল্যবান পাথরের আংটি পরিধান করতে দেখা যায় তেমনি রোগ নিরাময়ের জন্য একধরনের ধাতব নির্মিত বালা পরিধান করার প্রচলনও লক্ষনীয়। এছাড়াও রোগ নিরাময়, বালা-মুছিবত দূরীকরণ, ভাগ্য পরিবর্তন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য বা বিভিন্ন অনিষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আজমীর শরীফের মাযার থেকে আনিত হলুদ-কমলা ডোরা সুতা পরিধান করার প্রচলনও দেখা যায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। তবে এধরনের অভ্যাসগত আচরণ আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসার পরিবর্তে বস্তুর উপর ভরসা করা হয় বলে তা শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ) খাওয়াজ খিজির ও পীর বদরকে আহ্বান করার মাধ্যমে শির্কঃ

ভ্রমণের প্রাক্কালে নৌকায় আরোহন করে পাঁচপীর, খাওয়াজ খিজির ও পীর বদরকে আহ্বান করার রীতি এদেশের সাধারণ মানুষ ও নৌকার মাঝিদের মাঝে একটি অভ্যাসগত আচরণ। ধারণা করা হয় যে, এসকল সত্তার নাম নিলে তারা খুশী হয়ে নৌ-পথের ঝড়-তুফান সহ সকল আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করবে। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে গায়রুল্লাহর উপর ভরসা স্থাপন করাতে শির্‌ক সংঘটিত হয়।

ঙ) কারো ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সমতূল্য করার মাধ্যমে শির্‌কঃ

সমাজের অনেককেই এভাবে কথা বলতে দেখা যায় যে 'আল্লাহ্‌ এবং আপনি যা চান' তাই হবে, 'আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নামে' শুরু করলাম বা 'আল্লাহ্‌ এবং অমুকের' দয়ায় বেঁচে আছি ইত্যাদি। এ জাতীয় কথা বলা বা ইচ্ছা পোষণ করা শির্‌কে আসগরের অন্তর্ভুক্ত।

চ) ঝাড়-ফুঁক এর মাধ্যমে শির্‌কঃ

সমাজের সাধারণ মানুষ কোন প্রকার অসুস্থতা বা রোগ-শোকে বিভিন্ন প্রকার ঝাড়-ফুঁকের আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত। এক্ষেত্রে কোরআনের আয়াত দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করার বৈধতা রয়েছে তবে কুফরী কালামের দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করার কোন প্রকারেই জায়েয নয় বরং তা শির্‌কী কর্ম হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই ওঝা-বৈদ্য, ফকির বা তান্ত্রিকদের ডেকে ঝাড়-ফুঁক করাতেই বেশী অভ্যস্ত। এরা মূলত কুফরী কালামের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করে থাকে। তাই এ ধরনের ঝাড়-ফুঁক করা ও তা গ্রহণ করা উভয়টিই ছোট শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত।

ছ) শুভ-অশুভ বা পূর্বলক্ষণ নির্ধারণের মাধ্যমে শির্‌কঃ

দৈনন্দিন জীবনে মানুষের ধারণা প্রসূত কিছু আচরণ যেমন, কোন কিছুকে শুভ বা অশুভ মনে করা, কোন বিষয়কে বা ঘটনাকে কুলক্ষণ মনে করা ইত্যাদি শির্‌কে আসগর হিসেবে বিবেচিত। কোন বস্তু, প্রাণী বা ঘটনা মানুষের জন্য নিশ্চিত করে আগাম বিষয়ের ইঙ্গিত দিতে পারে না। ভবিষ্যতের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ্‌-ই রাখেন। তাই কোন বস্তু, কোন ঘটনা বা কোন নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণকে শুভ-অশুভ বিবেচনা করা বা কু-লক্ষণ নির্ধারণ করা হলে তা শির্‌কী কর্ম হিসেবে গণ্য হবে। এভাবে গৃহাগমন, বিবাহ ইত্যাদি শুভ কাজের জন্য দিন-ক্ষণ বেছে নেয়া, পাখি বা বানর ইত্যাদির মাধ্যমে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করা, জোড়া শালিককে শুভ লক্ষণ মনে করা, যাত্রার প্রাক্কালে শূন্য কলসী দেখলে বা হাঁচি দিলে অশূভ লক্ষণ বিবেচনায় যাত্রা বিরতি করা, পেঁচা দর্শন বা পেঁচার ডাককে অশুভ লক্ষণ ভাবা ইত্যাদি সহ আরো অনেক ধারণা প্রসূত অভ্যাসগত আচরণ শির্‌কের পর্যায়ে পরে। আবার মানুষের চোখ লাগা থেকে সন্তানকে রক্ষার জন্য কপালে কালো টিপ দেয়া, অশুভ শক্তির হাত থেকে রেহাই পেতে নতুন গৃহ তৈরী করার সময় ঝাড়ু বা জুতা টানানো, চোখের কু-দৃষ্টি থেকে ক্ষেতের ফসল রক্ষার জন্য মাটির পাত্রে চুনা লিপ দিয়ে তা ক্ষেতে টানিয়ে রাখা, ইত্যাদি কর্ম-কাণ্ড আল্লাহ্‌র উপর ভরসার পরিপন্থী বলে তা শির্‌কে আসগড় হিসেবে বিবেচিত।

জ) কোন ভাস্কর্য বা স্মৃতিসৌধকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য নিরবে দাঁড়িয়ে থাকার মাধ্যমে শির্‌কঃ

ভাস্কর্য বা স্মৃতিসৌধ কোন মানুষ বা অপর কোন প্রাণীর আকৃতিতে নির্মান করা শরিয়ার দৃষ্টিতে অবৈধ বা হারাম। যারা এমনটি করে হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী পরকালে তাদেরকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন

হতে হবে। অন্যভাবে কোন প্রাণীর আকৃতি ব্যতীত স্মৃতি স্তম্ভ নির্মান করা যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে শর্ত হল এই যে, সেখানে কোন ফুলদিয়ে বা নিরবে দাঁড়িয়ে সেটাকে সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না। কেননা এটি মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করার ইসলামী পদ্ধতি নয়, বরং এজাতীয় আচরণকে ইসলাম বাড়াবাড়ি বলে মনে করে এবং এটাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পুজা হিসেবে গণ্য করে।

ঝ) মানুষের নামকরণের মাধ্যমে শিরকঃ

রাজাধীরাজ বা মহারাজ ইত্যাদি নামগুলি খাস করে সৃষ্টি কর্তার বেলায় প্রযোজ্য। সুতরাং কারো জন্য আল্লাহ্‌র এ নামগুলি ব্যবহার করা অনুচিত। যে সকল নাম দ্বারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকারো দাস বা গোলাম অর্থ প্রকাশ করতে পারে, সে সকল নাম মানুষের জন্য পরিহার করা উত্তম। কেননা এর মধ্যেও শির্‌কের গন্ধ বিদ্যমান। যেমনঃ আব্দুন্নবী, আব্দুর রাসূল, গোলাম নবী, গোলাম রাসূল, গোলাম মোস্তফা, গোলাম আম্বিয়া, গোলাম পীর ইত্যাদি নামগুলিতে আব্‌দ এবং গোলাম যোগ হওয়াতে যথাক্রমে নবী, রাসূল, মোস্তফা, আম্বিয়া ও পীর জাতীয় সত্তার দাস বা গোলাম অর্থ প্রকাশ করে– যা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আবার নবী বখ্‌শ, রাসূল বখ্‌শ, আলী বখ্‌শ, পীর বখ্‌শ (অর্থাৎ নবী, রাসূল, আলী বা পীরের দান) ইত্যাদি নাম রাখাও শির্‌ক। কারণ সন্তান দান তো আল্লহ্‌ই করে থাকেন। সুতরাং এ জাতীয় নাম পরিহার করে চলাই সবার জন্য মঙ্গলজনক।

ঞ) মানুষকে ক্ষমতার উৎস বা মালিক ভাবা শির্‌কঃ

আল্লাহ্ (জনগণের রায়ের মাধ্যমে) ক্ষমতা দান ও তা ছিনিয়ে নেয়ার মালিক হওয়া সত্ত্বেও কথায় ও লেখনীতে দেশের জনগণকে ক্ষমতার মালিক ও উৎস বলে মনে করা শির্‌ক।

ট) অন্যের উপর ভরসা করার শিরকঃ কোন কাজ সমাধা করার জন্য আল্লাহ্‌র উপর ভরসা না করে কোন মানুষের উপর ভরসা করে **'উপরে আলাহ্ নিচে আপনি'**, অথবা **'এ কাজে আপনি বা অমুক আমার একমাত্র ভরসা'** এমনভাবে বলা শির্‌ক।

ঠ) কোন ঔষধ খেয়ে আল্লাহ্‌র রহমতে রোগ সেরেছে না বলে অমুক ঔষধ খেয়ে রোগ সেরেছে, যেমন **'নাপা খেয়ে জ্বর সেরে গেছে'** বলা শির্‌ক। বলা উচিত নাপা খেয়ে আলাহ্‌র রহমতে জ্বর সেরে গেছে।

উপসংহার

আমরা শির্‌কের আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে, আর তা হল শির্‌ক বর্জিত আমল হাসিল করা তথা শির্‌কের মূলোৎপাটন করা। কোনো ধর্ম বা ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে কটাক্ষ বা হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নয় বরং শির্‌ক সম্পর্কে জানার জন্য এর বাস্তবতাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছি মাত্র। কেননা মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, যে কেউ শির্‌ক বর্জিত আমল নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, তিনি অন্যান্য সকল অপরাধ যাকে যেভাবে খুশী ক্ষমা করে দিবেন। তবে শির্‌ক বর্জিত আমল করার জন্য যে কাজটি প্রথমেই জরুরী তা হল শির্‌ক সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা, অন্যথায় এ কাজটি সফল হবে বলে প্রতীয়মান হয় না। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা শির্‌কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি এবং শির্‌ক সম্পর্কে যথাসম্ভব পর্যাপ্ত বাস্তব ধারণা দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছি মাত্র।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা যে, আমরা আল্লাহ্‌র সাথে আর কাউকে ডাকবো না এবং আল্লাহ্‌র সাথে কোন বিষয়ে অন্য কাউকে শরীক করব না অর্থাৎ শির্‌ক করব না। অথচ আমাদের চারিদিকে আমরা কি দেখতে পাই? দেখতে পাই যে, ঈমান থাকা সত্বেও অধিকাংশ মুনলিমদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শিরকী কর্ম। আর অধিকাংশ শির্‌কই প্রচলিত রয়েছে মাজারকে কেন্দ্র করে। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মানুষ যেন মাজারে শায়িত মৃত অলিকেই ডাকতে বেশী পছন্দ করে। বর্তমানে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষকে এ জাতীয় শির্‌ক সম্পর্কে সচেতন করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কতিপয় চ্যানেল আবার এদের বিরোধীতা করতেও সচেষ্ট রয়েছে। তারা কিসের স্বার্থে শির্‌ক ও বিদ'আতকে জিয়িয়ে রাখতে সচেষ্ট রয়েছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে আসুন বিভ্রান্ত না হয়ে আমরা কোরআন ও সহীহ হাদিসের চর্চার মাধ্যমে শির্‌ককে জানার চেষ্টা করি এবং শুদ্ধ আমলের দ্বারা জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করি এবং পরকালীন কল্যাণার্জনে সচেষ্ট হই।

আমরা এ গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে সমাজে প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ শির্‌কী আচরণগুলি তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছি মাত্র। তবে জীবনের চলার পথে আমরা যে আমাদের অজান্তে আরও কত শির্‌কে লিপ্ত হয়ে পড়ছি তার সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আর এ জন্য আমাদের ধর্মীয় জ্ঞানের স্বল্পতাই প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত। প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোরআন ও হাদিসের জ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা থাকলে এ রূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হত না বলে আমাদের ধারণা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যাবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক অঙ্গন সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোতে দ্বীনের ছোঁয়া লেশমাত্র নেই। অবশ্য এর জন্য আর যেটা প্রয়োজন তা হলো সমাজের দ্বীনি আলেমগণের ঐক্যবদ্ধতা। কিন্তু সেখানেই রয়েছে দৈন্যতা। দ্বীনি আলেমগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নানান মত ও পথের দিশা। আলেমগণের নিজেদের মধ্যেই ধর্মীয় বিষয়ে বিদ্যমান রয়েছে মতানৈক্য এবং অন্তঃদ্বন্দ। দুখঃজনক হলেও সত্য যে এক শ্রেণীর আলেম শির্‌ক ও বিদ'আতকে সমাজে জিয়িয়ে রাখার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত রয়েছেন। তারা কি কারণে এটা করছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে হতে পারে আলেম নামধারী এ শ্রেণীর ব্যক্তিদের কোরআন ও হাদিসের সঠিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে অথবা হতে পারে তারা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর মতবাদের অনুসারী বলে এর বাইরে যেতেও তারা প্রস্তুত নন। বস্তুতঃ এরা কেহই মাযহাবী আকিদার উর্দ্ধে উঠে আসতে পারছেনা এবং নির্ভেজাল কোরআন ও হাদিসের আলোকে সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা নিয়েও তাদের মাথা ব্যাথা নেই। কিন্তু সার্বিক কল্যাণের জন্য এ বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে বেড়িয়ে আসাটা সকলের জন্য অত্যন্ত জরুরী। কেননা সমাজ থেকে শির্‌কের বিস্তারকে রোধ করতে হলে সর্বপ্রথমেই সকলকে শির্‌ক সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এটা একক প্রচেষ্টায় সফল হবার নয়। এর জন্য সমাজের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় কাজটি অতি সহজে সফল হতে পারে বলে আমাদের ধারণা। তাই প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিকেই উদ্দ্যোগ নিতে হবে এবং তাদেরকে অজ্ঞ মানুষের পাশে গিয়ে দাড়াতে হবে। তাদের নিকট পৌছে দিতে হবে শরিয়তের সঠিক জ্ঞান– তাহলেই জীবনের স্বার্থকতা হাসিল হবে। তাই আসুন অন্তঃদ্বন্দ ভুলে যাই এবং কোরআন ও হাদিসের সঠিক জ্ঞান আহরণ করে সে জ্ঞানের আলোকে সমাজ পরিবর্তনে এবং শির্‌ক মুক্ত সমাজ গঠনে যথাসাধ্য সচেষ্ট হই।

সবশেষে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমে আমরা এ আলোচনার পরিসমাপ্তি টানব-

"তিনিই তো আল্লাহ্‌, তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নাই, তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।"

আল কোরআন, সুরা আন'আম, আয়াত-১০২।

আসুন আমরা প্রত্যেকেই কোরআনের এ আয়াতের উপর দৃঢ় আস্থা রেখে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিয়োজিত থাকি এবং সকল প্রকার শির্‌কের বিভ্রান্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখি। সেই সাথে বিগত দিনের কৃত শির্‌কের অপরাধের জন্য তাওবা করি ও কর্ণাময় আলাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের এ সার্বিক প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আমাদেরকে শির্‌ক মুক্ত আমল করার তাওফিক দান করুন- আমিন!

ছুম্মা আমিন!